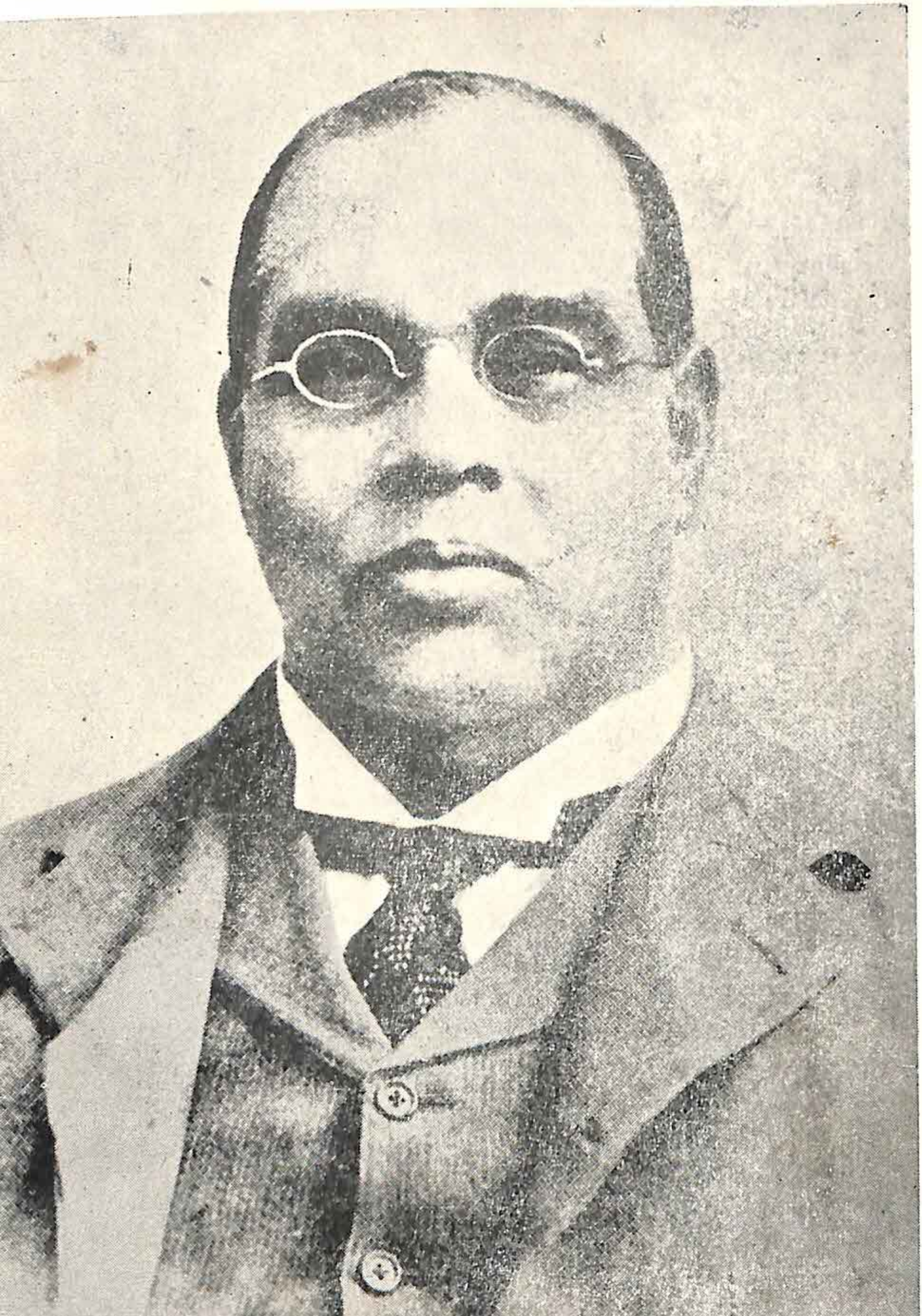
নব ভারত স্রষ্টা

রমেশ চন্দ্র দত্ত

আর-সি-দত্ত



নব ভারত স্রষ্টা

রমেশ চন্দ্র দত্ত

আর-সি-দত্ত

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

জুন, ১৯৭৬ (June, 1976)
জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৮ (Jyaistha, 1898)

ROMESH CHUNDER DUTT (Bengali)

বাংলা অনুবাদঃ ডি-পি-সেনগুপ্ত

মূল্য : ৮.০০ টাকা
Price : Rs. 8.00

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ কর্তৃক প্রকাশিত এবং এস্ এ্যান্টুল এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থানঃ ৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-১

ভূমিকা

তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ আমাকে যখন রমেশ চন্দ্র দত্তের একটি জীবনী লিখতে অনুরোধ জানালেন, আমি সে দায়িত্ব নিতে বেশ দ্বিধায় পড়েছিলাম। কারণ লেখক হিসাবে এটাই হবে আমার প্রথম প্রচেষ্টা আর তার চেয়েও বড় কথা এ বিষয়ে আমার ভাবপ্রবণতা। ব্যক্তিগতভাবে রমেশ দত্তের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ আমার জন্মের বেশ কয়েক বছর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী রমেশ চন্দ্র দত্ত সম্পর্কে ছিলেন আমার ঠাকুর'দা—কিন্তু দূর সম্পর্কে নয়। মৃত্যুর পরেও তিনি আমাকে ও আমার পরিবারে এখনো যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের, গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের আদর্শ। আমরা তাঁর অনুগামী ছিলাম। অথচ মাত্র ষাট বছর জীবিত থেকে তিনি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন আমাদের মধ্যে অল্প ক'জনই তার এতটুকু করতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। এই পরিবেশে গড়ে উঠে স্বভাবতই আমি ভেবেছি, তাঁর জীবন ও কর্মধারার একটা প্রকৃত ও সত্য পরিচয় তুলে ধরতে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও স্বতন্ত্র মনোভাবের প্রয়োজন—তা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা। তাই এই জীবনী লেখায় আমার এত দ্বিধা।

কতটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পেরেছি তার বিচারের ভার পাঠক পাঠিকার ওপর। এ বিচার সর্ববাদী সম্মত হবে না তা আমি জানি। কেননা লেখক হিসাবে ভাবগত ও ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়াও অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য প্রতিভার বিচার করার ব্যাপারে একমত হওয়া একটু মুশকিল। বিভিন্ন বিষয়ে রমেশ দত্তের আগ্রহ, পরিশ্রম করবার অসীম ক্ষমতা এবং সাহিত্য ও

প্রাচীন ইতিহাসে তাঁর অনবদ্য অবদান সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারেনা। আমার মতে, ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এবং দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আজও অবিস্মরণীয়। পরবর্তী যুগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ তাঁর অবদানের মূল্যকে কোন অংশে কমিয়ে দেয়নি। এক ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষকে যাচাই করতে হলে তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মূল্যায়ণ প্রয়োজন; যাচাই করে দেখতে হবে কোন্ পরিবেশের মধ্যে তিনি জীবন কাটান, তাঁর কর্মসাধনা কি। তাঁর অভিমতের সঙ্গে পরবর্তী যুগের স্বীকৃত অভিমতের তুলনামূলক বিচারে ব্যক্তিত্বের যাচাই করা যায় না।

এই জীবনী সম্বন্ধে দু'চার কথা জানতে হয়তো পাঠকেরা কৌতূহলী হবেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে রমেশ দত্তের অবসর গ্রহণের পরবর্তী সময় নিয়েই বেশী লেখা হয়েছে; অথচ তাঁর প্রথম জীবনের উনপঞ্চাশ বছরের তুলনায় এই সময়টা মাত্র বারো বছর। জেনেশুনেই এটা করা হয়েছে কেননা, তাঁর প্রথম জীবনের কর্মসাধনার তুলনায় এই বারো বছরের কর্মপ্রচেষ্টা জাতীয় জীবনে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এটা অনস্বীকার্য যে, জীবনের প্রারম্ভে যে সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন তা চিরকালীন সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। ভারতের সাংস্কৃতিক জাগরণে তাঁর যা অবদান তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য জীবনের সায়াহ্নে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় তিনি যে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন তা বিদেশী শাসন ব্যবস্থার কুফল ও অর্থনীতির অবনতি সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলায় সাহায্য করেছে। এই সচেতনতাই পরবর্তীকালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো তীব্র করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, এই জীবনীতে আমি রমেশ দত্তের নিজের লেখা এবং

সমকালীন সাহিত্যিকদের লেখা উদ্ধৃত করেছি। উদ্দেশ্য, সমকালীন পটভূমিকায় ঘটনা ও অভিমতের একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরা। আমার মনে হয় কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির তিরোধানের বেশ কয়েক বছর পর অন্য লেখকের লেখার মাধ্যমে তাঁর বিচার না করে যদি তাঁর নিজের লেখা ও বাণী এবং সমকালীন লেখকদের রচনা ও উদ্ধৃতি থেকে সেই প্রতিভার বিচার করা যায় তবে তা অনেক বেশী মূল্যবান।

এই ভূমিকা শেষ করার আগে আমি সম্পাদক মণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁরা যে শুধু আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাই নয়, এই ব্যাপারে কম ধৈর্যের পরিচয় দেননি। এ কাজের দায়িত্ব দেবার জন্যও আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অতীত রোমন্থন করতে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে আমাদের দেশের অবস্থার পর্যালোচনা করতে আমি কম আনন্দ পাইনি। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের আশাআকাঙ্খাকে আজকে আমরা কতটা রূপায়িত করতে পেরেছি তা নির্ধারণও কম আকর্ষণীয় নয়। আর ঠিক এই কারণেই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের মনীষীদের জীবনী অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য।

এই জীবনীর তথ্য সংগ্রহে সাহায্য এবং পরে পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা করায় আমি আমার প্রাক্তন সহকর্মী ডাঃ রাজ-কে-নিগমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর ও আমার মেয়ে পার্বতীর প্রতিনিয়ত উৎসাহ আমার দায়িত্বভার অনেকটা লাঘব করেছে।

পরিশেষে, আমার ব্যক্তিগত সচিব শ্রী কে. এন. মাথুরের কাছ থেকে যে সাহায্য আমি পেয়েছি তা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। তিনি তাঁর কর্মপ্রীতির দরুণ আমার পাণ্ডুলিপি টাইপ করেছেন ও কাগজপত্র গুছিয়ে দিয়েছেন।

এই জীবনীতে যে অভিমত আমি ব্যক্ত করেছি তা একান্তই আমার নিজস্ব। এর মধ্যে যা অপূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে তাও আমার। ভারত স্বাধীন হবার যে চিন্তা ও স্বপ্ন রমেশ চন্দ্র ও তাঁর যুগের নেতাদের আজীবন কর্মসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো সেই স্বাধীনতা দিবসের বিংশতিতম বার্ষিকীতে আমি এই গ্রন্থ তাঁদেরই উদ্দেশে উৎসর্গ করছি। শুভার্থী পাঠক-পাঠিকাদের ওপর দিচ্ছি এর মূল্য বিচারের ভার।

নতুন দিল্লী
১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৭

আর. সি. দত্ত

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরিবার ও পরিবেশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রমেশ দত্তের জন্ম। বাংলাদেশে তখন প্রবল আলোড়ন। বহুদিনের রাজনৈতিক অবক্ষয় ও নিষ্ক্রিয় চিন্তাধারার পর সেই সময়ে প্রথম বাংলাদেশের মাটি ছুঁয়ে সমস্ত ভারতে নতুন শক্তির প্রাণ-প্রাচুর্য ও আলোড়নই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং প্রভাবিত করে চিন্তার জগতকে, ধর্মীয় ও সমাজ জীবনকে। রাজনৈতিক জাবনও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেনি। বিগত শতাব্দীতে য়ূরোপীয় উপনিবেশকারীদের অস্তিত্ব ছিল। এমনকি দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশেরা উপনিবেশ স্থাপন করে। তবে ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের আগে ব্রিটিশ শক্তি ভারতের মাটিতে বদ্ধমূল হতে পারেনি। তখন থেকেই ভারত পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল হুগলী বন্দর—যেখানে আজ কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলেই প্রথম পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব গড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তার ফলাফল সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হয়। এ সম্পর্কে ডক্টর আর. সি. মজুমদারের মন্তব্য, "যে প্রাচীর ভারতকে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এতদিন আড়াল করে রেখেছিল, ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে সে প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল।"* ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন এই ব্যাপারে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তারিখের দিক থেকে না হলেও ঘটনার দিক থেকে সময়টা খুবই উল্লেখযোগ্য, কারণ এর ফলে আমরা পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসেছিলাম আর তখন পাশ্চাত্যেই

* দি ব্রিটিশ প্যারামাউণ্টসি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁ, ২য় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চিন্তাধারার পরিবর্তন চলেছে কিংবা সবে সেখানে চিন্তাধারার এক গভীর পরিবর্তন হয়েছে। ফরাসী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তখন প্রাচীন মতবিশ্বাস ও রক্ষণশীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন। এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী সমাজে একটা যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বাধীন চিন্তাধারা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব প্রাচীন মতবিশ্বাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এবং ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে উদারনৈতিক মতবাদ গড়ে ওঠে তার পটভূমিকা প্রস্তুত করে। ভারতে কয়েক শতাব্দী যাবৎ বুদ্ধিগত কিছুটা নিষ্ক্রিয়তার ফলে চিরাচরিত বিশ্বাস ও মতবাদ মাথা চাড়া দেয়। এর ওপরেই সেদিনের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন গড়ে ওঠে। যাঁদের ওপর এর প্রথম প্রভাব পড়লো তাঁদের চিন্তাধারায় একটা আমূল পরিবর্তন আসবে এটা স্বাভাবিক। য়ুরোপের মত এই পরিবর্তন যদি দেশের অভ্যন্তর থেকে ক্রমশ আসত তাহলে তা এতখানি আমূল পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হতনা।

হিন্দু কলেজের আদি যুগের ছাত্রদের অমিতাচারের অনেক কাহিনী শোনা যায়। পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রথম উচ্ছ্বাসে তাঁরা পশ্চিমী সংস্কৃতিকে যথাযথ গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। ভারতীয় জীবনধারার ছাঁচে ফেলে তাকে নিজস্ব করে নিতে পারেননি। "অজ্ঞান ও অন্ধকারাচ্ছন্ন" স্বদেশবাসীর তুলনায় তাঁরা যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে অনেক শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করার জন্য তাঁরা পাশ্চাত্য জীবন-ধারাকে স্থূলভাবে অনুকরণ করে আনন্দ পেতেন। তাঁরা য়ুরোপীয় সাজপোষাক পরতেন, ইংরেজীতে কথা বলতেন, ইংরেজীতে লিখতেন, আর নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে গোঁড়া ভারতীয়দের বাড়ীর মধ্যে তার হাড়গোড় ছুড়ে ফেলতেন। প্রাচীন মতবিশ্বাস যে তাঁরা মানেন না, এইভাবে তা সকলকে জানিয়ে দিতেন। বহু গোঁড়া ভারতীয় এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হননি, এঁদের কাণ্ডকারখানায় রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ডঃ আর. সি. মজুমদার লিখিত 'Impact

of Western Culture' শীর্ষক একটি নিবন্ধে এরকম একটি অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম আচরণের ফলে কত যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটতো এটা তারই প্রমাণ। এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। তিনি লিখেছেন, "আরেকজনের অভিযোগ আরও গুরুতর। তাঁর ছেলেও হিন্দু কলেজেরই ছাত্র। তিনি যখন তাকে কালিঘাটে মা কালীর মন্দিরে নিয়ে গেলেন, সে আর পাঁচজনের মত মায়ের মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল না। দেবীকে সম্বোধন করে শুধু বলল,—"গুড মর্নিং, ম্যাডাম।"

এই বাড়াবাড়ি স্বভাবতই বেশী দিন টিকতে পারে না। বাংলাদেশে এই আতিশয্য এক পুরুষের বেশী টেকেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন রমেশ দত্তের জন্ম হয়, তখন এর প্রথম প্রভাবের ধাক্কাটা কেটে গেছে। পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও ভারতীয় জীবনধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ঝোঁকটা তখন প্রবল হয়ে উঠেছে এবং উভয়কে ভারতীয় ছাঁচে ফেলে একীভূত করার সজাগ প্রয়াস শুরু হয়েছে। শুধু পাশ্চাত্য ভাবধারাই নয়, পাশ্চাত্য জীবনধারার প্রতিও একটা অতিরিক্ত মোহ বা আসক্তির ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং তার পরেও থেকে গিয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক হল ধর্মীয়, সামাজিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং পরিশেষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্দোলনসমূহ। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল যুক্তি তর্কের ভিত্তিতে পশ্চিমী বিশ্লেষণ পদ্ধতি ভারতীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় প্রয়োগ করার চেষ্টা।

এই যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। রামমোহন রায়ের আন্দোলনে হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রকাশ্য বিদ্রোহের আভাস ছিলনা। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল যুক্তির পরীক্ষাকে প্রয়োগ করে তারই ভিত্তিতে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হিন্দু ধর্মের মৌলিক

মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন তিনি মেনে নিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের রীতিনীতিতে পরে যেসব বাহুল্য সঞ্চিত হয়েছিল তিনি তা বর্জন করেছিলেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সতীদাহ প্রথা। তাঁর সুদৃঢ় সমর্থনে ১৮২৯ সালে আইন করে এই প্রথা তুলে দেওয়া হয়। রাজা রামমোহন রায়ের পরে ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং তাঁর পরে কেশব চন্দ্র সেন। কেশব সেনের চরিত্রে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার এক অদম্য কর্মশক্তি ও প্রগতিশীলতার সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি এই আন্দোলনকে এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন। বিপিন চন্দ্র পালের অভিমত হলো এই, "শাস্ত্র, ঐতিহ্য বা রীতিনীতি—তা সে যত স্মরণাতীত কালেরই হোক বা যত পবিত্রই হোক, মানুষের আচরণ যাচাই করার সময় বাহ্যিক কোন অনুশাসনের চেয়ে বিবেকের অনুশাসনই শ্রেষ্ঠ।"

ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন এক শক্তিশালী সংস্কার আন্দোলন হয়ে উঠেছিল। এর প্রভাব পড়েছিল বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে এবং তা ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গোঁড়া হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যেই এই সংস্কারের সূচনা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। হিন্দু সমাজে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আন্দোলন, গোঁড়া মতাবলম্বী লোকেদের রীতিমত নাড়া দিয়েছিল। তার কারণ, বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্মকে কোনদিন বর্জন করেননি উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একজন নিষ্ঠাবান, এমনকি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।

পাশ্চাত্য প্রভাব এবং নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ধর্মীয় ও সমাজ জীবনের সংগঠিত ক্ষেত্রের মত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কম প্রতিফলিত হয়নি। পাশ্চাত্য প্রভাব সরাসরি সর্বাধিক পড়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের ওপর

(১৮২৪-৭৩)। তিনি বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাবের এক উল্লেখযোগ্য রূপান্তর এনেছিলেন। সবচেয়ে সার্থক সাহিত্য রচনা 'মেঘনাদ বধ কাব্য।' রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই কাব্য গ্রন্থটিতে মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। তাঁর সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাগুলিও ইংরেজ কবিদের ভাবনা কল্পনা ও রচনাশৈলীর অনুসরণে রচিত। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে বাহ্যিক ভাবে অনুকরণ করে নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবকল্পনাগুলিকে একটি ভারতীয় ভাষায় নিজস্ব করে নিয়ে তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। অন্য লেখকরা মধুসূদন দত্তকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তাঁদের রচনায় যুগের নানা দিকের নিত্য নূতন প্রয়াস প্রতিফলিত হলো। অন্যতম উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)। তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস, 'আনন্দ মঠ'-এর রাজনৈতিক অভিভাবন ও জনপ্রিয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' রাজনৈতিক আন্দোলনকে আজকের দিনেও উদ্বুদ্ধ করে।

একটা গতিশীল সমাজ ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল সেই শতাব্দীর শেষভাগে তা শুধু যে সম্প্রসারিত হলো তাই নয় কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন পথে পরিচালিত হলো। পাঞ্জাবের শিখ সংস্কার আন্দোলন, বাংলার বৈষ্ণব আন্দোলন, মারাঠীয় রাজনৈতিক আন্দোলন, এইসব কয়েকটি সীমাবদ্ধ আন্দোলনের প্রকাশ ছাড়া ভারতীয় সমাজে কয়েক শতাব্দী ধরে অপেক্ষাকৃত যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা থেকে একটা উত্তোরণ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

দেশের এমন একটা অবস্থায় ১৮৪৮ সালের ১৩ই আগষ্ট রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে রমেশ চন্দ্র দত্তের জন্ম হলো। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নীলমনি দত্তের জন্ম ৩রা জানুয়ারী ১৭৫৭ সালে। ঐ দিনেই ক্লাইভ কলকাতা

পুনর্দখল করেছিলেন। পারিবারিক ইতিহাসে জানা যায় নীলমণির পিতামাতা সেই সময় বর্ধমান জেলার আজাপুরের পিতৃপুরুষের বসতবাটি ছেড়ে কলকাতা অভিমুখে রওনা হন। নীলমণি দত্তের প্রতিষ্ঠিত পরিবারে কয়েকজন অসাধারণ নারী ও পুরুষ জন্ম নেন। সমসাময়িক সমাজে তাঁরা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পাণ্ডিত্যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। যেসব বিশিষ্ট ভারতীয় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবকে নিজেদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে এঁরা অন্যতম। উল্লেখযোগ্য হলেন রসময় দত্ত—নীলমণি দত্তের ছেলে। তাঁর সম্বন্ধে রমেশ দত্ত লিখেছেন, "তাঁর বাড়িতে ইংরেজী বইয়ের চমৎকার সংগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর ছেলেদের মনে ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সুতীব্র তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছিলেন যা আজও এই পরিবারের একটা বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য প্রভাবে উদ্‌বুদ্ধ হিন্দু সমাজে রসময় দত্তের জীবন একটা যুগ সন্ধিক্ষণের সূচনা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অল্প কয়েক বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।"

রসময় দত্তের ছেলে গোবিন্দ চন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শশী চন্দ্র এই ঐতিহ্যকে আরো বিকাশিত করে তোলেন। রমেশ চন্দ্র বলেছেন, গোবিন্দ চন্দ্র তাঁর প্রথম জীবনে "ইংরেজী কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। এই সংকলনটি ও তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই শশী চন্দ্র দত্ত রচিত কয়েকটি কবিতা, ইংলণ্ডের 'ব্ল্যাকউড্' নামে সাময়িক পত্রিকার পুস্তক সমালোচনা বিভাগে ন্যায্যতই প্রশংসিত হয়েছিল। দত্ত পরিবারের প্রতিভাধর তরুণ বংশধরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোবিন্দ চন্দ্রের দুই কন্যা, অরু দত্ত ও তরু দত্ত। দু'জনেই কুড়ি বছর পার না হতেই মারা যান। তরু দত্তের প্রধান রচনা 'A Sheaf Gleaned in French Fields'—ফরাসী রোমান্টিক স্কুলের ফরাসী গীতি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ। বিখ্যাত সমালোচক এডমণ্ড গ্যসে এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে যদি এসব গীতি কবিতা একেবারে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ভারতীয় সংকলন থেকে বেশ কিছু কবিতা উদ্ধার

করা একেবারে অসম্ভব হবে না। 'Ancient Ballads of Hindusthan' ও অন্যান্য কবিতাকেও, এডমণ্ড গ্যসে কম প্রশংসা করেননি। তাই তরু দত্তের মৃত্যুর পরে তিনি লিখেছিলেন, "তরু দত্তের অকাল মৃত্যুতে আমরা কি হারালাম তা বোঝাতে যা-ই বলিনা কেন তা অতিরঞ্জিত হবেনা। মাত্র ২১ বছর বয়সে মাতৃভাষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কয়েকটি বিদেশী ভাষায় সে চিরন্তন কিছু সৃষ্টি করে গেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কোন পুরস্কার নেই যা এই মেয়েটির প্রাপ্য নয়।"

রমেশ চন্দ্রের পিতা ঈশান চন্দ্র। রমেশ চন্দ্রের বয়স যখন মাত্র তেরো বছর তখন এক দুর্ঘটনায় ঈশান চন্দ্র মারা যান। রমেশ চন্দ্রের কাকা শশী চন্দ্র তাঁর অভিভাবক হলেন। রমেশ চন্দ্রের জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। ঈশান চন্দ্র ও শশী চন্দ্র দু'জনেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় ঈশান চন্দ্র যে সব কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পর ছাপা হয়। কবিতা ও প্রবন্ধগুলিতে তাঁর সাহিত্য প্রীতি প্রতিফলিত। তিনি ডাক্তারী পড়েছিলেন কিন্তু পরে ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। প্রধানত জরিপের কাজের জন্যই বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাঁকে নিয়োগ করা হয়। ১৮৬১ সালের ৮ই মে কুষ্টিয়া সফরকালেই এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তাঁর সলিল সমাধি ঘটে।

পিতার মৃত্যুর পর রমেশ চন্দ্রের অভিভাবক হলেন শশী চন্দ্র। শশী চন্দ্রের যেমন ছিল মেধা, তেমনি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যা রামবাগান দত্ত পরিবারের অনেককে অসাধারণ মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। নিজে হিন্দু কলেজের ছাত্র। পরিবারের যে সাহিত্য প্রীতি ছিল তা তিনি পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই গোবিন্দ চন্দ্রের মত তিনিও তাঁর কবিতার জন্য ইংলণ্ডের 'ব্ল্যাক উডস্' পত্রিকার প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ইকো' লিখেছিলেন, "শশী চন্দ্র দত্ত লেখক হিসাবে সাফল্য অর্জন করেছেন তার

কারণ তাঁর লেখবার একটা আলাদা ও বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে, বিবরণের মধ্যে আছে স্বচ্ছতা, অল্প কথায় কাহিনী বলার অপূর্ব ক্ষমতা, রসবোধ ও রুচিশীল অনুভূতি।"

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশে তখন নতুন বিশ্বাস ও ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সন্ধিক্ষণে রমেশ চন্দ্রের জন্ম। শুধু তাই নয় তিনি জন্মেছিলেন এমন একটি পরিবারে, যে পরিবার এই নতুন শিক্ষাধারাকে আপন করে নিতে পেরেছিলো এবং তাতে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিলো। মূলতঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল সীমিত। পরবর্তীকালে রমেশ চন্দ্র এই বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। সাংস্কৃতিক পরিবেশ, ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদার চিন্তাধারা—দত্ত পরিবারের এইসব গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিটিকে নানাদিকে এগিয়ে যাবার রসদ জুগিয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন

ঈশান চন্দ্র দত্ত ও থাকমণির চার ছেলে, দুই মেয়ে। এদেরই একজন হলেন রমেশ চন্দ্র দত্ত। ভাইবোনদের মধ্যে বড় ভাই যোগেশ চন্দ্রের প্রতি রমেশ চন্দ্র বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। যদিও তাঁর সঙ্গে অগ্রজের বয়সের পার্থক্য ছিল মাত্র তেরো মাসের। দু'জনেই একই সঙ্গে বড় হয়ে ওঠেন এবং দু'জনের আজীবন বন্ধুত্ব ছিল। সারা জীবন ধরে এই দুই ভাইয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের যে আদানপ্রদান হয়েছিল তাতে শুধু যে রমেশ চন্দ্রের জীবনের বহু ঘটনা জানা যায় তাই নয়, নানা জরুরী বিষয়, বিশেষ করে তাঁর জীবনাদর্শ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আগেই বলা হয়েছে রমেশ চন্দ্রের যখন তেরো বছর বয়স তখন এক দুর্ঘটনায় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এর দু'বছর আগে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। পিতা যখন জীবিত ছিলেন, দুই ভাই যোগেশ ও রমেশ বাল্যকালে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছিলেন এবং বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। দুই ভাইই পরবর্তী জীবনে অল্প বয়সের এই সুখের দিনগুলির কথা স্মরণ করে অনেক কথা লিখেছেন। বড় ভাই যোগেশ চন্দ্রের লেখায় তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণে জানা যায়, দুই ভাই কলকাতায় এক পাঠশালায় পড়াশুনা শুরু করেন। সেখান থেকে একটি বাঙ্গালী স্কুলে তাঁরা পড়তে যান এবং সেখান থেকে হেয়ার স্কুলে। বিখ্যাত ইংরেজ সংস্কারক ডেভিড হেয়ার এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু কলকাতার স্কুলে তাঁরা একনাগাড়ে পড়াশুনা করতে পারেননি। কুমারখালি ও মুর্শিদাবাদ জেলার স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করে দুই ভাই আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৫৭ সালে তাঁরা পাবনার একটি স্কুলে ভর্তি হন। পাবনার দিনগুলির কথা যোগেশ চন্দ্র স্মরণ করেছেন :

"পাবনাতে এসেই আমরা একটি স্কুলে ভর্তি হলাম। পড়লাম প্রায় এক বছর। আমার বেশ মনে আছে পরীক্ষায় আমার ভাই ক্লাসে প্রথম পুরস্কার পেলো। পরীক্ষাও শেষ হলো, স্কুলও ছাড়লাম। বাড়িতে এক শিক্ষকের কাছে আমরা পড়তে লাগলাম। পাবনায় আমরা ঘোড়ায় চড়তে শিখলাম। ঘোড়া ছিল কিন্তু জিন্ ছিলনা। তখনকার দিনের আদবকায়দায় গদিতে (কাপড়ের জিন্) বসে ঘোড়ায় চড়তাম। যখন রাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন আমরা পাবনায়। পাবনা যখন ছাড়বো ছাড়বো করছি একটা ঘটনা ঘটলো। আমার ভাইয়ের অল্প বয়সে কতটা বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিলো এই ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। একদিন আমরা ও অন্য দুটি ছেলে একটি কাঠের বাক্স নিয়ে খেলা করছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন একজন করে বাক্সের মধ্যে ঢুকবো ও তার ঢাকনা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমার পালা যখন এলো আমার ভাই তখন একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। দু'জন ছেলে ঢাকনা বন্ধ করে শেকল শক্ত করে বেঁধে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠলাম, ঢাকনা খোল। সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে ঢাকনা খুলবার চেষ্টা করলাম। এতে শেকল আরও শক্ত ভাবে আটকে গেল। ছেলে দুটি কিছুতেই শেকল খুলতে পারল না। আমার ভাই চিৎকার শুনে ছুটে এলো। বাক্সের ঢাকনাটা নীচের দিকে চেপে ধরলো এবং শেকল খুলে ঢাকনাটা তুললো। আমি স্বস্তির নিংশ্বাস ফেললাম।"

রমেশ চন্দ্র দত্ত নিজেও তাঁর অল্প বয়সের স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন :

"অল্প বয়সে বাবার সঙ্গে আমি বাংলার বিভিন্ন জেলা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। বাবা ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। অল্প বয়সের সেইসব স্মৃতি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।"

রমেশ দত্ত পাবনায় দু'বছর ছিলেন। সে কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন :

"সেইসব দিনগুলি ছিল ঘটনাবহুল। কারণ তখন উত্তর-পশ্চিমে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। সিপাহী বিদ্রোহের নিত্য নূতন খবর প্রত্যেক সপ্তাহে আসছে। ব্রিটিশ সৈন্যের একটি কোম্পানী তখন পাবনায় মোতায়েন করা হয়েছিল। মাঝে মধ্যে এই সৈন্যরা কয়েকটি জায়গায় অত্যাচার শুরু করে দিল। তার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানানো হলো। বিদ্রোহ যখন শেষ হলো আর সৈন্যেরা সে জায়গা ছেড়ে চলে গেলো, সারা শহর নিশ্চিন্ত হলো। তাদের চলে যাবার আগে ম্যাকবেথ নাটকটি অভিনীত হল। বাবার কাছে ম্যাকবেথের গল্প শুনেছিলাম। জীবনে প্রথম দেখলাম এই মঞ্চাভিনয়। আমি যে আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে এই অভিনয় দেখেছিলাম তা কখনো ভুলব না।"

বাল্যকালের কথা স্মরণ করে রমেশ দত্ত নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, "পাবনা স্কুলে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছি, পুরস্কারও পেয়েছি। যদিও তার যোগ্য বলে আমি ভাবিনি। কারণ দাদা ও আমি ভয়ানক দুরন্ত ছিলাম। সারাদিন ধরে খেলতে ও দুষ্টুমি করতে ভালবাসতাম। মুক্ত প্রান্তরে ঘুরে ফিরে বেড়ানো উপভোগ করতাম। কখনও হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি থেকে সোজা চলে যেতাম পদ্মা নদীর পারে। সমুদ্রের মতো বিশাল এই নদীর প্রচণ্ড স্রোত, ঢেউ, ঘূর্ণিস্রোত দেখে অবাক হয়ে যেতাম। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেতো। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা করতো কিন্তু দেহে ও মনে সতেজ হয়ে উঠতাম।"

১৮৬১ সালের ৮ই মে রমেশ চন্দ্রের বাবা ঈশান চন্দ্র পরলোক গমন করেন। রমেশ চন্দ্র ও তাঁর বড় ভাই যোগেশ চন্দ্র তখন কলকাতায় থাকতেন। তাঁদের মা মারা যান দু'বছর আগে। বাবার মৃত্যুর পর অভিভাবক হলেন কাকা শশী চন্দ্র দত্ত। যোগেশ চন্দ্র সেকথা স্মরণ করেছেন :

"বাবার মৃত্যুর পর আমার কাকাবাবু শশী চন্দ্র দত্ত আমাদের মানুষ করার দায়িত্ব নিলেন। আমাদের বাসায় তিনি এসে রইলেন। অনেক রাত পর্যন্ত

তিনি আমাদের নিয়ে বসতেন। ইংরেজ কবিদের কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা পড়তে বড় ভালবাসতাম। কাকার কাছ থেকে আমার ছোট ভাই দুটো মস্ত গুণ পেয়েছে। চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও সাহিত্যিক হিসাবে নাম করার সুতীব্র বাসনা। কাকার সঙ্গে আমাদের কত সুখেই না দিন কেটেছে। সে সুখের পথে কোন প্রতিবন্ধক ছিলনা।"

১৮৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রমেশ দত্ত কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করলেন। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে রমেশ চন্দ্র প্রথম স্থান আধকার করে মাসিক ১৪ টাকার বৃত্তি পেলেন। সেই বছরই এনট্রান্স পাশ করার আগে তাঁর বিয়ে হল মাতঙ্গিনী (মোহিনী) বোসের সঙ্গে। প্রাচীন গোঁড়া হিন্দু মতে অভিভাবকরাই তাঁর বিয়ে দিলেন। বর ও কনে তখন একেবারেই ছেলেমানুষ। প্রায় ৪৫ বছরের বিবাহিত জীবনে তাঁরা দু'জনেই খুব সুখে-শান্তিতে ঘরসংসার করেছেন। তাঁদের ছ'টি সন্তান—পাঁচটি কন্যা, একটি পুত্র।

এনট্রান্স পাশ করে রমেশ দত্ত ভর্তি হলেন বাংলার তৎকালীন সেরা কলেজ প্রেসিডেন্সিতে। দু'বছর পরে প্রথম কলা বিভাগের পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ৩২ টাকার বৃত্তি পান। তৎকালীন বাংলার অন্যতম খ্যাতনামা পুরুষ স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁর কলেজের দিনগুলি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

"১৮৬৫ সালে রমেশ চন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ হলো। তখন সে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তখন আমিও অঙ্কের সহকারী-অধ্যাপক হিসাবে সবে কলেজে কাজ পেয়েছি। ছাত্রদের আমি কয়েকটি প্রশ্ন দিয়ে বাড়ির থেকে সেগুলির উত্তর লিখে আনতে বলতাম। পর পর দু'বার দত্ত হোম-টাস্ক করলো না। গাফিলতীর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। বললো অঙ্ক কষতে ভাল লাগেনা, হাঁপিয়ে ওঠে। আলাদা ডেকে বুঝিয়ে বললাম—অঙ্ক তো তোমাকে করতেই হবে। কিন্তু সেজন্যে তোমার

নিউটন বা লাপ্লাসের মেধা না থাকলেও চলবে। কাজ করতেই হবে এ সঙ্কল্প নিয়ে বসলে দেখবে কত সহজে কাজ হয়ে যায়। সে কোন উত্তর দিলনা। বুঝলাম আমার বকুনী তার মনে লেগেছে। তারপর থেকেই আমি লক্ষ্য করলাম তরুণ ছাত্রটি এ বিষয়ে বেশ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমিও তখন তরুণ, সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি। রমেশ দত্ত আমার উপদেশ এত সহজে ও এত ভালভাবে নিয়েছে দেখে প্রমাণ পেলাম ছেলেটি সৎবুদ্ধি-সম্পন্ন ও দৃঢ়চেতা। সেই সময়ে আমার মনে হয়েছিলো যেসব গুণ থাকলে মহৎ হওয়া যায়, এই তরুণ ছাত্রটি সেইসব গুণের অধিকারী।"

ভারতবর্ষে প্রথম জীবনের শিক্ষা, ইংরেজী সাহিত্য ও সমসাময়িক য়ুরোপীয় চিন্তাধারার প্রতি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই তাঁর মনে ইংলণ্ডে গিয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করার বাসনা জাগে। তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্যে প্রতিযোগিতায় নামতে সঙ্কল্প করেন। তখনও পর্যন্ত এতে মাত্র একজন ভারতীয় সফল হয়েছিলেন। তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই। তখনকার দিনে সিভিল সার্ভিসে পাশ করা বড় শক্ত ব্যাপার ছিল। এ উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করা সহজসাধ্য ছিলনা। কারণ বিশ্বের মধ্যে না হলেও এ প্রতিযোগিতা দুরূহ ছিল বলেই নয়, তার চেয়েও যেটা বড় কারণ, তা হলো সমুদ্রপাড়ি দিয়ে য়ুরোপে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হলে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে তীব্র বাধার সম্মুখীন হতে হতো! রমেশ চন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। অনেকটা ষড়যন্ত্রের মত অতি গোপনে পরিকল্পনা করতে হলো, তাঁর অগ্রজ যোগেশ চন্দ্র ছাড়া এ ব্যাপার আর কাউকে জানানো হলো না। রমেশ চন্দ্রের আরও দু'জন বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও বিহারীলাল গুপ্তের একই বাসনা ছিল। তিন জনের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মা-বাপের অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু রমেশ চন্দ্র ও বিহারীলালকে রাত্রির অন্ধকারে ঘর ছেড়ে পালাতে হলো। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও দুই বন্ধুর নামে বার্থ বুক

করা হলো। ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ তিন জনে কলকাতা ত্যাগ করলেন। তাঁদের জীবনে এই দুঃসাহসিক অভিযান স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই রোমাঞ্চকর যাত্রার সময়ে রমেশ চন্দ্রের মনে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিল, যোগেশ চন্দ্রকে লেখা তাঁর চিঠিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

"আমরা সবাই ডেক-এ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রাত্রির শোভা দেখতাম। দৃশ্য দেখে মনে যে ভাব ওঠার কথা, দৃশ্য দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে তা ছাপিয়ে উঠতো অন্য চিন্তা। বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জনদের না জানিয়ে আমরা বাড়ি ও আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যাচ্ছি সর্বস্ব পণ করে, ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়ে। এমন একটি কাজের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে যাচ্ছি, অতীতের অভিজ্ঞতা বলে সে কাজে সফলতা অর্জন করা কত শক্ত ব্যাপার। আমাদের এই পরিকল্পনার বিষয়ে সামান্যতম ইঙ্গিতও যদি আমরা দিতাম, দেশ ছাড়বার সব সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়ে যেতো। আমরা সমুদ্র পাড়ি দেবো এটাতে অভিভাবকরা কখনই সম্মতি দিতেন না। একটা অসম্ভব কাজে নামতে সাহস করেছি, এটাকে বিচক্ষণ বন্ধুরাও পাগলামী ছাড়া আর কিছু বলতেন না। এই মনোভাব, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির বিরুদ্ধে, আমরা দুরূহ যাত্রা শুরু করেছি—চুপিচুপি ঘর থেকে পালিয়ে একেবারে অসম্ভব সাফল্যের আশায় সবকিছু ঝুঁকি নিয়েছি। সত্যিই কি আমরা সফল হবো ? অথবা রিক্ত, আশাহত, সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা কি দেশে ফিরবো শুধু পরামর্শদাতাদের কটূক্তি শুনতে আর আমাদের ভুলের জন্য বন্ধুবান্ধবদের হা-হুতাশের সম্মুখীন হতে ? রাত্রির ভাবগম্ভীর স্তব্ধতায় এইসব চিন্তাই আমাদের মনে জাগছে আর এই চারদিকের বিষণ্ণ আকাশ ও বিষাদগ্রস্ত সমুদ্রের চেয়েও হতাশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ ; অনুজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোথাও কোন আশার আলো খুঁজে পাচ্ছিনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

য়ুরোপে তিন বছর

রমেশ চন্দ্র দত্ত ও তাঁর দুই বন্ধু ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে পৌঁছলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেবার জন্য আদাজল খেয়ে পড়তে লাগলেন। খুব শক্ত এই প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হতো—লিখিত ও মৌখিক ভাবে। পরীক্ষায় প্রার্থীরা যেসব বিষয় বেছে নিতেন, সেগুলির নম্বর যোগ করে মোট যোগফলের ভিত্তিতে তাঁদের কৃতিত্বের বিচার হতো। রমেশ দত্ত পাঁচটি বিষয় বেছে নিয়েছিলেন, যেমন, ইংরেজী (ইতিহাস ও রচনা সমেত) অঙ্ক, মনস্তত্ব, দর্শন, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত। সংস্কৃতে পুরো নম্বর ছিল মাত্র পাঁচশো। তাই সংস্কৃতের ব্যাপারে ভারতীয় প্রার্থীদের খুবই ক্ষতি হতো। রমেশ চন্দ্র একথাই ভাইকে লিখেছিলেন, "ইংরেজী ছাত্রদের তুলনায় এটাই আমাদের মস্ত অসুবিধা। কারণ তারা নেয় ল্যাটিন ও গ্রীক—দু'টো বিষয়ের জন্য থাকে পুরো পনের'শ নম্বর। সুতরাং ইংরেজ ছাত্ররা এইসব বিষয়ে অনেক বেশী নম্বর তুলতে পারে ; আমাদের সংস্কৃতে অত নম্বর তোলা সম্ভবপর নয়।"

এই অসুবিধা সত্বেও রমেশ চন্দ্র নিরুৎসাহিত হননি। তিনি এ ব্যাপারে গুরুতর কোন অভিযোগও করেননি। তিনি লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে পড়াশুনা শুরু করে দিলেন। সেখানেই তিনি বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। অবসর সময়ে কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকের কাছে তিনি পড়তে লাগলেন। তাঁদের কাছ থেকে তিনি যে সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছিলেন সেকথা বলতে গিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিঃ হেনরী মরলে। তাঁর সম্বন্ধে তিনি বিশেষ করে লিখেছেন :

"মিঃ হেনরী মরলের মত এত সদাশয়, খাঁটি এবং হৃদয়বান ইংরেজ আমি

খুব কম দেখেছি। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। আমরা তাঁর ক্লাসে যোগ দিতাম, অবসর সময়ে তাঁর কাছে পড়তাম, তাঁর আতিথেয়তার আমরা অংশীদার ছিলাম। তাঁর সহৃদয় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, আর তাঁর সৎউপদেশে আমরা সব সময় উপকৃত হয়েছি। তাঁর বাড়িটাকে আমরা নিজেদের বাড়ি বলেই মনে করতাম। তাঁর পড়বার ঘরের চারদিকে সারি দিয়ে বইপত্র সাজানো থাকতো। এই ঘরে বসে কত উপদেশ শুনেছি, কত নির্দেশ শিরোধার্য করেছি। কত সুখেই না এখানে সময় কেটে গেছে।

তাঁর প্রতি রমেশ দত্তের এই গভীর শ্রদ্ধার প্রতিদানে অধ্যাপকও তাঁকে কম ভালবাসতেন না। কারণ রমেশ চন্দ্র ও তাঁর বন্ধুদের সম্পর্কে অধ্যাপক মরলে লিখেছেন :

"উচ্চ শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে এরা এদেশে এসেছে। এদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার। ইংলণ্ডের প্রতি এদের গভীর প্রীতির ভাব। এরা ভদ্র, নির্ভীক ও কঠোর পরিশ্রমী। চরিত্রবান। সেরা ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে পাল্লা দিতে এরা সক্ষম। এক নাগাড়ে বারো ঘণ্টা এমনকি দিনে পনেরো, ষোল ঘণ্টা ধরে এরা সমানে কাজ করেছে। এরকম ঝুঁকি যাদের নিতে হয় তাদের সবারই পরিশ্রম করা উচিত। এই পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য এরাও কম ঝুঁকি নেয়নি।"

কঠিন পরিশ্রম সার্থক হলো। কারণ ১৮৬৯ সালের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফল যখন বেরুলো, রমেশ দত্ত শুধু যে সফল প্রার্থীদের একজন হলেন তাই নয়, কৃতী ছাত্রদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন। তাঁর দুই বন্ধু, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি ও বিহারীলাল গুপ্তও কৃতকার্য হলেন। সাফল্য অর্জন করলেন আরও একজন ভারতীয়, বোম্বাইর শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর। চারজন ভারতীয়ের পক্ষে এ কৃতিত্ব কম গৌরবের ছিলনা। অধ্যাপক মরলের কথায় :

"এই অপরিচিত দেশে নিজেদের দেখাশুনা এদের নিজেদেরই করতে হয়েছে। যে ঝুঁকি এরা নিয়েছে অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে একে বিপজ্জনক ঝুঁকি বলা যায়।

ইংলণ্ডে তাদের পাঠ্যবিষয়ে দু'তিনশো ইংরেজকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করা সহজসাধ্য নয়।"

১৮৬৮ সালে এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় জয়ী হবার জন্য রমেশ দত্তকে কম ব্যস্ত থাকতে হয়নি, মনটাও কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলনা। কিন্তু তবুও তিনি নানা জায়গায় ঘুরতে সময় পেয়েছেন, যে দেশে গেছেন, সে দেশকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তী জীবনে তিনি যে ভ্রমণের স্পৃহা ও গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা ছাত্রজীবনেই সুতীক্ষ্ণ হবার সুযোগ পেয়েছিলো। ১৮৬৮ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি ব্যাপক-ভাবে স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন এবং সেসব অভিজ্ঞতার কথা তিনি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া সেবছর নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেজন্য ব্রিটিশ রাজনৈতিক পদ্ধতিকে তিনি খুব ভালভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছেন কারণ এতে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর যে গভীর অনুরাগ পরবর্তী জীবনে প্রতীয়মান হয় ইংলণ্ডে তার সূচনা না হলেও ছাত্রাবস্থায় সেখানে তিনি যেসব জিনিষ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তার প্রভাবের ফলশ্রুতিই এই অনুরাগ। নিজেদের ব্যাপারে ব্রিটিশদের কত ব্যাপক আগ্রহ—সে কথা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন :

"যে দেশে এমন সব লোক, স্বভাবতই আশা করা যায় এরাই উন্নতি বিধানের পথ করে নেয়। কারণ জনসাধারণই এখানে সরকার।" পরে তিনি আরো মন্তব্য করেন, "এই হলো ইংলণ্ড। এদেশে জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। আমেরিকা ছাড়া, সারা বিশ্বের আর কোথাও এ ধরনের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই—যা এঁরা নিজেরা অর্জন করেছেন। এঁরা যদি এই স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

১৮৬৯ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করে, রমেশ দত্ত ভ্রমণের আরও অনেক বেশী সুযোগ পেলেন। শুধু ব্রিটেনেই নয়, য়ুরোপের

নানা দেশে তিনি এ সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছেন। ব্যাপকভাবে তিনি ভ্রমণ করেছেন গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালী। প্রথম জীবনে লেখা একটি বইয়ে তিনি এইসব ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। বইটির নাম 'য়ুরোপে তিন বছর'*। এইসব বিবরণে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রতিফলিত। য়ুরোপীয় ইতিহাস ও সভ্যতার বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়। তাছাড়া এতে তাঁর চরিত্রের আরও দু'টি মহৎ গুণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, গরীব ও নির্যাতিতদের জন্যে তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও সহানুভূতি আর দ্বিতীয়, য়ুরোপের যা কিছু ভাল তা আপন করে নেওয়ার আকাঙ্খা। তাঁর স্বদেশ প্রীতিই এ বিষয়ে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ব্রিটেনের অগ্রগতি, বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার ব্যাপারে তারা যে কতটা এগিয়ে গেছে সেটা দেখে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাই বলে দেশের দরিদ্র ও দুঃখীদের জীবনযাত্রার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অন্ধ ছিলেন না। তিনি মন্তব্য করেছেন, "ওদের অনেক মহৎ গুণ। কিন্তু ইংলণ্ডের নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের যা অবস্থা তার চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের হওয়া উচিত ছিল। এদের চরিত্র, কয়েকটি জঘন্যতম পাপে ক্লিষ্ট ক্লেদাক্ত। মদ্যাসক্তি ও স্ত্রীর উপর অত্যাচারের ঘটনা এদের মধ্যে যত বেশী— তাতে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। এদের স্বাধীনতা বোধের মধ্যে অনেক সময় ঔদ্ধত্যেরই পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই ঔদ্ধত্যের ফলেই এরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঘরে ক্ষুধার্ত স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা অনাহারে ক্লিষ্ট। এদের জন্য দুশ্চিন্তায়, এদের যন্ত্রণা সইতে না পেরে নেশাগ্রস্ত স্বামী ও পিতা কখনও কখনও অত্যাচারের আশ্রয় নেয়। পুলিসের ও আদালতের কাছ থেকে এরকম অত্যাচারের খবর রোজই শোনা যায়। কিন্তু লোকেরা আর বিস্মিত হয়না কারণ, এ সব তো লেগেই আছে।"

* *Three years in Europe*

আর এক জায়গায় আয়ারল্যাণ্ডের কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

"গ্রামবাসীরা সত্যিই খুব গরীব। স্বামী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে একই জমিতে কাজ করতে দেখা যায়। ছেলেমেয়ের সংখ্যা এদের নেহাৎ কম নয়। রোদে বৃষ্টিতেও কাজের বিরাম নেই। রাত্রিবেলা সবাই একই ঘরে শোয়। সেই জীর্ণ কুটিরে হয়তো একই সঙ্গেই থাকে তাদের শুয়োর ও হাঁস-মুরগী।" স্পষ্টতই ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করে তিনি উপসংহার টেনেছেন, "এটিই একমাত্র উর্বরা দেশ নয় যেখানে কৃষকেরা খুবই গরীব।"

প্রথম জীবনেই রমেশ দত্ত দেশপ্রেম ও দেশ সম্বন্ধে দূরদৃষ্টির উল্লেখযোগ্য পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৭০ সালের নভেম্বর মাসে 'দি এশিয়াটিক' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন :

"ভারত সরকারের প্রশাসন বিভাগে প্রতিনিধিত্বের ন্যায্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সত্যি সময় এসেছে। ভারতীয়দের গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের পথে এখন যেসব অসুবিধা আছে—সেগুলি ধীরে ধীরে দূর করা যেতে পারে ; তখন এ দেশকে রক্ষা করতে একটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করার প্রয়োজন হবে।"

১৮৭১ সালে য়ুরোপ প্রবাসের শেষের দিকে তিনি তাঁর ভাইকে চিঠি লিখে মনের যে অনুভূতি তুলে ধরেন সেটা আরও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, "আমরা যত ইংলণ্ডকে জানবো, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত ঘনিষ্ঠতর হবে, বর্তমান য়ুরোপের অনেক মহৎ গুণ, অনেক মহতী সংস্থা গড়ে তোলার শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারবো বলেই আমার বিশ্বাস। য়ুরোপের যেসব গুণ ও যেসব সংস্থা অনুকরণযোগ্য, তা আমাদের গ্রহণ করা খুবই দরকার। আমাদের ছেলেমেয়েদের এবং তাদের উত্তরসূরীরা হয়তো ভারতের সেই শুভ দিন দেখবে যখন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সত্যিকারের সামাজিক প্রগতিতে ভারত

বিশ্বের নানা দেশের মধ্যে গৌরবময় স্থান অধিকার করবে। ভারতের সে শুভদিন তাড়াতাড়ি আসুক।"

প্রায় এক শতাব্দী আগের লেখা রমেশ চন্দ্রের এইসব উক্তি। আমরা, যারা তাঁর উত্তরসূরী, তারা, এযুগে সেই আদর্শকে অনুসরণ করে একটা অভীষ্টলক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করছি। আজকের ভারতের পক্ষে যা প্রযোজ্য তারই পটভূমিকায় তিনি নতুন ভারতের চিত্র মনে মনে এঁকেছিলেন, নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আজকের অবস্থার সামান্যতম আভাস সেদিন পাওয়া সম্ভব ছিলনা।

একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, "উঠতি মূলো পত্তনেই চেনা যায়।" রমেশ চন্দ্র তরুণ বয়সে য়ুরোপে তিন বছর কাটিয়েছেন। ছোটবেলায় না হলেও এই তরুণ বয়সে নির্ভুল আভাস পাওয়া গিয়েছিলো তিনি কি ধরনের মানুষ হয়ে উঠবেন। তিনি য়ুরোপের সংস্পর্শে এসেছেন। কয়েক বছরে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তার ফলে তাঁর মত একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিকের মনে আমাদের দেশের অনুন্নত অবস্থা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা জন্মেছিল। তাঁর দেশ একই পথে এগিয়ে যাক—এটা দেখবার বাসনাও তাঁর অন্তরে দুর্বার হয়ে উঠেছিল। এটাও অভিজ্ঞতার ফল। তিনি ইংলণ্ডে আদর্শস্থানীয় প্রতিষ্ঠান দেখেছেন। দেখে তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন, ভারতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কেন গড়ে উঠবে না? বাণিজ্য ও শিল্পে ইংলণ্ডকে তিনি এগিয়ে যেতে দেখেছেন। তাই ভারতে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার হোক সে শুভদিনটি দেখবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৭১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত যে তিন বছর সময়, রমেশ চন্দ্র যেভাবে সদ্ব্যবহার করেছেন এর চেয়ে আর কি ভাল হতে পারতো। এই সময়ের মধ্যে তিনি এক অজানা দেশে পাড়ি দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক এক কঠিন পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি

'বার'-এর জন্যও যোগ্য বলে বিবেচিত হন ; এবং শিক্ষানবিসদের জন্য আয়োজিত চূড়ান্ত পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ইংলণ্ডের ও য়ুরোপের নানা দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান এবং পশ্চিমী সংস্কৃতির স্থায়ী মূল্যবোধকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে শেখেন। সর্বোপরি তিনি তাঁর নিজের দেশকে এক নতুন আলোকে দেখলেন। তাঁর অন্তরে দেশপ্রেমের যে প্রকাশ ঘটেছিলো তাতে এলো এক নতুন চেতনা, নতুন মূল্যায়নবোধ। তিনি চেয়েছিলেন, দেশবাসী তাঁর অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়ে দেশকে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুক। ভারতে ফিরে এসেই তিনি তাই বলেছিলেন, "আমি চাইনা, দাসত্বের মনোবৃত্তি নিয়ে আপনারা ইংরেজের সবকিছু হুবহু অনুকরণ করুন। কিন্তু আমি মনে করি ইংরেজদের আদবকায়দায় ও ব্যবহারে এমন অনেক প্রশংসনীয় জিনিস আছে, যা আমরা আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যদি প্রবর্তন করি, লাভ বই লোকসান হবেনা। তাই ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব তরুণদের ইংলণ্ডে পাঠাতে চেষ্টা করুন। কারণ তাহলে তারা নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বাধীনতা ও সমদৃষ্টির আদর্শে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ পাবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম জীবনে সরকারী চাকরী ও সাহিত্য জীবন

১৮৭১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর রমেশ চন্দ্র দত্ত আলিপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। শুরু হলো এক পরীক্ষা। এর আগে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ ছাড়া এর নজির পাওয়া ভার। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ক্ষেত্রেই শুধু নয় ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কের সামগ্রিক দিক নিয়েও এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল। একজন ভারতীয় যত শিক্ষিত হোক, যত মেধাবী হোক—উচ্চতর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা তার আছে কিনা সে বিষয়ে ব্রিটিশ প্রশাসকদের মনে গভীর সন্দেহ ছিল। এ সন্দেহের মূলে রয়েছে বিজিত জাতি সম্বন্ধে একটা বদ্ধমূল ধারণা। তাছাড়া প্রশাসনের গুরুতর দায়িত্ব এ পর্যন্ত তাঁদের স্বদেশবাসীরাই পালন করে এসেছে। অমূলক হলেও "এ সন্দেহ ও সংশয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ করতে দ্বিধা থাকবার এইটাই শুধু কারণ নয়। অন্তত আরো দু'টি কারণ ছিল যার গুরুত্ব শাসকদের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো আরও বেশী ও মূল্যবান। শাসনকারী দেশের সদস্যরা প্রশাসনের দায়িত্বভার নেওয়ায় উচ্চ ক্ষমতায় কোন ভারতীয়কে অধিষ্ঠিত করবার অনীহা ছিল সুতীব্র। ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় আইন পরিষদে স্যার উইলিয়াম হানটার এক ভাষণে বলেছিলেন :

"জানুয়ারী মাসের ১৭ তারিখে একজন ভারতীয়কে ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়ে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু জানুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে তাঁর নিয়োগ বাতিল করে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী একটি চিঠি লিখলেন। তাঁকে অন্য একটি কম গুরুত্বপূর্ণ জেলায় বদলী করা হলো। বদলীর কারণ ঢাকা ও ময়মনসিং এর

মধ্যে রেল চালু হওয়ায় বেশ কিছু সংখ্যক য়ুরোপীয় ঢাকা জেলায় যাচ্ছিলেন।"

বস্তুতপক্ষে, যে জেলায় বহু সংখ্যক য়ুরোপীয় থাকতো সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেটের উচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার কোন ভারতীয়ের ছিলনা।

যেসব ভারতীয় ভারতবর্ষকে গভীর অনুরাগের চোখে দেখতেন শাসক গোষ্ঠিরা তাঁদের খুবই সন্দেহ করতেন। প্রশাসনের অন্দরমহলে শাসক গোষ্ঠির সঙ্গে এক আসনে বসে ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যাপারে কোন ভারতীয়কেই বিশ্বাস করা হতো না। বিচার বিভাগ সমেত কয়েকটি ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার ভারতীয়দের দেওয়া হতো কিন্তু প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের বহাল করতে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। প্রশাসনিক ব্যাপারে ভারতীয়দের সম্পর্কে কতটা আস্থার অভাব ছিল এ ব্যাপারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সমকালীন একটি নামকরা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা 'দি পাইয়োনিয়র'-এর ১৮৮২ সালের ২০শে অক্টোবর সংখ্যায় যে কথা লেখা হয়েছিল তাতে এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়:

"জেলাগুলির প্রশাসনের মধ্যেই একটি দেশের সরকারী শাসনের আসল স্বরূপ প্রতিফলিত……অবশ্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই জানেন এ দেশের লোকেদের বিচারক হবার সব গুণ রয়েছে এবং বিচার বিভাগের কাউকে নিয়োগ করা হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে কোনরকম অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্ব একেবারেই আলাদা ব্যাপার। এ দেশীয় লোকেদের হাতে জেলাগুলির প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া উচিৎ কিনা বিষয়টির গুরুত্ব বিচার করে দেখলে এই যুক্তির স্বপক্ষে কোন কিছু বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।"

স্বীকার করতেই হবে এত দ্বিধা, সন্দেহ এবং রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের উদার প্রবৃত্তির সংঘাত বেধেছিল এবং তাদের উভয়সঙ্কটে ফেলেছিল। রানীর ঘোষণাপত্রে জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁর প্রজাদের সবাইকে সমান অধিকার ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক প্রশ্ন যাই

থাকুক না কেন এই ঘোষণাপত্রে এক স্থায়ী মর্যাদা ও মূল্যবোধের উল্লেখ ছিল। সেই নগ্ন ও প্রকট সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্রিটিশ শাসকরা এই ঘোষণায় যে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন—সে সময়ে তার তুলনা মেলা ভার। ব্যবহারিক দিক থেকে অবশ্য রাজনৈতিক প্রশ্নকে উপেক্ষা করা যায়নি। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় আগের উল্লিখিত একই প্রবন্ধে এই উভয়সঙ্কট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

"কিছুদিন ধরে বর্তমান সরকার একটি বিষয়ে সজাগ হয়েছেন। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁদের সামনে দুটো পথ খুলে যাচ্ছে এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কোন না কোনদিন একটি পথ তাঁদের বেছে নিতেই হবে। এ দেশের সরকারী কর্মচারীরা যত ন্যায্যভাবেই তাঁদের অধিকার অর্জন করুন না কেন, তাঁদের দাবি যত জোরালো হোক না কেন, বহুদিন কাজ করার জন্য যত দক্ষতাই তাঁরা অর্জন করুন পদোন্নতির অধিকার থেকে হয় তাঁদের বঞ্চিত করতে হবে, না হয়, ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন এ পর্যন্ত যে নীতির ভিত্তিতে চালানো হচ্ছে সেই নীতিকে লঙ্ঘন করে এ দেশের পদস্থ কর্মচারীদের হাতে রাজ্য শাসনের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হবে।"

এই পরিবেশেই রমেশ চন্দ্র দত্ত ও তাঁর দুই বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও বিহারীলাল গুপ্ত ভারতে ব্রিটিশ রাজ-সরকারের কাজে যোগ দেন। বৃটিশ সরকার কয়েক বছরের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথকে সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করার অজুহাত পেয়ে যান। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি পরবর্তী জীবনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একজন অগ্রদূত হয়ে ওঠেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। রাজনৈতিক প্রশ্নকে বড় করে দেখে, জাতি-বৈষম্যের সংস্কারকে প্রাধান্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার যে ভারতীয় প্রতিভার সহযোগিতা হারিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথের জীবন তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বিহারীলাল গুপ্ত বাংলার বিচার বিভাগে কৃতিত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেছিলেন। কিন্তু রমেশ চন্দ্র দত্তকে প্রশাসনিক বিভাগে নেওয়া হোল যা এতদিন ছিল

একান্তভাবেই ব্রিটিশ শাসকদের সংরক্ষিত বিভাগ। তিনি মনস্থ করলেন, কতগুলি বদ্ধমূল কুসংস্কার ও রাজনৈতিক নীতি তিনি ভেঙ্গে দেবেন। এ কাজ করবার মূলধন তাঁর কিছুই ছিলনা। ছিলো শুধু কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর নির্ভর করার মত ছিলো নিজস্ব প্রতিভা। চাকরীর উন্নতির জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে মাথা নত করতে হবে এ নীতি তিনি তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকেই মানতেন না। আর তার প্রয়োজনও হয়নি। উপরন্তু প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি যে অসীম দক্ষতা দেখিয়েছিলেন ভারতীয় প্রশাসন বিভাগের রূঢ়তম সমালোচকও তা অগ্রাহ্য করতে পারেননি।

আলিপুরে সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে তাঁকে প্রথমে নিয়োগ করার পর, তাঁকে আরও কয়েকটি কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিলো। ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে নদীয়া জেলার মেহেরপুরে তাঁকে রিলিফ অফিসার করে পাঠানো হয়। এই গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে তিনি কর্তৃপক্ষের প্রশংসা অর্জন করেন। অন্যদিকে এই জেলার ব্রিটিশ বাগিচার মালিকদের সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ দেখা দেয়। এঁরা রমেশ চন্দ্র দত্তের কর্মজীবনের ক্ষতি করবেন বলে হুমকি দিতে ছাড়েননি।

তাঁর বড় ভাইয়ের কাছে একটি চিঠিতে তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভেই তিনি ব্যক্তিসত্বার বিকাশকে যে কত বড় মূল্য দিয়েছিলেন এ চিঠিতে তারই প্রতিফলন রয়েছে। তিনি লিখেছিলেন, "সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে সমানভাবে গ্রহণ না করে উপায় নেই। আমার নিজের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়। কৃষ্ণনগরে যখন ছিলাম, তখন মিঃ স্টিভেন্স আমাকে জানান এক বছরের মধ্যে আমার অস্থায়ীভাবে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বাগিচার মালিকদের প্রতিনিধিরা, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে এ কথা আমার বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারণ আছে। তাই মনে হয় জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হতে বেশ কয়েক

বছর লাগতে পারে। কর্তব্যের কাছে নিজের স্বার্থ আমি বলি দিয়েছি এটা ভাবতে আমার গর্ব হয়। টাকা পয়সা বা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি। কিন্তু কর্তব্য পালনই আমার কাছে বড় কথা। তাতে আমি যা তৃপ্তি পাই, বড় লোকের ঐশ্বর্য তার কাছে কিছুই নয়।" ১৮৭৬ সালে রমেশ চন্দ্র দত্তের কর্মজীবনে সবচেয়ে দুরূহ কাজের দায়িত্ব পড়েছিল। ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পরেই এক ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য বয়ে গেল দক্ষিণ শাহবাজপুরে। এই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার বিহিত করতে তাঁকে সেখানে পাঠান হলো। ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে তিনি সেই দ্বীপে পৌঁছে যে দুরবস্থা দেখলেন তাঁর নিজের ভাষায় বললে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

"কোন যুদ্ধক্ষেত্র এর চেয়ে করুণ ও মর্মান্তিক হতে পারে না। লোকেদের বাড়িঘরের কিছুই আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই, সব ভেসে গেছে। যারা বেঁচে আছে তারা কোনমতে অস্থায়ী আস্তানা কিংবা গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে। অসংখ্য পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেউ মারা যায়নি এমন কোন পরিবার নেই। শোক এখানে স্তব্ধ। কারণ এই বিপর্যয় এত আকস্মিক মর্মান্তিক ও সর্বব্যাপী যে যারা প্রাণে বেঁচেছে এত প্রচণ্ড আঘাতে তারা শোক করতে ভুলে গেছে। কাউকে হাহুতাশ করতে বা কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে আমি দেখিনি। মৃতদেহে চারিদিক ছেয়ে আছে। বিকৃত ও গলিত শবগুলি কারো মনে কোন অনুভূতি বা বিরক্তি সঞ্চার করছে না।"

স্বাভাবিক নিয়মে এমন একটা ভয়ানক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল মহামারী। এর বর্ণনা দিয়ে রমেশ চন্দ্র লিখেছেন :

"এই দ্বীপ আর-এক দুর্বিপাকের মুখোমুখি হয়েছে। যার পরিণাম আগের চেয়ে কোনো অংশে কম ভয়াবহ নয়। অগণিত মানুষ ও গবাদিপশুর মৃতদেহ বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে, পুকুরগুলির জল দূষিত। তার ফলে কলেরা

এমন মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে যা আমি জীবনে আর কখনও দেখিনি বা দেখবার বাসনাও নেই। প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি ঘরে এই মহামারীর করাল ছায়া পড়েছে। চারিদিকে সবার মনে একটা ভয় ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কবল থেকে যাঁরা রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই এই মহামারীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। শূন্য ঘরগুলি এখন খাঁ খাঁ করছে।”

একজন প্রশাসকের কতটা ধৈর্যের ক্ষমতা তা পরীক্ষা করার জন্যে এ অবস্থা যথেষ্ট। রমেশ দত্ত তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার গুণে লোকেদের দুঃখদুর্দশার লাঘব করেছিলেন, তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন। এখানেই তাঁর চরম সার্থকতা। তাঁর এই মঙ্গলব্রতের কথা উল্লেখ করে ১৮৭৭ সালের ৮ই জুলাই তারিখে ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ লিখেছিলেন :

“তাঁর হাতে যতটুকু ক্ষমতা ও রসদ ছিল, তিনি তা এ কাজে লাগিয়েছেন। লোকেদের এই দুর্গতি দূর করতে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগগুলি যেন তৎপর হয়ে উঠেছিল। স্বল্প ব্যয়ে ও আশ্চর্য নীরবতায় তিনি এত বড় একটা কাজ করে যাচ্ছেন—যা অন্য কাউকে করতে হলে দ্বিগুণ খরচ লাগতো। এই মহৎ প্রচেষ্টায় সরকার তাঁকে সমর্থন করবেন বলে আমরা আশা করি। ধীর, স্থির, উদার ও সাহসী এই মানুষটি একজন নীরব কর্মী এবং নিজের কাজে সব সময় যেন আত্মমগ্ন। তিনি না থাকলে এ মহকুমা এই বিপদ কখনই কাটিয়ে উঠতে পারতো না। তিনি তাঁর প্রয়াসে সফলতা অর্জন করুন এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি। তিনি সরকার ও জনগণের সপ্রশংস সমর্থন লাভ করুন এটাই আমরা চাই।”

প্রায় দেড় বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রমেশ দত্ত ১৮৭৮ সালের এপ্রিল মাসে এই দ্বীপ ত্যাগ করেন। তখনকার দিনে প্রশাসনিক বিভাগের পক্ষে এটা সুনামই বলা যায় যে স্বল্পকালের জন্যে কয়েকটি বিভাগের দায়িত্ব দেবার পর ১৮৮১ সালে রমেশ দত্তকে তিন মাসের জন্যে বাঁকুড়া জেলার দায়িত্ব দেওয়া হল।

তারপর ১৮৮২ সালে আবার তিন মাসের জন্য তিনি বালেশ্বর জেলার দায়িত্ব নেন। পরিশেষে ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারের জাতিবৈষম্য নীতি সত্বেও সার্ভিসের কার্যনির্বাহক বিভাগে রমেশ দত্তের মনোনয়ন সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে। মেধাবী ভারতীয় অফিসাররা বৃটিশ সহকর্মীদের সঙ্গে সমানভাবে জেলার কার্যনির্বাহক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন, সরকার এই নীতিকে পারতপক্ষে স্বীকার করে নিলেন। এই 'সুবিধাটা' মহানুভবতার পরিচায়ক কিনা আজকের দিনে হয়তো তা নিয়ে উপহাস করতে ইচ্ছা করবে। তখনকার দিনের এই মনোভাব যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অযৌক্তিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া আর কিছু নয়, এ ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিই এই মনোভাব ওদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে ছিল। তাই তা ভেঙ্গে চুরমার করতে রমেশ চন্দ্রের মত তীক্ষ্মমেধা ও দৃঢ়চেতা মানুষের প্রয়োজন হয়েছিল। তখনকার দিনের বৃটিশ শাসক ও শাসিত ভারতীয়দের মধ্যে একটা যুক্তিসম্মত সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।

রমেশ দত্তকে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ এবং পরে কার্যনির্বাহক বিভাগে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্র পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়। এই পদে রমেশ দত্তের যোগ্যতা অনিচ্ছা সত্বেও স্বীকার করে নিয়ে এর মধ্যে একটি পত্রিকা এই মন্তব্য করে :

"এক মাঘে কি শীত যায়? অস্থায়ীভাবে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট পদে এই নিয়োগ শুধু একটি প্রশ্নই তুলেছে, প্রশ্নের সমাধান করেনি। সেই বড় প্রশ্নটার এখনো সমাধান করা বাকি।" (জেলার কার্যনির্বাহক বিভাগে ভারতীয়দের নেওয়া হবে কি হবে না এটাই বড় প্রশ্ন)

প্রশাসন ক্ষেত্রে রমেশ চন্দ্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্যে এবং প্রশাসনের উচ্চপদের দায়িত্ব ভারতীয়দের নেবার ক্ষমতা আছে এটা প্রমাণ করতে কর্মজীবনের শুরুতে তাঁকে কম পরিশ্রম করতে হয়নি। কিন্তু তবু এত

কাজের মধ্যেও তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনার সময় করে নিতেন। সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল অনেকটা প্রথম প্রেমিকের মত। সারাজীবন ধরে সাহিত্যের নানা বিষয়ে প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি অনুশীলন করেছেন। অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে নতুন চেতনা জাগানো, গণতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের আকাঙ্খা এবং বৃটিশ শাসনকালে আমাদের অর্থ নৈতিক অবনতি সম্পর্কে সচেতন করতে লেখক হিসাবে রমেশ চন্দ্রের কতটা অবদান তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে পর্যালোচনা করা হবে। সারা জীবন ধরে রমেশ চন্দ্র যে সাহিত্য রচনা ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন তার মূল্যায়ন করতে হলে কি উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তার আলোচনা করাই এখানে যথেষ্ট। শুধু আত্মপ্রকাশ অথবা স্বতঃস্ফুর্তভাবে হৃদয়কে উজাড় করে দেওয়াকেই তিনি সাহিত্য প্রচেষ্টা বলে মনে করতেন না। এ প্রচেষ্টার পেছনে তাঁর কতগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমত আমাদের বহু প্রাচীন এই জন্মভূমির অতীত গৌরব ও পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত মহামূল্যবান বৈভবরাজি সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে তিনি বর্তমান যুগের মানুষের মনে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা আস্থার ভাব জাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "তিনি সেইসব মহান দেশপ্রেমিক ও মেধাবী ব্যক্তিদের একজন হতে চান যাঁরা আমাদের নিজেদের অতীত ইতিহাস, ধর্ম ও সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন, যাঁরা চেয়েছেন আমরা নিজেদের জিনিসকে ন্যায্য মূল্য দিই ও পৌরুষোচিত সম্মান দেখাই।" এই উচ্চাভিলাষ তিনি পোষণ করতেন "কারণ, এই অর্ধ শতাব্দীতে যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে তার জন্য আমরা সেইসব মহান ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞ যাঁরা আমাদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন।"

দ্বিতীয় যে উদ্দেশ্য তাঁর এই সাহিত্য প্রচেষ্টায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তা হলো এই যে, পাশ্চাত্য জগতের কাছে বিশেষ করে যে দেশের হাতে ভারতের

শাসনভার, তাদের কাছে ভারতের প্রকৃত চিত্র তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। গণতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে যদি ভারতের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয় তাহলে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের প্রতি অবিচার করতে পারেন না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই কারণেই নিজের মাতৃ ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা সত্বেও তিনি ইংরেজী ভাষাতেই বেশী লিখেছেন। যত বড় প্রতিভাশালী ভারতীয় হোক, ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী স্বাক্ষর রাখা সম্ভব নয় এটা তিনি উপলব্ধি করেন। ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিতে তিনি প্রয়াসীও হননি। তিনি শুধু চেয়েছিলেন, ভারত সম্বন্ধে বিকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলার অপচেষ্টাকে তিনি খর্ব করবেন। কারণ গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত সম্বন্ধে বিকৃত চিত্র দিয়ে শুধু যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন তাই নয়, শাসক গোষ্ঠী যেসব প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তা বিরোধী নীতি অনুসরণ করতেন সাম্রাজ্যবাদীরা সেগুলিও যুক্তিযুক্ত বলে মনে করতেন।

পরিশেষে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল, সরকারী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন তার স্ফূরণ করা। কতকগুলি রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক নীতি সরকার গ্রহণ করুন—এই তাঁর মনোবাসনা ছিল। তাই এইসব নীতির একটা তথ্যগত পটভূমিকা তুলে ধরা তিনি সমীচীন মনে করেছিলেন।

সর্বশেষ ছ'টি উদ্দেশ্য নিয়ে বিচার বিবেচনা করার সময় একটা কথা মনে রাখতে হবে। উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকে যখন রমেশ দত্ত বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর কর্মবহুল জীবন কাটিয়েছিলেন, ভারতের ইতিহাসে সেই সময় ব্রিটিশদের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে তখন শাসকরা দমন করেছেন। এ দেশের কল্যাণের জন্য হোক বা না হোক ব্রিটিশ শাসন এদেশে অপরিহার্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। বাংলা বিভাগের আগে পর্যন্ত এইরকম একটা অবস্থা ছিল। বাংলা

বিভাগের সিদ্ধান্ত দেশে জাতীয়তাবাদের ঢেউ নিয়ে এলো। শুরু হলো সন্ত্রাসবাদী জাতীয় আন্দোলন, প্রধানতঃ বাংলাদেশে এবং পাঞ্জাবে। তখনই ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলো। তবুও প্রথম দিকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে কেউ প্রয়াসী হননি। বর্তমান শতাব্দীর দুই দশকের শেষের দিকে পূর্ণ স্বাধীনতা বা 'পূর্ণ স্বরাজের' আদর্শকে বেশীর ভাগ লোক বরণ করে নেন। তখনও সেসব ঘটনা ঘটতে অনেক বাকী। রমেশ দত্তের তরুণ বয়সে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে রমেশ দত্ত বৃটিশ রাজশক্তির প্রতি যে আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তিনি একটা 'সুষ্ঠু ও চমৎকার' শাসন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন। সরকারের নীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি যখন সমালোচনা করতেন এবং সেগুলির আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করতেন—তখন তিনি সুস্পষ্টভাবে একথাও বলতেন যে, এইসব সুপারিশ কাজে রূপায়িত হলে ব্রিটিশ ব্যবস্থাকে বরঞ্চ শক্তিশালী করবে, দুর্বল করবে না। সুতরাং ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে খর্ব করার কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিলনা। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তিনি এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যার ফলে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য শ্বেতকায় স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যের সমকক্ষ হয়ে সমান মর্যাদায় রাজ্য শাসনের গৌরব অর্জন করতে পারবে।

রমেশ দত্তের প্রথম বইয়ের নাম—'য়ুরোপে তিন বছর'। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। ১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত তিন বছর য়ুরোপে কাটাবার সময় রমেশ দত্তের যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছিল বইটির প্রথম সংস্করণে তারই বিবরণ। বইটির পরবর্তী সংস্করণের সময় তিনি পুনরায় য়ুরোপে পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা সংযোজন করেছেন। রমেশ দত্তের কতটা যে অনুভূতি-প্রবণ মন ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল—কত বিষয়ে ছিল তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ, এই

বইটি পড়লে তা বোঝা যায়। যেসব দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেন সেই সব দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কে নানাকথা জানাবার তাঁর সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল। এইসব বিষয়ে তিনি বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন। কয়েকটী শহর দেখে সেইসব শহরের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি যেসব ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই বইটিতে শুধু তাঁর পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পায়নি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার সূক্ষ্ম ক্ষমতা তাঁর ছিলো। স্কটল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের যেসব প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন—জীবনের মনোরম জিনিসকে যে উপভোগ করতে জানে তেমন একজন অনুভূতিপ্রবণ পরিব্রাজকের মন তাতে প্রতিফলিত।

রমেশ দত্তের প্রথম সার্থক সৃষ্টি 'বাংলার কৃষক সম্প্রদায়' 'Peasantry of Bengal' (১৮৭৫)। কৃষক সম্প্রদায়ের নানা সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ এতে আছে বলেই যে এই রচনার বৈশিষ্ট্য তাই নয় কৃষকদের কল্যাণ সাধনের জন্যে তিনি যে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন তার জন্যও এই গ্রন্থের সার্থকতা। এই অনুরাগের জন্যই তিনি এমন সুপারিশ করতে পেরেছিলেন যা প্রচলিত সরকারী নীতির বিরোধী। শুধু তাই নয়, ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্প্রদায়, অর্থাৎ জমিদারদের স্বার্থবিরোধী বলেও এই প্রস্তাবটিকে গণ্য করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবের ফলে যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে তা তিনি পুরোপুরি জানতেন। তাই ভাই-এর কাছে একটি চিঠি লিখে তিনি বলেছিলেন :

"ইংরেজ আইনপ্রণেতাদের নীতির বিরুদ্ধে অভিমত দেওয়া খুবই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ বলে বিবেচিত, আমার মনে হয়, তার উপর আবার জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের স্বার্থ তুলে ধরা তো সেই দৃষ্টিতে আরও বেশী অন্যায়। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারি না ; মুখ বুজে আমি

থাকবো না। চাকরীর উন্নতির আমি খুব একটা পরোয়া করিনা। 'বাংলার কৃষিসম্প্রদায়' ('Bengal Peasantry') গ্রন্থটির প্রকাশনা যদি আমার উন্নতির সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করে আমি মোটেই দুঃখিত হব না।"

কর্তৃপক্ষের কাছে বইটি সমাদার পাবেনা এ আশঙ্কা করার অনেক কারণ ছিল। পাবনা ও নদীয়া জেলায় কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ যখন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো ঠিক সেই সময়টায় বইটি প্রকাশ করা হয়। এই অসন্তোষের কারণ ব্যাখ্যা করে রমেশ দত্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "সরকারের কাছে এখন দু'টি পথ খোলা। এই জাগরণ দমন করা এবং রায়তদের ভাগ্য জমিদারদের কৃপার ওপরে আবার ছেড়ে দেওয়া। ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত কয়েকবারই এই নীতি অবলম্বন করা হয়েছে অথবা একটা উৎসাহব্যঞ্জক ও বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই জাগরণকে বিচার করে সন্তোষজনকভাবে রায়ত ও জমিদারদের যার যা মর্যাদা তা সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করে দেওয়া, যা এ পর্যন্ত করা হয়নি।

উৎসাহব্যঞ্জক ও বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ অর্থে তিনি এই বলতে চেয়েছিলেন যে, "সরকার ও জমিদারদের মধ্যে যেমন একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন আছে তেমনি রায়ত ও জমিদারদের মধ্যেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য আইন প্রণয়ন করা হোক।" তিনি বলেছেন, "আমাদের শাসকদের সেই আদিম যুগের মত রায়তদের জমিদারের কবলে রেখে দাসত্বের ঘৃণ্য অবস্থায় ফেলে দেওয়া উচিত নয়। সে কাজও তাঁরা করতে পারেন না। তাই আর একটি মাত্র পথ আছে এবং তা হলো দু'টি শ্রেণীর মধ্যে এই যে বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাব তা দূর করার চেষ্টা। ব্যাপকভাবে যে মামলা-মকদ্দমা চলে তা বন্ধ করতে হবে। এই মামলা-মকদ্দমাই কৃষক সম্প্রদায়ের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষিত করে দিচ্ছে। এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূর করার একমাত্র পথ রায়তদের মর্যাদা বাড়ানো। ব্যাপকভাবে জরীপ করে সযত্নে দেয় খাজনার পরিমাণ ধার্য করতে হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে এই খাজনার পরিমাণ বেঁধে দিতে হবে।

এই বিশেষ সুপারিশের জন্যেই যে বইটির এত বৈশিষ্ট্য তা নয়, যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে সেটাই উল্লেখযোগ্য। রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা বাস্তবোচিত, অথবা বাঞ্ছনীয় প্রস্তাব কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ। সবচেয়ে যেটা বড় কথা তা হলো, সরকারের বড় চাকরীতে অধিষ্ঠিত থেকে এই প্রথম একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের স্বার্থ তুলে ধরতে পারলেন। সমকালীন অভিমত এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে উপেক্ষা করেনি। 'দি হিন্দু প্যাট্রিয়ট', রমেশ দত্তের অভিমতকে সমালোচনা করে "বিপ্লবী" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর শুরুতে আছে সমর্থনের সুর :

"বাবু রমেশ চন্দ্র দত্তের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। কিন্তু হিন্দু কলেজের প্রথম দলের ছাত্রদের চিন্তায় ও উক্তিতে যে আমূল সংস্কারের মনোভাব দেখা গিয়েছিল, ঠিক সেই মনোভাব রমেশ চন্দ্র দত্তের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি এবং দুঃখিত না হয়ে পারিনি······আমাদের তরুণদের মধ্যে যাঁরা কয়েক বছর ইংলণ্ডে কাটিয়েছেন নতুন কিছু সর্বনাশা চিন্তাধারা ও অভিমত নিয়ে তাঁরা দেশে ফিরেছেন।······"

সমকালীন অর্থনীতির বিষয় থেকে এবার তিনি সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন। 'বাংলার সাহিত্য' ('Literature of Bengal') নামে ছোট একটি বই ছাপালেন। গ্রন্থকারের এও এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কারণ সেই সময়ে পশ্চিমী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল বাংলা সাহিত্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু লেখা অসম্ভব। সেই ধারণা দূর করতেই তাঁর এই প্রচেষ্টা। দ্বাদশ শতাব্দীর গীতিকাব্যের সময়কার বাংলা সাহিত্য নিয়ে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তার ক্রমবিকাশ, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে শ্রেষ্ঠ রচনাকাল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী সাহিত্যের প্রভাবে এদেশে সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার—এসবই তিনি এই গ্রন্থে

লিপিবদ্ধ করেন। সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে বাঙ্গালীদের গর্বিত হবার মত এই গ্রন্থ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের ওপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই নবজাগরণের মূল্যায়ণ তিনি যা করেছেন, সে সময়ে যেমন, এখনও তেমনি, তা গভীর আগ্রহের সঞ্চার করে। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক বিপ্লবের একটা নিজস্ব গতি আছে। বর্তমানের বিপ্লব সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এর আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক শতাব্দীর মধ্যে আর কখনও এত বেশী নাম, কৃতিত্বের এত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। যেমন রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু মিত্র। বর্তমান শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে গদ্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক—এসব বাংলা সাহিত্যে প্রথম লেখা হলো। এছাড়া লেখা হলো নানা লেখকের সৃষ্টিশীল অনেক সমৃদ্ধ লেখা—যা আগের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।" এই বইটি সংবাদপত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এমনকি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাও এ বিষয়ে মত প্রকাশ করে। দি 'ইংলিশম্যান' লেখে, "বাংলা সাহিত্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু লেখার মত আছে—এটা জেনে অনেকেই হয়তো আশ্চর্য হবেন।……কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যের সূচনা এবং সেই সাহিত্য শুধু ছাত্রদের কাছেই নয় সাধারণ পাঠকের কাছেও আকর্ষণীয়। মিঃ দত্তের গ্রন্থের অন্য পরিচ্ছেদগুলি আমাদের না পড়লেও চলে। বাংলা দেশের অন্তরতর জীবন, তার চিন্তাধারা, অনুভূতি এবং বাস্তব জীবন সম্বন্ধে আমাদের যেসব পাঠক জানতে বুঝতে চান, তাঁদের কাছেই এই বইটির কথা উল্লেখ করছি। এই বইটিতে ইংরেজী আদব-কায়দার অন্ধ অনুকরণ বা ইংরেজ জাতের যে দোষগুলি বড় বড় শহরের মুখের ওপর গাঁজলার মত ভাসতে দেখা যায় তার উল্লেখমাত্র নেই।"

বাংলা সাহিত্যের শুধু ইতিহাস রচনা করে রমেশ দত্ত সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। 'বাংলার সাহিত্য' নামে তাঁর বইতে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের যে কয়জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি তাঁদেরই একজন হতে চেয়েছিলেন এবং সমসাময়িক কালের সাহিত্যে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান জুগিয়েছেন। এ বিষয়ে ভাইকে চিঠি লিখে তিনি জানিয়েছিলেন, "আমাদের মাতৃভাষা আমার আপন জিনিস। আমার মৃত্যুর আগে আমি এমন কিছু রেখে যেতে চাই যা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধতর করবে এবং আমার মৃত্যুর পরে দেশবাসী তা স্মরণ করে খুশীতে ভরে উঠবে।"

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দেবার তাঁর একটা উচ্চাকাঙ্খা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাবার খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর প্রতি রমেশ দত্তের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। রমেশ দত্তের জীবনীকার জে. এন. গুপ্ত বলেছেন, বঙ্কিম চন্দ্র রমেশ চন্দ্রের আশাআকাঙ্খা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবার সময়, সেই সময়কার বিখ্যাত সাময়িকী 'বঙ্গদর্শনে' বাংলায় লিখবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।* "বাংলায় লিখবো?" রমেশ দত্ত অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "লিখবো কি করে, বাংলা সাহিত্যের স্টাইলই তো আমার জানা নেই" বঙ্কিম চন্দ্রের মুখে নির্ভীক উক্তি শোনা গেল—"স্টাইল? তোমার মত সংস্কৃতিবান মানুষ যা লিখবে, সেটাই হবে স্টাইল। তোমার মধ্যে যদি প্রতিভা থাকে, লেখার স্টাইল আপনা থেকেই আসবে।"

রমেশ চন্দ্রের মনে কথাটা ধরলো। লিখলেন চারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের একশো বছরের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর চারটি উপন্যাসের উপজীব্য হলো।

*Life and Works of Romesh Chunder Dutt by J. N. Gupta, পৃষ্ঠা ৬৮

প্রথম দু'টি উপন্যাসের নাম—'বঙ্গ বিজেতা' এবং 'মাধবী কঙ্কণ'। আকবরের বাংলা বিজয় এই উপন্যাস দু'টির বিষয়বস্তু। তৃতীয়টীর নাম 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'—রাণা প্রতাপের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের আলেখ্যভিত্তিক উপন্যাস। চতুর্থটি, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'—শিবাজীর আমলে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় এতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নথিভুক্ত ভারতীয় ইতিহাসের এতবড় সমরকুশলী বোধ হয় আর জন্মাননি। রমেশ দত্তের কাছে ইতিহাস ছিল আবেগমুখর নেশা এবং স্কট ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ইংরেজ লেখক। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নিজের মাতৃভাষায় তিনি ইতিহাসকে আবার নিজের চোখে দেখলেন, নিজের মত করে ভাবলেন আর স্কটের স্টাইলে লিখলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের প্রতি স্বাভাবিক আবেগ ও আকর্ষণের জন্যেই যে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন তাই নয়, গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কাহিনীগুলি, বর্তমান যুগকে স্মরণ করানোই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর নানা রচনার মূল অনুপ্রেরণা ছিল এটাই। এই একই অনুপ্রেরণায় তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের একটি উপন্যাসে তিনি একথাই লিখেছেন, "সুধী পাঠক, অতীতের গৌরবময় কাহিনীকে বর্ণনা করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতীয় জীবনের কৃতী পুরুষদের মহত্বকে আমি তুলে ধরতে চেয়েছি। আমাদের জাতীয় বীরদের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ভাব সামান্য একটু যদি প্রজ্জ্বলিত করতে পেরে থাকি, আমার কলম ধরা বৃথা যাবে না বলেই আমি মনে করবো।"

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যাঁরা সাহিত্যিকের সম্মান পেয়েছেন, রমেশ দত্ত তাঁদের মধ্যে একটী স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি হয়তো বঙ্কিম চন্দ্রের সমপর্যায়ে উঠতে পারেননি কিন্তু সমসাময়িক কালের একজন যা লিখেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য, "ঘটনা প্রবাহের মধ্যে তিনি যে সামঞ্জস্য ও সমতার নিদর্শন তুলে ধরেছেন, তাঁর গভীর কল্পনাশক্তি, মহৎ জীবনজিজ্ঞাসা ও উদার মানসিকতার যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাতে আমাদের

কালে মিঃ আর. সি. দত্তের সমকক্ষ আর কেউ নেই বললেই চলে।" রমেশ দত্তের পূর্ববর্তী অনেক লেখকদের মতই তিনি প্রাচীনকালের ধ্রুপদী ঐতিহ্য ও ধারা থেকে বাংলা ভাষার রূপান্তর ঘটিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে আধুনিক রচনাশৈলীতে সমৃদ্ধ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার মর্যাদা সমগ্র বিশ্বের দরবারে যিনি তুলে ধরেন পরবর্তী যুগের সেই প্রতিভাধর পুরুষ রবীন্দ্র নাথের পথ এঁরাই সুগম করে গেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জেলা অফিসার

বাঁকুড়া ও বালেশ্বর—এই দুই জেলার দায়িত্বভার দুই মাস করে গ্রহণ করার পর রমেশ দত্তকে এবার দীর্ঘকালের জন্য বাংলার অন্যতম বৃহত্তম জেলা বাখরগঞ্জ শাসনের ভার দেওয়া হয়। সেটা ছিল ১৮৮৩ সাল। আমরা আগেই দেখেছি এই নিয়োগ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নিজের পদমর্যাদার জন্য অতটা নয়, যতটা এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা ভারতীয়দের আছে—সেটা প্রমাণ করার জন্য। রমেশ দত্ত এই নিয়োগকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। দু'বছর তিনি এই জেলা শাসন করেন এবং সরকারের কাছ থেকে সুখ্যাতি অর্জন করেন। সেই বছর প্রাদেশিক প্রশাসনিক ও পুলিস রিপোর্টে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়। সরকারের প্রশস্তি সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি তাঁর ভাইকে লেখেন :

"প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে আমার সফলতা সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছে দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি, কারণ এই প্রথম একজন ভারতীয় এক বছরের জন্য একটি ভারতীয় জেলার প্রশাসনের ভার নিল। এই পরীক্ষায় বিফল হলে আমাদের দেশবাসীর ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক হত।"

একজন ভারতীয় বিরাট একটি জেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সফল হয়েছে—তখনকার ব্রিটিশ প্রশাসকদের কাছে এটা অভিনব ঘটনা কারণ এই ধরনের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা ভারতীয়দের নেই বলেই তাঁরা বিশ্বাস করতেন। তদানীন্তন ভাইস্রয় মারকুইস অফ্ রিপন, রমেশ চন্দ্রের কাজের প্রশংসা করে তাঁকে ডেকে পাঠান। রমেশ দত্ত দেখা করতে এলে রিপন বললেন, "আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি কারণ ভারত ছেড়ে চলে যাবার আগে আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করলো—আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনা ছিল। আপনার

কর্মনীতি ইংলণ্ডের জানা উচিত। তাহলে প্রশাসনিক পদ ভারতীয়দের অলঙ্কৃত করার ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্পর্কে আর কখনও প্রশ্ন উঠবে না।"

বাখরগঞ্জের প্রশাসনে রমেশ দত্ত প্রকৃতই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। দু'বছর পরে প্রশাসনিক দায়িত্বভার অন্যের হাতে তুলে দেবার সময় এলে, সমকালীন পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর ভাষায়, "আন্তরিক ভালবাসার এমন প্রকাশ বাখরগঞ্জে আর কখনও দেখা যায়নি……য়ুরোপীয় বাসিন্দা ও মিঃ দত্তের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার নিদর্শন পাওয়া গেল।" 'ইণ্ডিয়ান মিরর' আরও বলেন, "সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিরা তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে আসেন। তাঁদের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে—এই ঘটনা তারই স্বাক্ষর বহন করছে।" ভারতীয় জনগণের কাছেও তিনি কম জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁদের আন্তরিকতার পরিচয়ও পাওয়া গিয়েছিল।

কোন দল, ব্যক্তি বা শাসক গোষ্ঠীর প্রতি দাসত্বের মনোভাব দেখিয়ে তিনি এই জনপ্রিয়তা অর্জন করেননি, করেছিলেন সত্যের, ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে। এতে প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু রমেশ দত্তের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পরিশেষে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। বাখরগঞ্জ থেকে ১৮৮৪ সালের জুন মাসে তিনি ভাইকে চিঠি লেখেন, "ডেইলী নিউজে (কলকাতার কাগজ) দু'একটা চিঠি ছাপা হয়েছে। যাদের আমি বাধা দিয়েছিলাম, তাদেরই প্ররোচনায় এই চিঠি লেখা হয়েছে। এতে আমার কঠোর ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'কথা বলা হয়েছে। সংবাদপত্রের চিঠিপত্রই হোক বা হলফ-নামাই হোক—জানোতো আমি কিরকম নির্বিকার থাকতে জানি। আমার নিদ্রা এতে ভাঙ্গে না। প্রশাসনিক ব্যাপারে সামান্য একটু খুঁতও এরা কেউ বার করতে পারেনি।"

রমেশ দত্তের ওপরে যখন বাখরগঞ্জের প্রশাসন ভার, তখন তিনি ১৮৮৪ সালের প্রজাস্বত্ব বিলের রচনায় কৃষকদের স্বার্থ তুলে ধরেন। ভোগ দখলের

নিরাপত্তা এবং খাজনা বাড়ানোর ব্যাপারে জমিদারদের ক্ষমতা সীমিত করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। প্রজারা যদি জমি বিক্রি করতে চায় তাহলে পূর্বক্রয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের কাছ থেকে জমিদারদের জমি নিয়ে নেবারও তিনি বিপক্ষে ছিলেন। তিনি অনেকগুলি মূল্যবান সুপারিশ পেশ করেন। সেগুলি সরকারের খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জমিদারদের প্রতিবাদের ফলে সরকার প্রয়োজনীয় সংস্কার করার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি। ১৮৮৫ সালে বাংলা ভূমিস্বত্ব আইন কার্যকর করা হল। আইন প্রণয়নের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আসল বিলটির বেশ কিছুটা রূপান্তর ঘটেছিল। রমেশ দত্তের এই অভিমত বাংলাদেশের সেক্রেটারীর খুবই পছন্দ হয়। বিলটি নিয়ে যখন চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা চলেছে, যখন তা আইনে পরিণত হওয়া বাকি তখন তিনি রমেশ দত্তকে একটি চিঠি লেখেন, "আপনি যেসব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, অন্ততঃপক্ষে তার একটি গ্রহণ করা হোক, এটা আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু যা দেখছি তাতে কোন আশা নেই। আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়ছি। আপনারা যাঁরা আমার সঙ্গে একমত, তাঁদেরও ঠিক একই অবস্থা। কারণ এইতো কিছুদিন আগেও ভেবেছিলাম পরিস্থিতি অনুকুল।"

"কেন এরকম হলো তার নানা কারণ। এই চিঠির স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে কয়েকটা আমি নিজেই স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না। অন্য কারণগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করার ধৈর্য নেই। আমার একমাত্র আশা, বরং বলতে পারি আমার পরম সান্ত্বনা যে, একদিন না একদিন সত্য ও ন্যায়েরই জয় হবে। আমার নিজের দেশ, আয়ারল্যাণ্ডের জমিদারদের মত বাংলাদেশের জমিদাররা অদূরদর্শিতার জন্য নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছেন। আমি শুধু এটুকুই আস্থা রাখতে পারি আইরিশ জমিদাররা যতটা অসুবিধায় পড়েছিলেন, বাংলাদেশের জমিদারদের ততটা নাও হতে পারে।"

"আমরা আমাদের যথাসাধ্য করেছি। সাময়িকভাবে এই সংগ্রাম

শেষ হয়েছে। এখন আর কিছু করা যাবে না। যে অপমান ও নিন্দা আমাদের সইতে হয়েছে, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের কাজের যে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন সেসব কথা যথাসম্ভব ভুলে গিয়ে আমাদের এখন এই অবস্থাকে মেনে নিতে হবে। আমাদের সামনে ভবিষ্যৎ পড়ে আছে, আমাদের কালে জমিদারদের এই অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতার ফলে যদি ভবিষ্যতে সংগ্রাম আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, তাহলে আবার আমি ও আপনি হাতে হাত মিলিয়ে লড়বো এই আমার বিশ্বাস।"

১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে বাখরগঞ্জের কার্যভারের শেষে দীর্ঘ দু'বছরের জন্য রমেশ দত্ত ছুটি নেন। ছুটির প্রথম দিকটা কাটান ভারতবর্ষে, এবং পরবর্তীকাল ইউরোপে। এই সময় তিনি ঋগ্‌বেদ বাংলায় অনুবাদ করেন। যে কোন দিক দিয়েই বিচার করে বলা যায় এটা একটা ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। কাজ শেষ হবার আগেই তাঁকে নানারকম প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর জীবনীকারদের অন্যতম মিঃ নাটেশন এই প্রতিকূল অবস্থার একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

"এই পবিত্র শ্লোকগুলি আপামর জনসাধারণ পড়বার অধিকার পাবে একথা ভেবে গোঁড়াপন্থীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তার উপর শ্রী দত্তের মত একজন অব্রাহ্মণ এই পবিত্রতম গ্রন্থ রচনায় তাঁর অপবিত্র হাত দিয়েছেন এই চিন্তাতেই তাঁরা যেন বারুদের মতো ফেটে পড়লেন। শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে তুমুল সংগ্রাম শুরু করেন ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, তখন বাংলাদেশে তর্কবিতর্কের যে ঝড় উঠেছিল, অনেকটা সেরকম তীব্র মতবিরোধ আবার দেখা দিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বাংলা সংবাদপত্র-গুলিতে জোরালো ভাষায় প্রবন্ধ বের হতে লাগলো। এই নির্ভীক অনুবাদকের ভাগ্যে জুটলো ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর লাঞ্ছনা। অনুবাদটি ছাপা হবার আগেই তার সমালোচনা করা হল। নানারকম বিরূপ মন্তব্যে সমালোচকরা মেতে উঠলেন।

শ্রী দত্ত সারাজীবন ধরে যেমন ভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন, এবারও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিরোধিতার মোকাবিলা করলেন। এসব ব্যাপারে মুখ খোলার প্রয়োজনীয়তা তিনি খুব কমই অনুভব করতেন। দারুণ গ্রীষ্মের দিনগুলিতে তিনি অক্লান্ত ও নীরব সাধনায় মগ্ন হলেন। ১৮৮৫ সাল শেষ হবার আগেই তাঁর বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। গোঁড়াপন্থীরা হলেন বিস্মিত ও হতবাক।"

কিন্তু বাংলাদেশে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের অভাব ছিল না। তাঁরা রমেশ দত্তের এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকে সাদর অভ্যর্থনাও জানালেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রমেশ দত্তকে একটি চিঠি লেখেন :

"এই মূল্যবান বইটি লিখে আপনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশ আপনার কাছে কত না ঋণী হয়ে রইল। অতীতের গহ্বরে রত্নসম্ভার ছিল, আপনি তাকে বাংলাদেশের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। এটা খুবই সত্য কথা, প্রাচীন যুগের মহান ঐতিহ্য আমাদের নিজস্ব সম্পদ। এতে আমাদের জন্মগত অধিকার। তবুও আজকে আপনার জন্যে আমরা এ সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছি।"

বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'প্রচার' নামে বাংলা সাময়িক পত্রিকায় অনুবাদ সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

"যে যা খুশী বলুক, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে রমেশ বাবুর এই প্রচেষ্টা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। ইউরোপের আধুনিক ভাষায় যখন বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছিল তখন রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই রচনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। সুতরাং রমেশবাবু যে ঠিক একই অবস্থার মধ্যে পড়বেন সেটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু সেদিন বাইবেলের অনুবাদের ফলে ইউরোপে ধর্মসংস্কারের যেমন নতুন পথ খুলে

গিয়েছিল, সভ্যতার অগ্রগতির পথ যেমন উন্মুক্ত হয়েছিল, তেমনি এদেশে ঋগ্‌বেদের অনুবাদ একই শুভ অধ্যায়ের সূচনা করবে। শ্রী দত্ত বাঙ্গালীকে যে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন তা অপরিশোধ্য*।"

সে যুগের প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ও অধ্যাপক কাউয়েল, রমেশ দত্তকে প্রশংসা করে ও অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাময়িক পত্রিকা 'দি ইংলিশম্যান' এই কাজের তারিফ করেন। ভারতীয় 'দি বেঙ্গলী' ঋগ্‌বেদের এই অনুবাদ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ঋগ্‌বেদের যে শ্লোকগুলিতে অভিন্ন হৃদয় মন ও আত্মার বাণী উপলব্ধি করতে পুরোহিত ও ভক্তদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে সেই শ্লোকগুলির উল্লেখ করে 'দি বেঙ্গলী' মন্তব্য করেছিল :

"আধুনিক ভারত পশ্চিমের কাছ থেকে যা শিখেছে তা রূপায়ণের কাজে সে যত এগিয়ে যাচ্ছে তত সে প্রাচীন ঐতিহ্য ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে। এইসব শ্লোকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুবাদক জনকল্যাণ সাধন করেছেন। আমাদের দেশের মানুষের কাছে এই শ্লোকগুলির মর্মার্থ যাতে চিরভাস্বর হয়ে ওঠে তার জন্য তাঁর আবেদনের সঙ্গে আমরাও নিজেদের যুক্ত করতে চাই। আগে জানতাম না কিন্তু এখন আমরা জেনেছি আমাদের মধ্যে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ অনুশীলন করে আমরা প্রাচীন ভারতের আত্মাকেই খুঁজে পাবো, আমরা পূর্বপুরুষের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করবো। আমাদের সীমিত ক্ষমতায়, সীমিত উপায়ে আমরা পূর্বপুরুষের মহান ঐতিহ্যকেই বরণ করে নিতে যাচ্ছি।"

১৮৮৫ সালে একই সময়ে বাংলায় তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'সংসার' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিম চন্দ্রের অনুসৃত পথে এতদিন রমেশ চন্দ্র বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছিলেন। 'সংসার' সেই মূল সুরের ব্যতিক্রম।

* জে. এন. গুপ্তের জীবনী থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১১৯, অধ্যায় ৯।

'সংসার' উপন্যাসের ধাঁচে পরবর্তী উপন্যাস 'সমাজ' প্রকাশিত হয় আট বছর পরে। এই দুটি উপন্যাসে রমেশ দত্ত সেদিনকার সমাজের নানা বৈচিত্র্য, বিরোধ এবং বিভিন্ন ধারাকে ফুটিয়ে তোলেন। ধনী ও অসৎচরিত্র লম্পট জমিদার, পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত যুবক, শ্রেষ্ঠ হিন্দু আদর্শে উদ্বুদ্ধ সাধু থেকে সুরু করে দরিদ্র চাষাভূষো এবং সর্বগ্রাসী মহাজন—এইসব বিচিত্র চরিত্র উপন্যাস দুটিতে স্থান পেয়েছে।

'সংসার' ইংরেজীতে অনুদিত হয় এবং তার নাম দেওয়া হয় 'দি লেক অব পামস্'। বইটি সমাদৃত হয় বিদেশী পত্র-পত্রিকায়। এতদিন বিদেশী পাঠকেরা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান উপন্যাসে ভারতবর্ষের ইউরোপীয় সমাজচিত্র পেয়েছেন। তাই ভারতীয় সমাজচিত্রের উপর লেখা এই উপন্যাসটি ইংরেজীতে অনুদিত হবার পর তাঁরা একটা নতুন স্বাদ পেলেন। প্রকৃত ভারতের চিত্ররূপ এতদিন তাঁদের কাছে অজানা ছিল। এই উপন্যাসে সেই চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে ওঠায় তাঁরা এটাকে স্বাগত জানালেন।

দীর্ঘ দু'বছর ছুটির বাকী সময়টা তিনি ঘুরেফিরে কাটিয়ে দিলেন। উত্তর প্রদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি তিনি আগেই দেখেছিলেন। তাই ১৮৮৫ সালে হেমন্তের মনোরম দিনগুলি কাটাতে তিনি গেলেন রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে। তিনি অম্বরে গেলেন, জয়পুরে দেখলেন 'দশেরা' উৎসব, চিতোর দেখে তাঁর মনে পড়লো ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা—যাকে তিনি সূর্যবংশীয় রাণাদের কাহিনী বলে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি উজ্জয়িনী পরিদর্শনে যান। তিনি লিখেছেন, "চিতোর যদি আধুনিক ভারতের ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায় হয় তবে উজ্জয়িনী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম কীর্তি।......আজকের এই বস্তুবাদের যুগেও কোন হিন্দু যদি প্রাচীন শহরের বাজারের পাথর-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে যায়, নিশ্চয় তার মনে পড়বে বিক্রমের রাজসভার গৌরবগাথা আর কালিদাসের বিখ্যাত রচনাশৈলী।"

১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে রমেশ দত্ত ইউরোপ সফরে বেরিয়ে পড়েন। ১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত তাঁর ছাত্রজীবনের স্মরণীয় তিনটি বছর কাটে ইউরোপে। ছাত্রজীবনে এই তাঁর প্রথম ইউরোপ যাত্রা। এখন তাঁর জীবনধারা পালটেছে, সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়।

"আঠারো বছর আগে আমি একই পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম। স্বল্প পরিসর মানুষের জীবনের পক্ষে আঠারো বছর সুদীর্ঘ সময়। এই বছরগুলিতে আমার জীবনে কত ঘটনাই না ঘটলো। উচ্চাকাঙ্খার তাড়নায় একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। অনেকটা ঝুঁকি নেওয়াই বলবো। সে থেকে আমার জীবনে কত পরিবর্তনই এলো। একদিন এমন একটা কাজের বোঝা মাথায় নিয়েছিলাম যাতে সফলতা অর্জন করা অসম্ভব মনে হয়েছিল অথচ তারই জন্য ঝুঁকি নিয়েছিলাম—আমার সব, আমার ভবিষ্যৎ এ অবস্থায় সব তরুণই যা করতো, আমিও তাই করলাম। নিজের ভবিষ্যৎ তখন অনিশ্চিত অন্ধকার, সম্ভাবনা ও সুযোগ আসবে কিনা জানা নেই ; এক অনির্দিষ্ট পথের সন্ধানী। কিন্তু উদারতার মত সফলতা সব ক্লেদ ধুয়ে মুছে ফেলে। আমার প্রচেষ্টায় আমি সফল হলাম।

"আবার কলকাতা ছেড়েছি ১৮৮৬ সালে। এখন বর্তমান অনেক বেশী নিরাপদ, ভবিষ্যৎ অনেক বেশী সুনিশ্চিত। তবে জীবনের যন্ত্রণা বেড়েছে, দায়িত্ব বেড়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বা যন্ত্রণা, কোনটাই কমেনি।"

পুরনো বন্ধুত্ব নতুন করে গড়ে তোলার কাজে তিনি কয়েক মাস ইংলণ্ডে কাটালেন। প্রবীণের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সে দেশের অবস্থা লক্ষ্য করলেন। দেশপ্রেমের আন্তরিকতায় ছাত্রজীবনেও ভাবতেন কবে তাঁর নিজের দেশের অবস্থা এ দেশের মত হবে। লণ্ডনে কমন্স সভা দেখে তিনি যে মন্তব্য করেন—এদিক থেকে তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে :

"আমাদের মধ্যে যাঁরা তরুণ এমনকি যাঁরা মধ্যবয়স্ক, তাঁরা হয়তো সেই

শুভদিন স্বচক্ষে দেখবেন যখন ভারতবাসী তাঁদের প্রশাসনের ব্যাপারে সাংবিধানিক উপায়ে নিজস্ব অভিমত দিতে পারবে, যখন তাঁদের অভিমত অনুসারে প্রশাসনিক নানা বিভাগের অনেকাংশে পরিবর্তন আনা হবে এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরই উপর প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্বভার বর্তাবে।"

তিনি আরো লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন রাজাদের দেবদত্ত ক্ষমতার কথা সেকেলে বলে মনে হয়, বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অভিধানেও বিজেতাদের রাজ্যশাসনের দৈব অধিকারের কথা অবিশ্বাস্য বলে গণ্য হবে। অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার ইংরেজ সন্তানদের মত ভারতীয়রা একদিন ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে গর্বিত হবে।" অবশ্য পরবর্তীকালে যাকে বলা হয় ইংলণ্ডের অধীনে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার তাঁর চিন্তাধারা সেই খাতেই বয়ে গিয়েছিল। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা ধরলে একেও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দূরদর্শী চিন্তাধারা বলে অ্যাখ্যা দিতে পারা যায়, ভবিষ্যৎ-বাণী বলাও অন্যায় নয়। তবে বিজেতাদের দেবদত্ত অধিকার সম্পর্কে তাঁর অভিমতই বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেই উপনিবেশবাদের যুগে এই ধারণাকে অকাট্য সত্য বলে গণ্য করা হতো। ভারতের পূর্বতন যে সব রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই দেবদত্ত অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার স্পর্দ্ধা রাখতেন, রমেশ দত্ত তাঁদের অন্যতম। বিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয় আন্দোলনের সাড়া পড়েছিল তার তত্ত্বগত বনিয়াদ এঁরাই গড়ে তোলেন।

ভারতে ফিরে আসার আগে ১৮৮৬ সালের বাকী কটা মাস রমেশ দত্ত ইউরোপের নানা দেশ সফর করেন। তিনি নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মাণী এবং ইতালীতে যান। তবে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে যেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বেশী সেইসব স্থানই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বেশী। ঐতিহাসিক পটভূমিতে এইসব দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করে তিনি তাঁর সুনিশ্চিত মতামত দিয়েছেন। ছাত্রজীবনে পশ্চিমী

দেশগুলি সফর করার সময় যে ধারণা গড়ে উঠেছিল এবারে তা স্পষ্টতর হলো, এবারে নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ইউরোপের অবস্থার আরও সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারলেন। বৃহত্তর পৃথিবীর ব্যাপকতর পটভূমিকায় ভারতের সমস্যার পর্যা-লোচনা করার এবার সুযোগ এলো।

১৮৮৭ সালের প্রথমদিকে রমেশ চন্দ্র দত্ত ভারতে ফিরে এসে সরকারী দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি পাবনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হলেন। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে পাবনায় কিছুদিন ছিলেন। এই জেলায় কয়েকমাস থাকার পর ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর ডাক পড়লো। আয়তন এবং জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ তো বটেই সম্ভবত সমগ্র ভারতের মধ্যে ময়মনসিংহ বৃহত্তম জেলা। ইউরোপীয় জেলাশাসক যে ভাবে এই জেলার শাসনভার পরিচালনা করছিলেন তা সরকারের মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না তাই লেফট্‌ন্যাট গভর্ণর রমেশ দত্তকে এই সুযোগ দিতে চাইলেন। শুধু নিজের কথা ভেবেই নয়, সমগ্র ভারতবাসীর হয়ে তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। নিপুণভাবে প্রমাণ করলেন শিক্ষিত ভারতীয়রা অন্যদের মত গুরুদায়িত্ব বহন করতে সক্ষম।

এই গুরুত্বপূর্ণ জেলাশাসন কালেই তিনি তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যেও সময় করে তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ, 'প্রাচীন ভারতে সভ্যতার ইতিহাস' ('History of Civilisation in Ancient India') রচনা করেন। এই প্রচেষ্টার পিছনে নতুন বা নিজস্ব কিছু সৃষ্টির আকাঙ্খা তাঁর অতটা ছিলনা যত ছিল আমাদের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে এমন একটি সহজলভ্য ও সুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করা যার ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতবাসী আমাদের গৌরবোজ্বল প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। তিনি নিজেই সবিনয়ে বলেছেন :

"কাজ হাতে নেবার সময় আমি নতুন কিছু সৃষ্টি করবো একথা মোটেই

ভাবিনি। প্রাচ্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পরিধি বাড়াবো, সে ইচ্ছাও আমার নেই। এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান এতই পরিমিত যে কোনরকম ভান করা আমার সাজেনা। তাছাড়া এই কাজের সীমিত পরিধির কথা ভেবেও মনে হয়েছে নতুন কিছু করা সম্ভব নয়। শুধু বিচক্ষণ পণ্ডিতদের সাধনার ফলগুলিকে আমি সুশৃঙ্খলভাবে এক সুতোয় গাঁথতে চেষ্টা করেছি। সাধারণের পাঠযোগ্য একটি বই লেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।"

এই বই লেখার পিছনে তাঁর যে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল তা তাঁর নিজের কথাতেই প্রকাশ করা যেতে পারে :

"কোন জাতির মানসিকতা ও চরিত্র গঠন করতে সেই জাতির অতীত ইতিহাসের বিশ্লেষাত্মক ও সুচিন্তিত অনুশীলন যতটা প্রভাবিত করে তেমনটি আর কোন কিছুতে করেনা। শুধু এই ধরনের অনুশীলনই অতীতের অযৌক্তিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোহ দূর করে যুক্তিসংগত চিন্তাধারা ও শ্রদ্ধার ভাব জাগাতে পারে।

এই বইটিকে বিদেশী প্রাচ্যবিদ্‌রা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রথিতযশা অধ্যাপক ম্যাক্‌সমুলার। এই বইটির প্রশংসা করে তিনি বলেন, "দুই খণ্ডের এই বইটি পড়ে খুবই আনন্দ পেয়েছি। ভারতীয় মানসিকতার এক পরিপূর্ণ ও আনন্দময় চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো।" সে সময় বিভিন্ন বিদেশী পত্রপত্রিকায় লিডেনের ডক্টর কার্ণ, ডক্টর উইন্টারনিৎস, মঁসিও বার্থ, ডক্টর ওল্ডেনবার্গ এবং ডক্টর পি স্যাচেলের মত প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদদের সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এর আগে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সারগর্ভ বই লিখেছেন। কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে সুপরিচিত অথচ ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাটিতে যাঁর গভীর শিকড়, এমন একজন ভারতীয়, এ ধরনের গবেষণামূলক গ্রন্থ ভারত ও ইউরোপীয় সাধারণ পাঠকদের হাতে এই প্রথম তুলে দিলেন।

অধ্যাপক জুলি এই মতামতই দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "ইউরোপীয় ছাত্ররা ভারতের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যখন গবেষণা চালান তখন সেটা ক্ষুদ্র অংশ বা বিবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার ভাষাবিদ্যাগত খুঁটিনাটি নিয়ে যখন গভীর ভাবে নিমগ্ন হন এ ধরনের গবেষণার যেটা আসল উদ্দেশ্য সেটাই অনেকটা হারিয়ে যায়। যে প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে আপনাদের দেশের গর্ব করা সাজে সেই উন্নততর ও পুরোপুরি মৌলিক সভ্যতার কি করে ধীরে ধীরে বিকাশ হলো, কেমন করে সে উন্নয়নের পথে এগিয়ে এলো তার বিশদ ব্যাখ্যাই গবেষণার আসল মর্মকথা। সুতরাং এই ভাষাবিদ্যানুযায়ী গবেষণার ফলাফল একসঙ্গে সাজিয়ে বই আকারে প্রকাশ করায় সাধারণ পাঠকের চাহিদাই যে শুধু মিটলো তাই নয় প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদেরও এই বই নতুন উৎসাহ জোগাবে। আপনার মত যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা ছাড়া এ অসাধ্য কাজ আর কেউ ভালভাবে করতে পারতেন না। কারণ আপনি যেমন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সমস্ত জটিল বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত তেমনি ভারত ও ইংল্যাণ্ডের সাধারণ পাঠকের চাহিদা ও ধারণা সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে।" ভারতবর্ষেও বইটি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশিষ্ট ভারতীয়দের কাছ থেকে লেখক অভিনন্দনবাণী পেয়েছেন।

তাঁর সরকারী দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে যা বলছিলাম সে কথায় আবার ফিরে আসা যাক। ময়মনসিংহ জেলায় আড়াই বছর থাকার পর ১৮৯০ সালের এপ্রিল মাসে রমেশ দত্তকে বদলি করা হয়। সেই সময় থেকে ১৮৯২ সালের শরৎ কাল পর্যন্ত রমেশ দত্ত পর পর বাংলার তিনটি জেলার প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলার এই তিনটি জেলা হলো, বর্ধমান, দিনাজপুর এবং মেদিনীপুর। তারপর তিনি দীর্ঘ এক বছর দু'মাস কাল ছুটি উপভোগ করেন। তিনি যখন মেদিনীপুরে তখন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। একটি ইউরোপীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর জমিজমার মালিক হয়ে বসেছিলো। তারা কৃষকদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করতো। রমেশ দত্ত কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায়

কতগুলি জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে ইউরোপীয় কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে রমেশ দত্তের সংঘর্ষ বাধলো। কিন্তু সরকারের কাছে তিনি তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই জেলার সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য সরকার তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন।

১৮৯২ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছুটির অবসরের কিছুটা তিনি কাটালেন বই লিখে, কিছুটা ভারত ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করে। এই সময়ে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা প্রাচীন ভারতের গীতিকাব্য। এই গ্রন্থে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সেরা কয়েকটি কবিতা তিনি ইংরেজীতে কবিতার ছন্দে অনুবাদ করেছেন। এতে আছে উপনিষদের কয়েকটি ছত্র, অশোকের অনুশাসন, একটি সংক্ষিপ্ত মহাকাব্য 'ভৈরবী'র অনুবাদ। একজন সমালোচক বলেছেন, "রমেশ দত্ত তাঁর এই বইতে প্রাচ্যের ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সর্বাঙ্গীন চিত্র পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। পঞ্চম থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত কাহিনীকে যুগ পরম্পরা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বইয়ের বাকি অংশে রয়েছে এমন কিছু নমুনা, তুলনামূলক বিচারে যাকে বলা যেতে পারে ভারতের আধুনিক কাব্য।"

বাকী সময়টা তিনি ঘুরে বেড়ালেন। কাশ্মীরে গেলেন, দেখলেন পাঞ্জাব, সেখান থেকে উত্তর প্রদেশ। ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে মুগ্ধ হলেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবময় অধ্যায়ের কথা তাঁর মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পাঞ্জাবের মাটিতে পা দিয়ে তিনি লিখলেন, "অবশেষে পাঞ্জাবে এলাম। পঞ্চ নদের এই দেশ, প্রাচীন ঋষিদের পূতস্থান, এখানেই ঋগ্‌বেদের জন্ম। সভ্যতার আলো যেসব দেশে প্রথম ছড়িয়ে পড়ে এই স্থান তাদের অন্যতম। এখানেই মানুষ প্রথম কাব্য, কলা ও বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ করে।"

১৮৯৩ সালের প্রথম দিকে তিনি আবার ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিছুদিন তিনি কাটালেন ইংলণ্ডে তারপর জার্মানীতে। ১৮৯৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি দেশে ফিরে এসে সরকারী দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্মজীবনের শেষ অধ্যায় ও অবসর গ্রহণ

১৮৯৩ সালে ছুটি থেকে ফিরে এসে শুরু হলো রমেশ দত্তের কর্মজীবনের শেষ পর্ব। প্রথমে তাঁকে বর্ধমানের জেলা অফিসার নিয়োগ করা হলো। ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে এই পদটি খালি হয়। রমেশ দত্তকে তখন বর্ধমান জেলার অস্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত করা হলো। এত উঁচু পদে একজন ভারতীয়ের নিয়োগ এই প্রথম। রমেশ দত্তের জীবনীকার জে. এন. গুপ্ত লিখেছেন, যে এই পদে তাঁকে নিয়োগ করতে ইণ্ডিয়া অফিসের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। এই নিয়োগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা 'দি ইংলিশম্যান'-এ, ইউরোপীয় অসামরিক অফিসারদের, "ভারতে একজন দেশী কমিশনারের অধীনে রাখার" জন্য ব্যঙ্গ করা হলো। এই ঘটনাকে পরীক্ষামূলক আখ্যা দিলেও এতে কোন অপ্রিয় ফলাফল হয়নি। ইউরোপীয় অসামরিক কর্মচারীরা বিনা প্রতিবাদে এই অনুশাসন মেনে নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন অবশ্য সার্ভিসে রমেশ দত্তের সিনিয়র ছিলেন।

১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র পরলোক গমন করেন। রমেশ দত্তের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং রমেশ দত্তের সাহিত্য সাধনায় বঙ্কিমের প্রভাব ছিল প্রগাঢ়। বিভিন্ন স্মারক সভায় ও সাহিত্য পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার নানা দিক তুলে ধরে তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন, "ত্রিশ বছর ধরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে বাংলাদেশকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছিলেন, এ দেশের জাতীয় ভাবধারার পথ নির্দেশ করেছেন, চিন্তার জগতে ও ধর্মীয় আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দিয়েছেন।" বঙ্কিমচন্দ্রই রমেশ দত্তকে মাতৃভাষায় সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত করেন।

রমেশ দত্তের পিতার জীবদ্দশায় বঙ্কিমের সঙ্গে যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং যে যোগাযোগ রমেশ দত্তের পরবর্তী জীবনের সাহিত্য প্রেরণার উৎস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগমনে তার পূর্ণচ্ছেদ পড়লো।

১৮৯৫ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর সিনিয়র অফিসার ছুটি থেকে ফিরে এলে রমেশ দত্তকে আবার হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে ফিরিয়ে নেওয়া হলো। একই বছরের অক্টোবর মাসে নতুন করে আবার একটা সুযোগ আসে। রমেশ দত্তকে পুনরায় ডিভিশনাল্ কমিশনার নিযুক্ত করে ওড়িষ্যা ডিভিশনের দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর কর্মজীবনের এটাই বিশেষ দায়িত্বভার। ১৮৯৭ সালের গোড়ার দিকে রমেশ দত্ত দীর্ঘদিনের ছুটি নিলেন। সেই বছরই অক্টোবর মাসে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ২৬ বছর কর্মজীবন সম্পূর্ণ করে অবসর গ্রহণ করেন।

দু'টি ডিভিশনের কমিশনার হিসাবে আগের মতই রমেশ দত্ত উচ্চমানের প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। এই প্রদেশের প্রশাসনিক রিপোর্ট সংক্রান্ত সরকারী প্রস্তাবগুলিতে তাঁর কর্মদক্ষতার বারবার প্রশংসা করা হয়। তখনকার সমস্যা সম্পর্কে তিনি যেসব অভিমত দিতেন, তা অনেক সময় উদ্ধৃত করা হতো এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো। যেসব সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন, তা বেশীর ভাগই চলতি সমস্যা, যদিও কতকগুলি সমস্যার বেশী গুরুত্ব ছিল। পরবর্তী ঘটনার মাপকাঠিতে বা আধুনিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তাধারার কতটা তাৎপর্য বা যৌক্তিকতা ছিল, তার অতটা মূল্য নেই যতটা আছে তাঁর সহানুভূতিশীল মন ও দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করার প্রয়োজন, কারণ নানা ঘটনার মধ্যে তাঁর উদার মনের পরিচয়ই ফুটে উঠতো। দরিদ্র বিত্তহীন কৃষকদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতির পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। কৃষকদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন যেকোন বিধিব্যবস্থার তিনি বিপক্ষে ছিলেন। সারা

জীবন ধরে তিনি এর জন্যই সংগ্রাম করেছেন। প্রজাস্বত্বভোগীদের জমির মালিকানা অন্যদের হাতে সমর্পণ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার যে প্রস্তাব করা হয়, সে সম্পর্কে রমেশ চন্দ্র লিখেছেন, "বাংলা দেশের কথা যদি ধরা হয়, তবে এই বিধিনিষেধ সংক্রান্ত প্রস্তাবের কোন সার্থকতা নেই বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলার প্রজাস্বত্বভোগীদের যে অধিকার প্রত্যেক দিন তারা ভোগ করে আসছে এই ব্যবস্থা নেওয়া হলে সে অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হবে...... ভাইস্‌রয় কাউন্সিলে শুধু জমিদারদের স্বার্থই দেখা হয়। এটা খুবই দুঃখের কথা। হস্তান্তরের অধিকার এখনও আইনসম্মত করা হলো না। দেশের প্রচলিত রীতিনীতির ওপরেই হস্তান্তরের বাপারটা ছেড়ে দেওয়া হয়।"

রায়তদের প্রজাস্বত্ব অধিকার রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার ওপরে তিনি সমান গুরুত্ব দিতেন। নীতিবর্জিত শোষকদের হাত থেকে রক্ষা পাবার মত আইনে যথেষ্ট রক্ষাকবচের বাবস্থা নেই দেখে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সরকারী রিপোর্টে তিনি বারবার এই বিষয়ে উল্লেখ করেন। তাই তখনকার সরকার এ বিষয়ে বিবেচনা করতে বাধ্য হন। ১৮৯৫ সালে গৃহীত এক সরকারী প্রস্তাবে এই বিষয়ে রমেশ দত্তের মতামতের উল্লেখ করা হয়েছে। তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "রায়তদের ভিটেমাটি সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে ভূমিস্বত্ব আইনে যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা নেই। জমিদাররা কখনও বা তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রায়তদের কাছ থেকে জমি দখল করার জন্য ভিটেমাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করেন—ভূমিস্বত্ব আইনের ৮০ অনুচ্ছেদে এই মর্মে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিস্বত্ব আইনের ১৮২ ধারা অনুযায়ী ভিটেমাটি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয়। রায়তদের অধিকার রক্ষা করার ব্যাপারে এটাকেই এতদিন জোরালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হতো কারণ এতে এই ব্যবস্থা আছে যে স্থানীয় প্রথা বা চলতি রীতিনীতি যদি এই ধারার বিপরীত বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে রায়তদের কৃষিজাত ভূমি সম্পর্কে

যে নিয়মাবলী ও আইন প্রচলিত, ভিটেমাটি সংক্রান্ত ভূমির বিষয়টি সেই আইনের এক্তিয়ারভুক্ত। এই ব্যাপারে কমিশনারকে একটি বিশেষ রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই আইন অপব্যবহার করা হচ্ছে তা প্রমাণ করার জন্য তিনি যদি আরও কিছু তথ্যসম্বলিত পরিসংখ্যান যোগাড় করতে পারেন, তাহলে রিপোর্টে যেন তাও তিনি সন্নিবেশিত করেন। সত্যিই যদি এই দুর্নীতি থাকে এবং যদি সেই দুর্নীতি দূর করতে এই আইন অসমর্থ বলে মনে করা হয় তাহলে আইনটির সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।"

প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, বিশেষ করে গ্রাম ও জেলা পর্যায়ে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপরে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের একটা ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি সারা কর্মজীবনে সরকারকে নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে প্রধানতঃ তিনি দু'ধরনের যুক্তি দেখাতেন। একদিকে তিনি চেয়েছিলেন, ভারতবাসীরা, বিশেষ করে শিক্ষিত ভারতবাসীরা, প্রশাসনের নানা ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করে তুলুন। কারণ রাজনৈতিক জীবনে এগিয়ে যেতে হলে এটা অপরিহার্য। এদেশে একদিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে এটা হবে প্রথম পদক্ষেপ, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। অন্যদিকে, যাঁদের জন্য প্রশাসন ব্যবস্থা, তাঁদের প্রতিনিধিদের মতামতের মূল্য না দিলে প্রশাসন কখনও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। তিনি বলেছেন, অল্প সংখ্যক বিদেশীর প্রশাসন, আপাতদৃষ্টিতে তা যত সুদক্ষই হোক, জনগণের সঙ্গে যদি তার কোনরকম যোগাযোগ না থাকে, জনগণের চিন্তাধারা ও আশা-আকাঙ্খার ব্যাপারে যদি তার কোন পরিচয় না থাকে তাহলে সে প্রশাসন ব্যবস্থায় জনগণের কল্যাণ করা সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের উদার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রমেশ দত্ত অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অবশ্য তদানীন্তন সরকার এ ব্যাপারে খুব একটা সাড়া দেননি, অনেক সময় নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। তবুও

একেবারে তাঁরা অগ্রাহ্যও করতে পারেন নি এবং যতদূর সম্ভব এ দাবী পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। সরকার সাধারণতঃ যুক্তি দেখাতেন, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হলে কর্মদক্ষতার অবনতি ঘটবে। রমেশ দত্তের একটি রিপোর্টের ওপর মন্তব্য করে সরকারী প্রস্তাবে এই ধরনের যুক্তিতর্ক পেশ করা হয়। সেটা কৌতূহলোদ্দীপক। সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "১১৪ অনুচ্ছেদে যে অভিমত দেওয়া হয়েছে তা হলো এই যে, উপদেষ্টা সংস্থা হিসেবে জেলা পর্ষদগুলিকে কাজে লাগালে এবং প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বেসরকারী কর্মচারীদের ওয়াকিবহাল করে তুললে শুভ ফল পাওয়া যাবে। এই অভিমতের পক্ষে কেউ কোন কথা বলেন নি। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের অধিকার নিয়েই আসল লড়াই—অবশ্য সত্যিই যদি একে লড়াই বলা যায় তবে। স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিলে প্রশাসনিক দক্ষতার অবনতি ঘটবে কিনা আর যদি অবনতি হয়, তাহলে সর্বসম্মত এই পথে এগোবার যে সুবিধে তাতে লাভই বা কতটা এই প্রশ্ন নিয়েই লড়াই। মিঃ আর. সি. দত্তের অভিমত এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেনি। তবে গ্রাম ইউনিয়নের তিনি একজন সমর্থক এবং এ ব্যাপারে তাঁর অভিমতও খুবই যুক্তিসঙ্গত ও মূল্যবান।

অবসর গ্রহণের ৯ বছর বাকী থাকা সত্বেও রমেশ দত্ত ৪৯ বছর বয়সে সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন। সেদিন অনেকে এতে বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে একাজের কোথাও গরমিল ছিলনা। সরকারের উচ্চ পদগুলিতে ভারতীয়দের বহাল হবার কোন সুযোগ ছিলনা। ঠিক এমন একটা সময়েই তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। দেশের সুষ্ঠু প্রশাসনের ওপরে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর কল্যাণ নির্ভর করতো। অথচ সেই প্রশাসনের ভার ছিল বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ওপর। কোনরকম প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার অভাবে ভারতীয়ের পক্ষে দেশের শাসকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার একমাত্র সুযোগ ছিল এই ভারতীয় সিভিল সার্ভিস। রমেশ দত্ত এই সুযোগের

সদ্ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিলেন, কারণ প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব পালন করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা ভারতীয়দের নেই এই অভিমত শুধু যে প্রচলিত ছিল তাই নয়, তখনকার দিনের শাসকগোষ্ঠী এই ধারণা বেশ ফলাও করে প্রচারও করেছিলেন। রমেশ দত্ত তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য যত শক্ত কাজ বা দায়িত্বই তাঁকে দেওয়া হতো তিনি তা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করতেন। শুধু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতেই নয়, যোগ্যতম কাজে শিক্ষিত ভারতীয়দের দক্ষতা প্রমাণ করার জন্যেও একাজ করতেন। এই মনোভাব নিয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে রমেশ দত্ত দেশের প্রকৃত কল্যাণ করেছেন। ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার পর থেকে রমেশ দত্ত তাঁর পূর্ববর্তীদের ও সমসাময়িকদের তুলনায় অনেক যোগ্যতর পদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, শুধু তাই নয় রীতিমত দক্ষতাও দেখিয়েছেন। এর স্বীকৃতি তদানীন্তন সরকারকে দিতে হয়েছে। তাঁদের পক্ষপাতদুষ্ট ভুল ধারণা হয়তো তিনি একেবারে পাল্টাতে পারেননি এবং যে কোন ব্রিটিশ কর্মচারীর মত ভারতীয়রা সমান দক্ষতার সঙ্গে উচ্চতর পদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম—এ বিশ্বাসও হয়তো তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কারণ তাঁরা হয়তো বলতেন, কয়েকজন সত্যি সত্যি বলেওছিলেন, যে রমেশ দত্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। রমেশ দত্ত তাঁর স্বদেশবাসীদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে পেরেছিলেন শাসক গাষ্ঠীর অভিমতের চেয়েও তার মূল্য ছিল অনেক বেশী। পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় দোষ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। এর ফলে যে নৈতিক অবনতি ঘটে সেটা দাসত্বকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করে। পরাধীন জাতিকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বদ্ধ করে এমন যে কোন কাজ বা সেবা দাসত্ব মোচনের পথ করে দেয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে এবং তাতে কৃতিত্ব দেখিয়ে রমেশ দত্ত এই পথ দেখিয়েছেন। তিনি তঁরে স্বদেশবাসীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সুযোগ পেলে শাসকগোষ্ঠীর মত ভারতীয়েরাও প্রশাসনের উচ্চপদ সফলতার

সঙ্গে অলঙ্কৃত করার ক্ষমতা রাখে। অন্য অনেকে রমেশ দত্তের পথ অনুসরণ করেছেন এবং অনেকেই যথেষ্ট দক্ষতা ও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এইভাবে শাসকগোষ্ঠীর সহজাত শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণা ধীরে ধীরে দূর হলো এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ উন্মুক্ত হলো।

এই চাকরী জীবন যতই সম্মানের হোক তবু তা রমেশ দত্তের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিলনা। চাকরী তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য নয়, দেশকে সেবা করার একটি মাধ্যম মাত্র। তিনি নিজেই প্রায় বলতেন, সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধিই তাঁর 'প্রথম প্রেম'। তখনকার দিনে কোন ভারতীয়ের পক্ষে যতটা সম্ভব রমেশ দত্ত তাঁর কর্মজীবনে ততটা উন্নতিই করেছিলেন। সরকার তাঁর সঙ্গে কোন রকম খারাপ ব্যবহার করেননি। খারাপ ব্যবহারের কোন অভিযোগে তিনি অবসর গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর ভাইকে চিঠি লিখে তাঁর মনের অবস্থার কিছুটা আভাষ দিয়েছেন :

"এঁরা আমার সঙ্গে মোটামুটি ভাল ব্যবহার করেছেন তবে আবার বিশেষ অনুগ্রহও দেখাননি। সেক্রেটারিয়েটের দরজা আমার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। এখানে কোনো বিশিষ্ট পদে আমাকে একদিনের জন্যও নেওয়া হয়নি। আমি দেখেছি আমার অধস্তন কর্মচারী, সরকারের সেক্রেটারী, পর্ষদের সিনিয়র সেক্রেটারী, পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল বা অন্য কোনো বিশেষ ও উচ্চপদে আসীন হয়েছেন। আমি কোন অভিযোগ করছিনা, আমি শুধু কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে দেখাতে চাই সরকার যদি আমার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস না রাখতে পারেন তাহলে অন্যভাবে আমার দেশকে সেবা করার জন্য আমার যতটুকু ক্ষমতা এবং দক্ষতা আছে তার সদ্ব্যবহার আমি করতে চাই।"

মেয়াদ শেষ হবার আগে রমেশ দত্ত কেন অবসর নিয়েছিলেন, তাঁর এই উক্তি থেকে তার একটা সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তাঁর প্রতি

সরকার মোটামুটি ভাল ব্যবহার করেছিলেন, তবে উদারভাবে নয়। অভিযোগ করার সুযোগ সরকার দেননি বটে কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তাঁর স্বতঃসিদ্ধ ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার কোনো অভিপ্রায় সরকারের ছিলনা। তিনি অনুভব করলেন, সরকারী চাকরীতে বহাল থেকে দেশসেবা করবার সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে সরকারী চাকরী করলে যে বাধানিষেধের মধ্যে থাকতে হবে তা তাঁর কর্ম ও বাক্‌স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করবে। জীবনের এমন একটা অধ্যায়ে তিনি পৌঁছে গেছেন যখন দেশের সেবা করতে হলে এই স্বাধীনতা খুবই প্রয়োজন। প্রশাসনের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ও প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিমত গড়ে উঠেছে। সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকবার সময়ে তিনি কখনও কখনও সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছেন। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বা অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামতকে এখন সরাসরি কাজে লাগাবার সময় এসেছে এবং তিনি ভাবলেন এই সময়ে সরকারী চাকরীর বাধানিষেধ কর্মপ্রচেষ্টার অনুকুল হবে না। তিনি ভাবলেন তার চেয়ে বরং সরকারী গণ্ডীর বাইরে তাঁর বাক্‌স্বাধীনতা ন্যায়সঙ্গত পথে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে অন্যদিকে সরকারের ওপরে তাঁর মতামতের প্রভাব বেশী পড়বে। সুতরাং তিনি চিন্তা করে দেখলেন, সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেবার এই উপযুক্ত সময়, তাঁর দেশকে সেবা করার এই উপযুক্ত মুহূর্ত। কারণ দেশের যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি চিন্তা করেছেন সেই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কাজ করবার সময় এসেছে। তাঁর এই ধারণা যে কত গভীর ছিল তার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত অবসর যাপনের পর তিনি মাত্র ১২ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই বছরগুলি সফল প্রয়াসে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, জীবনের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল ছিল এই বছরগুলি। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলন যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, এই বছরগুলিতে তিনি তার ভিত্তি রচনা করে গেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অবসর গ্রহণের পথে

১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে রমেশ দত্ত আবার য়ুরোপ পাড়ি দিলেন। তখনো তিনি সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেননি কিন্তু অবসর নেবার কথা ভাবছেন। কতটা কি করতে পারবেন, কোন যোগ্য কাজে আত্মোৎসর্গ করতে পারলে সুফল হবে তার ওপরেই অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নির্ভর করছিল। জাহাজ থেকে তিনি তাঁর মেয়েকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তখনকার মনের অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, "দশ মাসের ছুটি নিয়েছি, সম্ভবতঃ তা বাড়িয়ে এক বছর করবো। ছুটি ফুরলে কি করবো তা এখনো ভাবিনি। আমার মনোমত যদি কোন কাজ পাই, যদি ট্যাঁকের পয়সায় টান না পড়ে তাহলে হয়তো আর সরকারী চাকরী করবো না। ভারতে আমি ফিরবই, অল্পদিনের জন্য হলেও ফিরবো। এখানে দীর্ঘদিন বাস করতে হলেও শেষকালে ভারতবর্ষেই ফিরে যাব……"।

ইংলণ্ড যাবার আগে তিনি য়ুরোপের নানা স্থানে ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর ভ্রমণের তৃষ্ণা ছিল সুতীব্র। ইতালীর বিভিন্ন শহর পরিদর্শন করলেন—নেপলস্, রোম, ফ্লোরেন্স, পিসা, জেনোয়া এবং টুরিন। কিছুদিন রইলেন ফ্রান্সে। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে ইংলণ্ড পৌঁছলেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিয়েই তিনি তাঁর আর এক মেয়েকে চিঠি লিখলেন: "বৃত্তিতে যদি টেক্কা মেরে বেরিয়ে যেতে পারি তবে আর সরকারী চাকরী নয়। ওতে আমার আর আকর্ষণ নেই। কোন কারণে হয়তো ব্যর্থ হতে পারি কিন্তু নিরলস প্রয়াসের অভাবে কোনমতেই ব্যর্থ হবনা।"

ইংলণ্ডে গিয়ে রমেশ দত্ত নানা কাজে ডুবে গেলেন। ভারত সম্বন্ধে আগ্রহী বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করলেন। ইণ্ডিয়া অফিসের স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলি, স্যার জর্জ বার্ডউড, স্যার ডবলিউ.

ওয়েডারবার্ন ও স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন। এই সময়ে ভারতে পুনার ব্রিটিশ আর্মি অফিসার লেফটন্যাণ্ট আয়াটকে হত্যা করা হয়েছিল। আর একজন ইংরেজ মিঃ র‍্যাণ্ডকে হত্যা করার চেষ্টা হলো। রমেশ চন্দ্র এই দুটো ঘটনাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ও দীপ্ত কণ্ঠে নিন্দা করলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডে তখন তীব্র অসন্তোষ। দাবী উঠলো, "সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজদ্রোহ আর যাতে বেশী ছড়িয়ে না পড়ে তার সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।" সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া উচিত, কি ভাবে বিচার করলে এ ঘটনার পটভূমি বোঝা যাবে তার জন্য রমেশ দত্ত উঠে পড়ে লাগলেন। সংবাদপত্রে চিঠিপত্র লিখলেন। তিনি এই যুক্তি দেখালেন, এই ঘটনার জন্য সমস্ত ভারতকে দোষারোপ বা সন্দেহ করা অন্যায় ও অযৌক্তিক। তাঁর অভিমত, এটা আতঙ্ক, আতঙ্কের জন্যই ভারতের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে সন্দেহ করা হচ্ছে। ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের তিনি আতঙ্কে দিশাহারা না হয়ে পড়তে উপদেশ দিলেন। যুক্তি দিয়ে দেখালেন ভয়ের কোন কারণ নেই। সংবাদপত্রের জন্যই রাজদ্রোহ প্রবল হয়ে উঠেছে এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করাই একমাত্র উপায়, এ দাবী সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি বললেন, "ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্র করতে চাইলে প্রথমেই আমি ভারতীয় ভাষায় ছাপা পত্রিকাগুলির গলা টিপে ধরবো। দেশী সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করতে চাইবো। রাস্তার আলো বন্ধ করে রাখলে চোর ডাকাতেরই সুবিধে। এইসব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করলে সেই দশাই হবে।

১৮৯৭ সালটা কেটে গেল নিদ্রাহীনতায়, ও বাতের রোগে ভুগে। সারা বছর আরোগ্য লাভের সাধনা। বিশ্রাম নিলেন ঠিকই কিন্তু এই বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে ভেবে ঠিক করে নিলেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। লেখকদের ক্লাবের তিনি হলেন একজন সদস্য। ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে ভারতীয় ইতিহাস পড়াবার আমন্ত্রণ পেলেন। এই নিয়োগপত্রে মাইনের উল্লেখ

ছিলনা। রমেশ চন্দ্র তাঁর মেয়েকে চিঠি লিখলেন, "এ আমন্ত্রণ হেলাফেলার নয় রে, খুব সম্মানের। সম্মান তো আছেই, বড় কথা মনের মত কাজ। এদেশে এমন কাজ পাওয়া শুধু সম্মানেরই নয়, পদমর্যাদার ব্যাপারও বটে।"

১৮৯৭ সালের শেষের দিকে রমেশ দত্তের একটি বই বেরুল, নাম 'ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া'। মাত্র ১৬০ পাতার বই। সারা বছরের ফসল, কৃতিত্ব। এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েকটি দিক এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর এই চিন্তাধারাই ফুলে ফসলে বহু বিস্তৃত হয়েছে অন্য বইয়ে। জীবনের শেষ বছরগুলিতে তাঁর যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিমত গড়ে উঠেছিল এখনকার এই চিন্তাধারার মধ্যেই ছিল তার বীজ, তার বনিয়াদ। ভারত ইতিহাসের সঙ্গে ইংলণ্ডের যোগসূত্র কোথায়—সেটাই 'ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া'র প্রতিপাদ্য বিষয়। এতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন ইংলণ্ডের ইতিহাস ও ভারতীয় ইতিহাস—এই দুই স্রোত এসে মিশেছে একই নদীতে, বয়ে চলেছে পাশাপাশি। বইটির শেষ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন—ইংলণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভারত এগিয়ে চলেছে। ইংলণ্ডের মতই ভারত মাঝে মাঝে ভুল করেছে। অথচ ইংলণ্ডের নির্ধারিত পথেই সে এগিয়ে চলেছে। গতি যত শ্লথ হোক, সেই পথেই সে উন্নতির পথ করে নিয়েছে।

তিনি এই উন্নতির পরিচয় দেন তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে। সুচিন্তিত অনুশীলন করে দেখান ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক পরিণাম। রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, সে কথা ভেবে তিনি এই বই লেখেননি। তাঁর একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ঠিকই কিন্তু অর্থনীতির বুনিয়াদের দিকে নজর দিয়েই তিনি একাজে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট থাকুক—এটাই তিনি চেয়েছেন, ছোটখাট মনোমালিন্যে তিনি অধীর হয়ে ওঠেননি। ভারত স্বাধীন হবে সে স্বপ্ন সামনে রেখে যাঁরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের দলভুক্ত হতে চাননি। সে উদ্দেশ্য নিয়েও তিনি

অর্থনৈতিক পরিণতির সমালোচনা করেননি। বরঞ্চ, নিরপেক্ষভাবে অনুশীলন করেই তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসেন। বাস্তব অবস্থাকে গ্রহণ করার মত উদার মন, সাহস, ও সত্যনিষ্ঠা তাঁর ছিল, এ তাঁর গভীর দেশ প্রেমেরই পরিচয়। জনজীবনের প্রধান ভিত্তি কি, সেটা সবার সামনে তুলে ধরতেই তাঁর এ অনুশীলন সহায়ক হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তাঁর পরিণত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলিয়ে মনে হবে এইসব সিদ্ধান্তের সঙ্গে যেন কোন যোগসূত্র নেই। তবুও এ চিন্তাধারা তখনকার কালের চিন্তাভাবনা থেকে যে এগিয়ে ছিল তা আজ আর অনুমান করা শক্ত নয়। আধুনিক ভারতের স্রষ্টাদের মধ্যে রমেশ দত্তের কতটা স্থান পরের পরিচ্ছেদে সে বিষয়ে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে 'ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে তিনি যে সংক্ষিপ্ত উপসংহারে এসেছেন তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে অন্য বইয়ে। সেগুলির মূল্য অসাধারণ। মূল্যটা এইজন্যে যে, একজন সত্যানুসন্ধানীর কাছে কতকগুলি সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল। এত দূরেরটা দেখা প্রশংসনীয় ব্যাপার নিশ্চয় কিন্তু পূর্ব-নির্ধারিত কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত নয় বলেই এ তথ্যের এত তাৎপর্য।

'ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া'র ভূমিকায় রমেশ দত্ত সংক্ষেপে যা বলেছেন তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর অভিমত :

"এ দেশের জমি এত উর্বর। এ দেশের মানুষ এত মিতব্যয়ী, এত পরিশ্রমী। অথচ দেড়শো বছর ব্রিটিশ শাসনের পরও দেশে বারবার দুর্ভিক্ষের কালোছায়া নেমে আসে, সেটা তো কারুর পক্ষেই আনন্দদায়ক হতে পারেনা। চল্লিশ বছর ধরে এখানে নির্বিঘ্ন শান্তি। তবুও ভারতের মানুষ সমৃদ্ধতর জীবনের সন্ধান পাচ্ছেনা কেন ? দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তি পাচ্ছেনা কেন ? এটা কি খুব সুখের কথা ? সুসভ্য প্রশাসন ব্যবস্থা, রেলওয়ে স্থাপন, খাল খনন, ব্যাপকতর কৃষি কাজ, সমৃদ্ধতর বৈদেশিক বাণিজ্য সত্ত্বেও এখনো ভারতে মাঝে মাঝে

যে রকম চরম দুঃখজনক ঘটনা ঘটে তা য়ুরোপের কোথাও ঘটা কল্পনাতীত।” এই দুর্দশার কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, “নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করলে যা আমি বলতে চাই তা চোখে পড়বেই, তা আজকে পড়ুক কিংবা কাল। ভারতের বর্তমান প্রশাসনিক বিভাগ নিশ্চয় সুদক্ষ। এতে কারুর কোন সন্দেহ নেই। কন্তু কতকগুলি গুরুতর ভুল হচ্ছে। সবচেয়ে বড় ভুল অত্যধিক খরচপত্র বাড়িয়ে তোলা। এতে ভারতবাসী দিন দিন আরও দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। খরা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তারা আর নিজেদের রক্ষা করতে পারছেনা। ভারতের এই বিপুল জনসাধারণের বাঁচার একমাত্র রসদ, এই ভূমি। অথচ এই ফলনের ওপরে যদি রাষ্ট্র এতটা ভাগ বসায়, যদি সে দাবী ক্রমশই বাড়তে থাকে তাহলে সাচ্ছল্যের দিনে এই দরিদ্র মানুষেরা সঞ্চয় করবে কি করে? আর দুর্যোগের দিনেই বা এরা নিজেদের বাঁচাবে কি ভাবে? পূর্বাঞ্চলে সীমান্ত রক্ষা করতে যদি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলাই ইংলণ্ডের রাজদরবারের নীতি হয়ে দাঁড়ায়, ভারতের ব্যয়ভারের দিকে সামান্যমাত্র নজর না দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে মোতায়েন বিপুল সংখ্যক সৈন্যদের ভরণপোষণ করতে এতটা অর্থ বেরিয়ে যায় তাহলে একটা সমৃদ্ধ ও উর্বর দেশের সব রসদ ফুরিয়ে যাবে সেটাই তো স্বাভাবিক। ব্রিটিশরা এই যে এত অর্থ খাটাচ্ছে তার বিনিময়ে তারা পাচ্ছে অঢেল টাকা। যুদ্ধের সময় না হয় অন্য কথা কিন্তু শান্তি বিরাজ করলেও যদি ভারতের ঋণের পরিমাণ বাড়তেই থাকে আর যদি স্বর্ণ মুদ্রায় এ ঋণ শোধ দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে এ দেশের রসদ কিভাবে যে ফতুর হয়ে যায় তা তো অনুমান করা খুবই সহজ। দেশের প্রশাসনিক ব্যাপারে জনসাধারণের অভিমত কি তা জানার কোন উপায় নেই। এতে হয় কি, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কেও প্রশাসন বিভাগ অজ্ঞ থেকে যায় আর এ অজ্ঞতা তাকে দুর্বল করে তোলে। জনগণের প্রতিনিধি যেখানে নেই সেখানে জনমত জানারই বা উপায় কোথায়? তাই লোকেদের কতটা দুর্দশা, লক্ষ

লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যে কেন নির্বাক তা জানার তাগিদ কোথায়? তাই এই অজ্ঞতা।

ভারতে বৃটিশ শাসনে আসল গলদ কোনখানে একটি অনুচ্ছেদের স্বল্প পরিসরে রমেশ চন্দ্র তা যেভাবে অনুশীলন করেছেন, তার চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? এ অনুশীলনের তাৎপর্য প্রকাশ-ভঙ্গীর নিপুণ ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ নয়, ব্রিটিশদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের মূলগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এই অনুশীলনের আসল কৃতিত্ব। বইয়ের পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে এই বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ব্রিটিশ প্রশাসনের ফলে ভারতের ঐশ্বর্য বাড়ছে বলে যে দাবী করা হয় এবং সমর্থনে যে সব যুক্তি দেখান হয় এ বইয়ে রমেশ দত্ত তা খণ্ডন করেছেন। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে "ভারতের বাণিজ্য দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বাণিজ্য মানেই সমৃদ্ধি। সুতরাং জনগণ নিশ্চয় বিত্তশালী হয়ে উঠছে।" এই যুক্তির কথা উল্লেখ করে রমেশ দত্ত তাঁর বইয়ে লিখেছেন, "ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতবর্ষের ভাগ্য ফিরছে ঠিকই। কিন্তু ভারতীয় শিল্প-প্রসারে উৎসাহ দিতে যেটুকু করা হচ্ছে তা আশীর্বাদ নিশ্চয় নয়। ভারতে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার প্রকৃত অর্থ ইংলণ্ডে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে টেক্কা না দিতে পেরে ভারতের হস্তচালিত শিল্প নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভারতের রপ্তানী বেড়ে যাবার অর্থ, আমদানী-যোগ্য সামগ্রীর মূল্য যোগাতে ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ হচ্ছে।"

তখনকার দিনে ভারতের জনগণের সমৃদ্ধি বাড়ছে তা প্রমাণ করতে আরও একটি কাল্পনিক তথ্য প্রচার করা হত। বলা হত, ভারতে সোনার আমদানী বাড়ছে। রমেশ দত্ত বললেন, সোনা আমদানী করে "ভারতের কৃষকরা মজুত করে রাখে"—এরকম একটা "কাল্পনিক" বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তিনি জানালেন, "সোনার গহনা, বুটিদার রেশমী ইত্যাদি অপচয়ের জন্য যে ক্ষয়ক্ষতি

হয়—তারজন্যই বেশ কিছুটা সোনার আমদানী করা হয়। ভারতের সমৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেদেরই এটা বিলাসিতা। প্যারিস থেকে সিল্কের টুপি কিংবা চামড়ার দস্তানা আমদানী করলে বৃটিশ খামারের মেহনতী মানুষের ঐশ্বর্য বাড়েনা। তেমনি ভারতে সোনার আমদানা করা হচ্ছে বলে ভারতীয় কৃষকদের ঐশ্বর্য বাড়ছে এ ধারণা ভুল।”

বাণিজ্য ও জনকল্যাণমূলক কার্যসূচী সম্বন্ধে উল্লেখ করে রমেশ দত্ত আরো বলেছেন, “কোন একটি দেশের মূলধন নিয়ে যখন সে দেশের বাণিজ্য ও জন-কল্যাণমূলক কার্যসূচী প্রণয়ন করা হয়, তখন জনগণের বৈষয়িক উন্নতি হয় তার প্রমাণও আছে। ভারতের ব্যাপারে ব্রিটিশ মূলধনের লাভজনক বিনিময় ছাড়া আর কিছু নয়। নানাদিক থেকে এটা ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও কারিগরদের এতে বৈষয়িক উন্নতি হবার নয়”।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বলে কত যে ক্ষতি হচ্ছে তা তিনি বারবার বলেছেন। তিনি লিখেছেন, “ভারতের মত বিশাল এক সমৃদ্ধ দেশের পরিচালনার ভার এমন এক সরকারের হাতে রয়েছে যাতে জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় কেউ নেই। এটা হাল-আমলে সাধারণতঃ দেখা যায় না।” তিনি আরও বলেছেন, ভাল সরকার দেশের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ। কিন্তু যে সরকার জনগণের দ্বারাই পরিচালিত তা আরও বড় আশীর্বাদ, কারণ তাতে সমগ্র দেশকেই উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

এত নির্ভীক সমালোচনা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতি রমেশ দত্ত অনুগত ছিলেন। বিদ্রোহ করার সময় তখনও আসেনি। তিনি শাসন ক্ষমতার হস্তান্তর চাননি, ভারতের বৈষয়িক স্বার্থের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্য রেখে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার তিনি সংস্কার চেয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে ভারতীয়দের সংযোগের অভাবেই ব্রিটিশ প্রশাসনে গলদ

দেখা দিয়েছে। সুতরাং তিনি চেয়েছিলেন দেশের বড় বড় চাকুরীতে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ করা হোক। গ্রামে শহরে ও প্রদেশে প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতের বিভিন্ন সংস্থায় জনগণের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়ানো হোক—এটাই ছিল তাঁর অভিমত।

'ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া'-তে রমেশ দত্ত যে অভিমত প্রকাশ করেন ব্রিটিশ সংবাদপত্রে তার সমালোচনা বের হয়। এই সমালোচনায় সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু অনুমোদন নয়। স্কটস্‌ম্যানের মন্তব্য লক্ষণীয়। রমেশ দত্তের অভিমত সম্বন্ধে বলা হয়, "জোরালোভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করাই ছিল এই বইটির উদ্দেশ্য। তাঁর বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক সব সময় যে জোরালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাও নয়, সর্বাঙ্গীণভাবে অভিমত প্রকাশ পেয়েছে তাও বলা যায়না, কিন্তু যে মেজাজে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা লক্ষণীয়। লেখকের পদমর্যাদা ও তাঁর বর্ণ বিচার করে দেখলে মনে হবে তাঁর এ আন্তরিক বিচারকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায়না।" রমেশ দত্তের বর্ণিত ভারতবাসীদের নিদারুণ দারিদ্র্যের কথা 'ডেইলী নিউজ' অস্বীকার করেনি কিন্তু তবুও নিজেদের প্রশংসায় মগ্ন হয়েছে—"ভারতে ইংরেজ শাসনের পিছনে যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে—মিঃ দত্তের নিজের জীবনই তার স্বাক্ষর। প্রশাসনের এ উদ্দেশ্য যেমন নিঃস্বার্থ তেমনি মহৎ। প্রভাবশালী কোন একটা জাতি আর কখনও এরকম একটা আদর্শস্থানীয় সরকার পরিচালনার কথা ভাবেনি কিংবা চালাতে চেষ্টা করেনি। ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও ইংলণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে তার আদর্শ পালন করছে। ইংলণ্ডের মুখে ক্লান্তির কোন ছাপ নেই। তার সামনে যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য তাকে সফল করতে আত্মবল চাই। তার সে আত্মবল ক্ষীণ হবার কোন লক্ষণ নেই।"

১৮৯৮ সালে রমেশ দত্ত ভাবলেন ভারতের নানা সমস্যা সম্বন্ধে ব্রিটিশ

জনসাধারণকে বোঝাতে হবে। সেটাই এখন বড় কাজ। এসব সমস্যা ভারতীয়রা কি দৃষ্টিতে দেখে, তা নিয়ে তিনি প্রচার শুরু করলেন। লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে লেকচারার হওয়ায় প্রচার কাজের অনেকটা সুবিধা হলো। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস সম্পর্কে য়ুরোপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যতটা আগ্রহ দেখান, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে ততটা নয়। তিনি ভারতে মুসলীম শাসনব্যবস্থা, ব্রিটিশ শাসন, মধ্যযুগে ও আধুনিক কালের অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি, এইসব নানাবিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন। শুধু ভারতীয় ইতিহাস নয়, শুধু অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নয়, সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে তখনকার নীতির দোষগুণ সম্বন্ধে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সীমান্ত নীতির ফলে ভারতের রাজস্ব নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ভারতের অগণিত মানুষের নিদারুণ দারিদ্র্যও তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল। সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য আজকাল পড়লে মনে হয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে জনমত কোন দিকে মোড় নেবে তিনি তা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"এটা সাম্রাজ্যবাদের যুগ। আজ সমগ্র য়ুরোপে একটা বৈষয়িক অতৃপ্তি আবার তারজন্যই সংগ্রাম। যুদ্ধ জয়ের আকাঙ্খা, সীমান্ত গ্রাস করার লোভ, বাজারকে বহু বিস্তৃত করার তৃষ্ণা এবং মুনাফার জন্য এ লড়াই। মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের জীবনের গৌরবময় অধ্যায়, ১৮৭৬ সালে বুলগেরিয়ানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর নির্ভীক সমর্থন, ১৮৯৭ সালে ক্রীট ও আর্মানিয়ানদের জন্য তাঁর সমবেদনা—এখন, এই বর্তমান যুগে, উদ্ভট কল্পনা—মনে হয় কত নিরর্থক। আমাদের কত পরিবর্তন হয়েছে। অনেকটা ক্লাইভ ও হেস্টিংসের পথ অবলম্বন করেই রোড্‌স রোডিসিয়া স্থাপন করেন। তিনিই আমাদের আধুনিক নায়ক। চেম্বারলেনের মত আধুনিক যুগের রাজনীতিকদের

কাছ থেকে রোড্‌সের ললাটে জোটে সম্মানিত উপাধি। জ্যামেসনের হামলার জন্য জনসমক্ষে নিন্দা করা হলেও মনে হয় সবাই তাকে প্রশংসা করে। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে মিঃ গোশেন লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করেছেন বলেই তিনি আজ বিশ্ববরেণ্য। প্রতিপত্তিশালী টোরী সংবাদপত্র চাইছে চীনে ব্রিটিশদের একচেটিয়া প্রভাব বাড়ুক, বাণিজ্য বাড়ুক। তাই সংবাদপত্রও লর্ড স্যালিসবেরীকে রাশিয়া ও অন্যান্য শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে তুলতে অনবরত উস্কানি দিচ্ছে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে, ১৮২২ সালে .ক্যাসেলরীগের মৃত্যুর পরের ঘটনা হিসাবের বাইরে রেখে দিলে, আর কখনও বোধ হয় ইংলণ্ডে সাম্রাজ্যবাদ এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠেনি। এত বড় হয়ে ওঠেনি স্বার্থপরতা, হিংসা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও অতিরঞ্জনের পাশবিক প্রবৃত্তি। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির প্রতি মর্যাদা যেমন বেড়েছে, অধীন দেশগুলির প্রজাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণে তেমনি পড়ছে ভাটা। আজকাল ভারত সরকার ভয় দেখিয়ে কার্য উদ্ধার করতে চায়, কেন এই দমনমূলক আইন, কেন ,এইরকম আইন চালু হয় তার কারণ আপনারা কি এখনও বুঝতে পারছেন? কমন্‌স সভায় সারিবদ্ধভাবে বসে আছেন দেখুন টোরী সদস্যরা। ভারতের জনগণকে আপনারা বিশ্বাস করতে শিখুন, ওদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনুন, ওদের আরও সুযোগ সুবিধা দিন, যাদের জন্য এই প্রশাসনের যন্ত্র, তাদের প্রতিনিধিদের আরো বেশী সংখ্যায় নিয়ে আসুন। এ কথা যদি সদস্যদের বলেন, ভারতীয় অফিসারদের বলেন, কাজ হবেনা। বলাই হবে সার। এঁরা এভাবে কেউ ভাবতে পারেন না তাই এঁরা বললেন, রেখে দাও ওসব কথা, চীন দেশের ভাষা কিনা ঠিক বুঝিনা। এদের রাজনীতির শব্দকোষে অনেক কথা লেখা নেই ; এইসব মানুষের কথাবার্তা এঁদের ধারণা ও বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই, এসব কথা এঁদের মাথায় ঢোকে না, নিরর্থক মনে হয়………”

১৮৯৮ সালের আগষ্ট মাস থেকে রমেশ দত্ত একটি বিলের বিরুদ্ধে তীব্র

আন্দোলনের সূচনা করেন। কলকাতা কর্পোরেশন সনদ সংশোধন করার জন্য বাংলা বিধান পরিষদে যে বিলটি আনা হয়েছিল—এ আন্দোলন তারই বিরুদ্ধে। সংবাদপত্রে চিঠি লিখে, ভাষণ দিয়ে, মন্ত্রী ও কমন্স সভার সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে, আলোচনা করে, রমেশ দত্ত এই আন্দোলনের প্রকৃত মর্মকথা বললেন। তখন কলকাতায় এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলছে, পুরোভাগে রয়েছেন রাজা বিনয় কৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেন রমেশ দত্ত। ইংলণ্ডে তাঁর নিজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সব খবর নিয়মিত রাজা বিনয় কৃষ্ণকে জানিয়ে যেতে লাগলেন।

রমেশ দত্তের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই বিলে প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা কমাতে চাওয়া হয়েছে। এই বিল আমাদের পেছনে হটিয়ে নিয়ে যাবে। বিদগ্ধ ব্রিটিশ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে তিনি ১৮৯৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান'-এ একটি চিঠি লেখেন। লেখা ছিল :

"বোম্বাইতে কার্যনির্বাহক কমিটির তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যকে মনোনয়ন করার অধিকার প্রতিনিধিদের রয়েছে; এই বিলে কলকাতায় কার্যনির্বাহক কমিটির তিন ভাগের এক ভাগ সদস্যকে মনোনয়ন করার ক্ষমতা প্রতিনিধিদের দিতে চাওয়া হয়েছে। এর অর্থ কার্যনির্বাহক সংস্থায় যাঁরা থাকবেন, জনসাধারণের কথা বলার অধিকার তাঁদের থাকবে না। একই নিয়মে করদাতাদের আশা-আকাঙ্খা, মত ও অভিমতকেও তাঁরা মূল্য দেবেন না। এটাই কি উদ্দেশ্য? ভারতের ক্ষেত্রে কি এটাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত? বংশপরম্পরায় বিচক্ষণ ইংরেজ রাজনীতিক ও প্রশাসকরা, ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে একটা "উচ্চ মানের" যোগসূত্র, মনোবল ও আদর্শ স্থাপনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। স্যর জন উডবার্ন যে মনোভাব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা দেখে তাঁর মন খুশীতে ভরে উঠতো সেই মনোবলকে আজকাল স্বেচ্ছাচারিতায় ও লঘু চিত্তের দুর্বলতায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। মেকলে ও বেন্টিঙ্ক, মন্‌রো ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন, ক্যানিং

ও নর্থব্রুক, রিপন ও গ্ল্যাডষ্টোন—ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য কত না অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। জনসেবার আদর্শ গড়ে তুলতে তাঁদের সাধনা, ভারতে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা স্থাপনে তাঁদের প্রয়াস অম্লান হয়ে আছে। এখন সফলতার প্রথম সূচনায় ইংরেজদের কি সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী হয়ে ওঠা উচিৎ ? তিন পুরুষের গাছ এখন মহীরূহতে পরিণত। লর্ড জর্জ হ্যামিলটনের কি তার শিকড় উপড়ে ফেলা উচিত ?

"স্বায়ত্ত শাসিত সরকারের অপমৃত্যু হলে ভারতে কল্যাণকামী প্রশাসন ব্যবস্থার মৃত্যু হবে। জনগণের সহযোগিতা ছাড়া ভারতকে শাসন করা মুশকিল ; তাদের হাতে কিছুটা ক্ষমতা দেবার মত যদি অবস্থা না আসে, যদি এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বাস না জাগে, তাহলে কি করে জনগণের সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব ?"

কিন্তু এই আন্দোলন সফল হয়নি। বিলটি পাশ হয়ে যায়। ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত কুড়িজন গণ্যমান্য ও অভিজ্ঞ সদস্য এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেন। এইখানেই এ বাকবিতণ্ডার অবসান ঘটে। তবে রমেশ দত্ত ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। নিজেদের প্রতিচ্ছবি হয়তো প্রতিফলিত দেখতে পেতেন এই কটি লাইনে :

'মুক্তি সংগ্রামের পদধ্বনি শুনে
রক্তরঞ্জিত পূর্বপুরুষের নিশান
তুলে নেয় বীর সন্তান—
পরাজয় যদি বা আসে
অবশেষে নিশ্চিত বিজয়।'

রমেশ দত্ত নানা কাজে খুবই ব্যস্ত থাকতেন। তবু ভারতের দু'টি মহাকাব্য লিখে ফেলার সময় কি করে পেলেন, ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এ

অনেকটা ঐতিহাসিক দায়িত্বভার তুলে নেবার মত দৃপ্ত মনের পরিচয়। ১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হলো। তার ঠিক এক বছর পরে রামায়ণের অনুবাদ বের হয়। বিরাট এই কাজে এর আগে আর কেউ হাত দেননি। মহাভারতের উপসংহারে রমেশ দত্ত লিখেছেন যে মূল রচনা "প্রথম সঙ্কলিত হবার পর হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, সেই মূল রচনা বাড়তে বাড়তে মহাকাব্যের রূপ নিয়েছে; আরও বাড়তে বাড়তে মহাকাব্যের স্ফটিক নদী হারিয়ে গেছে নানা ধর্মে, নানা নীতি শাস্ত্রের উপাখ্যানে, রূপকথায়, গল্পে ও নানা ঐতিহ্যে।" এই কাব্য রচনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে ৯০ হাজার শ্লোক। ইলিয়ড ও ওডিসি একত্রে যতটা, এই মহাকাব্য তার প্রায় সাতগুণ। অসংখ্য তথ্যের মধ্যে রমেশ দত্ত বেছে নিয়েছেন সেইসব শ্লোক যাতে মহাকাব্যের প্রধান ঘটনা বিবৃত। রমেশ দত্ত বলেছেন, "যে ভাবে আমি সাজিয়েছি, আমি ভেবে দেখেছি এই মহাকাব্যের প্রধান ঘটনাগুলি একত্র করলে ইংরেজীতে এক পূর্ণাঙ্গ ও অ-সংক্ষেপিত কাব্যানুবাদ লিখে ফেলা যায়। সংযোজনে সুবিধার জন্য অল্পবিস্তর টিকাটিপ্পনী দিয়ে এই অনুবাদের অংশগুলি যদি একত্র করা যায় তাহলে মহাকাব্যের পুরো কাহিনী আধুনিক পাঠকের কাছে তুলে ধরা সম্ভব। অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেবার ফলে তাদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে…এই পদ্ধতি গ্রহণের সুবিধা এই যে, যেসব শ্লোক পাঠকদের কাছে পেশ করা হবে—সেগুলি পেশ করবেন কবি নিজে, অনুবাদক নয়। এটাই এর মস্ত সুবিধে।"

তিনি একই ভাবে রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। কাজটা অনেক সোজা ছিল, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, রামায়ণে "প্রধান কাহিনীটা একজন লেখকের সৃষ্টি বলে স্পষ্ট অনুমান করা যায়।" মহাভারত ও রামায়ণের মধ্যে ধারণা ও বিশ্বাসের যে পার্থক্য সে সম্বন্ধে রমেশ দত্তের নিজস্ব একটা

অভিমত ছিল: "কুরু ও পাঞ্চালের মধ্যে ঐতিহাসিক যুদ্ধের ফলে যে ঐতিহ্য ও উপকথা প্রচলিত হয় তার ওপর ভিত্তি করে মহাভারত রচিত"। "কোশল ও বৈদর্ভদের সময়ে স্বর্ণযুগের স্মৃতিকথা থেকে" রামায়ণের সৃষ্টি। সুতরাং মহাভারতের চেয়ে রামায়ণে কল্পনাশ্রিত কাহিনীর অংশ অনেক বেশী। "মহাভারতের চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক জগতের নায়ক নায়িকা, যাঁরা দোষগুণ নিয়ে রক্তমাংসের মানুষ। সত্যের প্রতি পুরুষোচিত এবং নারীসুলভ বিশ্বস্ততা ও ঘরোয়া জীবনের প্রেম ও ভালবাসার আদর্শ থেকে রামায়ণের চরিত্রগুলি কল্পিত।"

অনুবাদিত গ্রন্থ দুটি ইংলণ্ড ও ভারতে প্রশংসিত হয়। মহাভারতের অনুবাদ গ্রন্থে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ভূমিকা লেখেন। তিনি লেখেন, "মিঃ রমেশ দত্ত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে দীর্ঘ এই কাব্য গ্রন্থকে আমাদের সামনে ছবির মত তুলে ধরেছেন বলে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ভারতের আর্য বন্ধুরা তাঁদের মহাকাব্যে যে জিনিসটা পায়, যা তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন,—সাহিত্যের ছাত্ররা এই বইয়ে তার একটা সম্যক ধারণা করতে পারবেন।"

রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা ১৮৯৯ সালের জুলাই সংখ্যাতে মন্তব্য করে, "ঐতিহাসিক বিচারধারা হিসেবে না দেখে একে সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে দেখা উচিত। সাহিত্যের বিচারে এ প্রয়াস সুনিশ্চিতভাবে সফল। মূল কাহিনীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, মূল ছন্দের সঙ্গে সুর মেলাবার আন্তরিক প্রয়াস, বাক্-বৈশিষ্ট্যসম্মত ছন্দবহুল ইংরেজীতে দখল এবং কাব্যচিত্র রূপায়ণে প্রকৃত ক্ষমতা—এইসব গুণের সামঞ্জস্যে এই অনুবাদটি হয়ে উঠেছে সার্থক শিল্পসৃষ্টি। লেখক এটাই করতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যের যা নির্যাস, তাকে ইংরেজী পাঠকদের কাছে লেখক আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা

১৮৯৯ সালে রমেশ চন্দ্র রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বলা যায়। কারণ ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে এবং তিনি তাতে পৌরোহিত্য করেন। মিঃ ডব্লিউ সি ব্যানার্জি তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি হবার এই আমন্ত্রণ জানাবেন, তা তিনি আগে ভাবতেই পারেননি। তিনি এই আমন্ত্রণ পেয়ে "যেমন বিস্মিত হয়েছেন, তেমনি একটু সংশয়াকুল"। সভাপতির অভিভাষণে তিনি সেকথা উল্লেখ করেন। তিনি বিস্মিত হয়েছেন কারণ আগে থেকে এই আমন্ত্রণের কথা তাঁকে জানানো হয়নি আর সংশয়াকুল হবার কারণ, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করতে ও উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবেন কিনা সে বিষয়ে তখনও মনস্থির করেন নি। তিনি .অনেকবার বলেছেন, শৈশব থেকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাসনা, সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন। প্রশাসনের উচ্চপদের দায়িত্বভার নেবার যোগ্যতা ভারতীয়দের আছে, সেটা প্রমাণ করতেই তিনি চ্যালেঞ্জ হিসাবে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সরকারী চাকুরীর প্রতি কোন মোহ তিনি পোষণ করতেন না। অবশ্য চাকরী জীবনের অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি দেশের অসংখ্য কৃষকদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন এবং তাদের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুর্দশার মূল কারণও বুঝতে পেরেছেন। ব্রিটিশ শাসনের এক শতাব্দী কেটে যাবার পর সুসময়ে লোকেরা শুধুমাত্র জীবন ধারণের জন্য প্রাণপাত করেছে আর একটা নিষ্করুণ অভিশাপের মত ক্ষণে ক্ষণে আসা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অসহায় খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে—এ দেখে

তাঁর সংবেদনশীল মনে গভীর বেদনার ছায়া পড়তো। ভাবতেন এই ভারতীয় কৃষকদের ভাগ্য ফেরাতে কিছু একটা করতেই হবে। তিনি জানতেন সরকারী চাকরীতে বহাল থাকলে এ ব্যাপারে কিছুই তিনি করতে পারবেন না। নিজস্ব অভিমত প্রচার করতে হলে চাই বাক্ স্বাধীনতা, কর্ম স্বাধীনতা। তাই ভাবলেন চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

অবসর নিয়েই রমেশ দত্ত যে রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করা যায় কিনা তাঁর কাছে সেটাই তো এখন বড় কাজ। তবে বেছে নিলেন সংবিধানসম্মত পথ। ওতেই তাঁর বিশ্বাস। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ভাগ্যগুণে বা ইতিহাসের বিধানে ব্রিটিশদের সঙ্গে ভারতীয়দের যে যোগসূত্র রচিত হয়েছে তা দেশের পক্ষে শুভ। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, ভারতে ব্রিটিশদের গড়া প্রশাসনিক কাঠামো মূলত সুসংবদ্ধ এবং এর অভিপ্রায়ও ভাল। তাঁর মতে ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে ব্রিটেনের উন্নতি হলে ভারতেরও হবে। ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাগলে ভারতের নীতিও হবে প্রতিক্রিয়াশীল। ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়াশীল মতের ফলে অথবা ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকদের অজ্ঞতার ফলেই ব্রিটিশদের "ভুল" হয়। এ দু'টোর যে কোন কারণেই হোক না কেন ভারতীয় জীবনধারার প্রকৃত অবস্থা ও তাদের আশা আকাঙ্খা সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনমতকে ওয়াকিবহাল করা দরকার, এই ছিল তাঁর অভিমত। নিজের দেশে প্রশাসনকার্যে ভারতীয়দের সংখ্যা এত কম দেখে এবং ভারতে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার একেবারেই অভাব দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ না করে পারেননি। প্রতিনিধিত্ব সংস্থা গড়ে তুললে এবং প্রশাসনবিভাগে বেশী সংখ্যায় ভারতীয় অংশ গ্রহণ করলে তবেই ভারতের বক্তব্য শাসকদের নজরে আনা সম্ভব। এভাবেই অতীতের "ভুল" সংশোধন করা যায়।

প্রথম জীবনে প্রশাসনিক বিভাগে যে কাজে রমেশ দত্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার ফলে অবসর গ্রহণের পর তিনি যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বেন এতো ছকে বাঁধা। কিন্তু সে সময় সরকারের মোসাহেবরা রমেশ দত্তের ত্রুটি ধরবার জন্য পা বাড়িয়েই ছিলেন। তাঁরা সুযোগ পেয়ে রমেশ দত্তের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় মেতে উঠলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, সরকার এতদিন ভরণপোষণ করে তাঁকে এত মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। সে মানুষ যদি এরকম একটি সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিই বা বলা যায়। এই সমালোচনা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। প্রশাসনিক বিভাগের কাজ আর রাজনৈতিক জীবনে তিনি যে কাজে প্রয়াসী হয়েছিলেন তার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য ছিলনা। প্রশাসন বিভাগের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে তো তিনি লিপ্ত হননি। যাদের জন্য এই প্রশাসন ব্যবস্থা, তাদের উন্নতি হোক—এটাই তাঁর কাম্য ছিল। যদি আরও বেশী সংখ্যক ভারতীয় প্রশাসন বিভাগে নিজেদের অংশীদার বলে না ভাবতে পারে—তাহলে প্রশাসনিক বিভাগের কি করে উন্নতি হবে? অর্থাৎ তখনকার দিনের রীতিনীতি তিনি বদলাতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাঁর প্রস্তাব-মত কতকগুলি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা প্রশাসনিক বিভাগকেই বাঁচিয়ে রাখবে, ধ্বংস করবে না। তারুণ্যের প্রাণবন্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রশাসনিক বিভাগের কাজ করেছিলেন। তাই এইসব সুপারিশ করার মত তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি প্রশাসনিক বিভাগের কাছে এই কারণে ঋণীও ছিলেন। তাই অতীতে যে ভুল তাঁরা করেছিলেন ভবিষ্যতে সেই ভুলের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেইজন্য তিনি তাঁদের সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য মনে করেছিলেন।

একতান্ত্রিক শাসন, বিশেষ করে বৈদেশিক একতন্ত্রের বড় দোষ

সমালোচনা সহ্য করার মত শক্তি নেই। এই অসহিষ্ণুতার জন্যেই একতন্ত্র তার নিজের ধ্বংস নিয়ে আসে। সমালোচনা যতই শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন বা গঠনমূলক হোক তাকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, বিশ্বাস-ঘাতকতা বলে গণ্য করা হয়। এতে সমালোচকের মনে নৈরাশ্য জাগে এবং একতান্ত্রিক প্রশাসনিক বিভাগের সঙ্গে জনগণের ব্যবধান বেড়ে ওঠে। ক্রমে এই ব্যবধান দূর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং এইভাবে নৈরাশ্য থেকে ক্রোধের সৃষ্টি। ভারতে ব্রিটিশ একতন্ত্রের ইতিহাস এর ব্যতিক্রম নয়। রক্ষণশীল সরকারী মহলের কাছে রমেশ দত্তের নির্ভীক ও গঠনমূলক সমালোচনা বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন বলে গণ্য হোল। তাঁরা ভাবলেন, একদিন যে মানুষ প্রশাসনিক বিভাগের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন তাঁর মুখে এ ধরনের সমালোচনা অশোভন। রমেশ দত্তের সুপারিশে কেউ কান দেননি। পুরনো দিনের এসব প্রস্তাবের কথা স্মরণ করলে রমেশ দত্তের নরমপন্থার এ দৃষ্টিভঙ্গীকে তারিফ করতে হয়। প্রশাসনিক বিভাগ তার চিরাচরিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি চালিয়ে গেল, ফলে এর সঙ্গে জনসাধারণের মনে আর সাড়া জাগাতে পারলনা কেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

রমেশ দত্ত সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক জীবন কেন শুরু করেছিলেন এবং ১৮৯৯ সালে কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বভার কেন নিয়েছিলেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তার ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। দেশকে সেবা করতেই তিনি ব্রিটিশ প্রশাসনিক বিভাগে কাজ করেছেন। আবার যখন পদত্যাগ করেছেন, তখনও ভেবেছেন সরকারী চাকরীতে বহাল থেকে সুষ্ঠুভাবে দেশসেবা সম্ভব হবেনা। চাকরী ছাড়লে দেশ সেবার সুযোগও বাড়বে। এ হিসাব মেটাতেই তিনি সার্ভিস থেকে ইস্তফা দেন। একজন দেশপ্রেমিক ভারতীয় হিসাবে দেশের প্রতি তাঁর প্রথম আনুগত্য। এটা স্বাভাবিকও বটে। প্রকৃত

দেশপ্রেমিকের মত তিনি সেবার আদর্শ নিয়েই প্রশাসনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন আবার একইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। পদত্যাগ করার পরও তিনি ভেবেছেন প্রশাসনিক বিভাগ ও দেশের স্বার্থের মধ্যে মূলগত কোন সংঘাত নেই। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রশাসনের বাইরে থেকে দেশের স্বার্থে প্রশাসনিক বিভাগের নীতিকে অনেক বেশী প্রভাবিত করতে পারবেন, প্রশাসনের সময়োপযোগী পরিবর্তন আনতে পারবেন। যে আদর্শকে সামনে রেখে তিনি সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেন তাতে আনুগত্যের অভাব নিশ্চয় বোঝায় না, অকৃতজ্ঞতা তো নয়ই। যাঁরা এই অভিযোগ করেছেন, তাঁরাই এই দোষে দোষী। দেশের সঙ্গে দেশের প্রশাসনিক বিভাগের স্বার্থের সংঘাত আছে বলে যাঁদের ভুল ধারণা, শুধু তাঁরাই এ অভিযোগ করতে পারেন। দু'টোর মধ্যে বিরোধ আছে বলে যাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, তাঁরাই জোর গলায় অকৃতজ্ঞতার প্রশ্ন তুলেছেন। এরকম কোন সংঘাত আছে বলে রমেশ দত্তের কোন কালেই মনে হয়নি। আর থাকলেও রমেশ দত্তকে দেশপ্রেমিক বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হতো না, কারণ একতান্ত্রিক বিদেশী প্রশাসনের স্বার্থের চেয়ে তিনি দেশের স্বার্থকে অনেক বেশী মূল্য দিয়েছিলেন।

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে রমেশ দত্ত লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি কংগ্রেসের ভূমিকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন :

"প্রত্যেক প্রশ্নের দু'টো দিক। ভাল প্রশাসন ও ভাল সরকার পরিচালনার জন্য শুধু সরকারী অভিমত নিলেই হবেনা, প্রত্যেক বিষয়ে জনসাধারণের অভিমত নেওয়া দরকার। সাধারণ মানুষের কথা শুনতে

হবে, তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা স্থানীয় সংস্থা স্থানীয় নানা বিষয়ে জনসাধারণের মতামত জানে। তবে জাতীয় কংগ্রেস সমগ্র ভারতে এমন একটি সংস্থা যে ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও অভিমতকে তুলে ধরতে চায়, সব ব্যাপারে তো বটেই, আর যদি আমাকে বলতে অনুমতি দেওয়া হয়, 'সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের' ব্যাপারেও। জাতীয় কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে সরকারেরই সেবা করছেন এবং এর মূল্য অসীম। আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি সরকার একে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেন।"*

তার আগের বছরে রাজদ্রোহ আইন পাশ হয়ে গেছে। তার সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটা ভুল পদক্ষেপ। কলকাতা পৌর আইন পাশ হয়ে যাওয়ায় প্রতিনিধিত্বের সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এতে তাঁর আপশোষের অন্ত ছিলনা। তবে জনগণের বৈষয়িক অবস্থার অনুশীলন তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। দেশে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ লেগে থাকতো। তাঁর কাছে এটা কম উদ্বেগের কথা ছিলনা।† ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষে বিস্তৃত এলাকার বহুলোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এল আবার ১৮৯৯ সালের মুখে। এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হবার যে কারণ সরকার দেখাতেন তাতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বলেছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বা জনসাধারণের দারিদ্র্য দুর্দশায় এরকম দুর্ভিক্ষ হয় না। তাঁর অভিভাষণে তিনি প্রকৃত কারণ বলেছেন :

"প্রকৃত কারণ তার (সাধারণ ভারতবাসীর) অসহায়তা ও ঋণের ভারে বিকিয়ে যাবার অবস্থা। বাংলাদেশ ও অন্য কয়েকটি অঞ্চল বাদে অন্যত্র

* সভাপতির সম্পূর্ণ ভাষণের জন্য পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য।

† দুর্ভিক্ষের তালিকার জন্য পরিশিষ্ট 'ঙ' ও দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা পরিশিষ্ট 'চ' তে দেওয়া আছে।

জমির জন্য এত বেশী খাজনা দিতে হয় যে, কৃষকরা ভাল সময়ে এমন কিছু সঞ্চয় করতে পারেনা যা দিয়ে দুঃসময়ে অর্থাৎ ভাল ফলন না হলে অভাব পূরণ করা সম্ভব। তন্তুবায় বা তাঁত শিল্পের মত আমাদের কুটির শিল্প ইংলণ্ডের যন্ত্রপাতি ও স্টিমের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু কৃষকরাই নয়, গ্রামীণ কুটির শিল্পী সম্প্রদায় জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন ভেবে নিজেদের এক টুকরো জমিকে আঁকড়ে ধরে আছে।"

"ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায়" ভারতের দারিদ্র্যের অন্যান্য কারণও তিনি তাঁর অভিভাষণে সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলেছেন :

"সামরিক খাতে প্রচুর খরচ তো আছেই ; ভারতের সহায়সম্বলের সাহায্যে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। এতো শুধু ভারতের প্রয়োজন মেটাতেই নয়, এশিয়া আফ্রিকা এমনকি য়ুরোপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যই এই বিরাট সৈন্যবাহিনী। উপরন্তু জাতীয় ঋণের প্রশ্ন ; ১৯৬০ সাল থেকে ব্রিটেনে এই জাতীয় ঋণের বোঝা প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন কম করা হয়েছে। অথচ ভারতে এই ঋণের বোঝা বেড়েছে ১০০ মিলিয়নেরও বেশী। ইংলণ্ডের ঋণের জন্য দেয় সুদ মেটাতে ভারতীয় রাজস্বের একটা বিরাট অংশ ক্রমাগত দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। তারপরে আবার মুদ্রার প্রশ্ন। মুদ্রা কমিটি সম্প্রতি এই প্রশ্নের সমাধান এমনভাবে করেছেন যা লক্ষ লক্ষ ভারতীয় কৃষকের স্বার্থের পরিপন্থী। এদিকে অসংখ্য কৃষকের ঋণের বোঝা বাড়ছে তো বাড়ছেই। অন্যদিকে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণও কমছে। অসম প্রতিদ্বন্দিতায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। তাদের সাহায্য ও উৎসাহ দেবার প্রশ্ন তো আছেই। চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ মাননীয় বিচারপতি বোম্বাইয়ের শ্রীরানাডে এই সমস্যাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে শিক্ষিত সমাজকে বেশী সংখ্যায় চাকরী দিতে হবে। অন্যান্য উচ্চপদে যেমন শিক্ষা ও চিকিৎসা, পুলিস ও ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক ও তার বিভাগে তাদের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে। এসব বিধিব্যবস্থা নিলেই আসবে ব্যয়সঙ্কোচের সুযোগ।"

রমেশ দত্ত তাঁর ভাষণে বিভিন্ন প্রদেশে জমির খাজনা নির্ধারণের সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন। ন্যায্য পদ্ধতিতে খাজনা নির্ধারণ চাই। এ ব্যাপারে স্থিতিশীল নীতির প্রয়োজন। কারণ "কৃষককে যদি ঋণের বোঝা, দারিদ্র্য, দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচতে হয়, তাহলে জমির আয় সম্পর্কে তাকে সুনিশ্চিত করতে হবে।" গ্রামীণ ইউনিয়ন, জেলা পর্ষদ মিউনিসিপ্যালিটি এবং প্রাদেশিক বিধান পরিষদগুলিকে আরও বহুমুখী ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। এটা যদি করা যায় তবে প্রশাসনিক বিভাগে আরও বেশী সংখ্যায় ভারতীয়রা অংশ নিতে পারবেন। ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদ সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এমন কয়েকজন ভারতীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এতে চাই, যাঁদের বক্তব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয় জনসাধারণের ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতি"। তিনি স্বীকার করেন, "কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য সংখ্যা খুব বেশী বাড়ানো সম্ভব নয়, কারণ এতে এর কর্মদক্ষতা হ্রাস পাবে। তবে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে তিনজন ভারতীয়কে নেবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, একজন বাংলা ও আসামের প্রতিনিধি, দ্বিতীয় জন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাবের এবং তৃতীয় জন বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্য প্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে।" এই প্রস্তাবের সার্থকতা যে কতটা তা বলাই বাহুল্য। একটা একনায়ক শাসনযন্ত্র, সংস্কারের এরকম বাস্তবানুগ মধ্যপন্থা বাৎলে দেওয়া সত্ত্বেও তাকে উপেক্ষা করে কিভাবে ও কত সমস্যার সৃষ্টি করে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

যদিও রমেশ দত্তের প্রস্তাবে আপোষপন্থীর মনোভাব ব্যক্ত, তবুও প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলির প্রতি তাঁর গভীর আস্থা অনস্বীকার্য। "যে শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের হাত নেই অথচ জনসাধারণের জন্যই যার এত পরীক্ষানিরীক্ষা, গত শতাব্দীতে য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই সেরকম ব্যাপার ঘটতে আমরা দেখেছি। জনগণের প্রতিনিধিত্ববর্জিত এই শাসন ব্যবস্থা এমন সব দেশে চালু হতে আমরা দেখেছি যাদের শুভ অভিপ্রায় সম্বন্ধে মনে কোন প্রশ্নই ওঠেনা। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে এই একনায়কদের নাম অক্ষয় হয়ে আছে কারণ এঁরা ছিলেন উদার। তবু এ পরীক্ষা সফল হয়নি। প্রকৃতির একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম যে, তুমি যদি মানুষের দু'টো হাত বেঁধে রাখতে চাও তবে কখনই তাদের স্থায়ী কল্যাণ করতে পারবে না। য়ুরোপের প্রত্যেকটি দেশ আজ এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে। ইংলণ্ড স্বীকার করেছে সর্বাগ্রে। ইংরেজ শাসিত প্রত্যেক উপনিবেশ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পেয়েছে। আজকে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় সমর্থক।"

ভাষণের উপসংহারে রমেশ চন্দ্রের কণ্ঠে আশা ও বিশ্বাসের বাণী ধ্বনিত হয়েছে :

"ভদ্রমহোদয়গণ, উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে যদি জনগণের হাতে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয় তবে দুর্ভিক্ষের ও মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচা সম্ভব হবে। সমৃদ্ধি ও শান্তি ফিরে আসবে। দেশের উৎসাহী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাওয়া সহজ হবে। এই সুবিধা না দিয়ে, জনগণের নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে এ অধিকারের স্বীকৃতি না দিলে দুর্দশা ও অসন্তোষ, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের আবর্ত থেকে ভারতকে কখনই মুক্ত করা যাবে না। সুতরাং ভারত সরকারের একজন পুরোনো ও বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে আমার মনে হয়েছে একটা ন্যায্য

পথ অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে আমি আমার বিশ্বাসের কথা বলি। আমার মনে হয়েছে একমাত্র এই পথেই এ-দেশকে দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয় থেকে বাঁচানো সম্ভব। ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুসংহত করার পথ একমাত্র এটাই।”

সরকারী চাকরীতে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অধ্যায় যিনি কাটিয়েছেন, সেই রমেশ দত্তের জোরাল যুক্তি ও মধ্যপন্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সমালোচকরাও তাঁর এই অভিভাষণের জন্য শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। তখনকার দিনে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রগুলির মধ্যে কলকাতার 'ইংলিসম্যান' বিশিষ্ট মর্যাদা পেয়েছিলো। তাতে মন্তব্য করা হয়েছে :

“মিঃ রমেশ দত্তের কাছ থেকে জনসাধারণ ভাল কিছু প্রত্যাশা করে। কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তিনি লক্ষ্ণৌতে যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে কেউ নিরাশ হননি।…এই দুর্ভিক্ষের দিনে, মিঃ দত্তের মত অভিজ্ঞ প্রশাসকের মুখে ভারতের পল্লী অঞ্চলের একটা বৃহদাংশের জনগণের ভীষণ দারিদ্র্য ও ঋণের বোঝা সম্বন্ধে আমরা যে কথা শুনতে পেলাম তার প্রতি নজর দেওয়া উচিত।”

১৯০০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'য় একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল :

“ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্তের কণ্ঠে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে—তারজন্য আমরা প্রশংসা না করে পারছি না। এতে যে আশা আকাঙ্খা মূর্ত হয়ে উঠেছে তার ভাষা সংযত, দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যপন্থীর। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বন্ধুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক সমালোচনা করবার আন্তরিক অভিপ্রায় এই ভাষণে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।”

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা রমেশ দত্তের জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে তিনি একজন

অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর আগে প্রখ্যাত ব্যক্তিরা কংগ্রেস সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন কিন্তু কংগ্রেস এ পর্যন্ত সরকারী সমর্থন পায়নি, সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সেই সময় মন্তব্য করেছিলেন, "দশজন সরকারী পদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ন'জন কংগ্রেসকে রাজদ্রোহের আখড়া হিসাবে গণ্য করবে এমন দিন আসতে আর বেশী দেরী নেই।" কিন্তু রমেশ দত্তের মত একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞ প্রশাসক ও সাহিত্যিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন এবং কংগ্রেসের ভূমিকা সমর্থন করে লোকেদের আশা-আকাঙ্খাকে যে ভাবে তুলে ধরেছেন তার ফলে কংগ্রেসের সমালোচকরা তাদের মতামত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো। বিশ্বাসঘাতক আন্দোলনকারীদের একটা আলোচনা চক্র হিসাবে কংগ্রেসকে আর উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হলো না। কংগ্রেস যে অভিমত ও আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত করে তাকে আর উগ্রপন্থীদের দায়িত্বহীন মন্তব্য বলে গণ্য করা গেল না। একজন পণ্ডিত ও সুদক্ষ প্রশাসক—যাঁর আনুগত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না তিনি যখন কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে কংগ্রেস জনগণের মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছে।

কংগ্রেসের জনস্বার্থকে এমন সক্রিয় ভাবে সমর্থন করার জন্য ভারতীয় বিদগ্ধ মহল স্বাভাবিক কারণেই রমেশ দত্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কলকাতায় নাগরিকদের পক্ষ থেকে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় শ্রীডব্লিউ সি ব্যানার্জি ভাষণ দেন। জাতীয় আন্দোলনের স্বনামধন্য নেতা ও বাগ্মী শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন :

"মিঃ দত্ত সরকারের সেবা করেছেন, কিন্তু এখন যে সেবাধর্মে তিনি দীক্ষা নিয়েছেন তা অনেক বেশী মহৎ। যে উল্লেখযোগ্য কাজ তিনি আগে করেছেন তার তুলনায় এখনকার কাজ অনেক বেশী অনন্য। কারণ, এ হল দেশের কাজ এ সেবা জনগণের সেবা। সরকার মিঃ দত্তকে সম্মানিত পদমর্যাদা দিয়েছেন।

কিন্তু নিজের দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা লাভের চেয়ে বড় সম্মান আর কি হতে পারে? যাদের জীবনের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করা হয়, তাদের ভালবাসা, তাদের কৃতজ্ঞতা এবং তাদের প্রশংসা পাবার চেয়ে পদবী বা সম্মান-জনক উপাধি লাভ করার মূল্য আর কতটুকু, ক্ষমতা বা শাসন কতটুকু কাম্য, নামের মোহ কত আর শ্রেয়? ঈশ্বরের প্রিয়পাত্ররাই পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন। আর আপনি তাদেরই দলে। আপনার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

নবম পরিচ্ছেদ

হু'টি প্রসিদ্ধ বই

১৯০০ সালের ১৫ই মার্চ রমেশ দত্ত আবার য়ুরোপ যাত্রা করেন। য়ুরোপে যাবার পথে বোম্বাইতে এক বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। পৌরোহিত্য করেন স্যার ফিরোজশাহ মেহতা। সম্বর্ধনার উত্তরে রমেশ দত্ত বলেন, "আগামীকাল ঠিক এই সময়ে আমি জাহাজে করে য়ুরোপের পথে রওনা হবো। কিন্তু যেখানেই থাকি, আপনাদের আশা-আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্য হবে আমারই উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্খা। আপনাদের প্রচেষ্টা হবে আমার প্রচেষ্টা। আমাদের সবার এই মাতৃভূমির জন্য এক যোগ্য প্রশাসন ব্যবস্থা, এর সমৃদ্ধির জন্য এক অভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্য মনে রেখে আমরা কাজ করে যাব।"

এপ্রিল মাসের ১লা তারিখে তিনি লণ্ডনে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে কর্মস্রোতে ডুবে যান। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণ সম্পর্কে ইংলণ্ডের শাসন মহলে খুবই আগ্রহ দেখা যায়। এপ্রিল মাসের ৩রা তারিখে রমেশ দত্ত যখন লণ্ডনে পৌঁছান, স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ উত্থাপিত একটি প্রস্তাব নিয়ে কমন্স সভায় বিতর্ক শুরু হয়। মিঃ ওয়েডারবার্ণের প্রস্তাব ছিল, "দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে কৃষকদের ক্ষমতা এতটা হ্রাস পাবার কারণ কি, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হোক এবং ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ এড়াবার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁরা সুপারিশ করুন।" রমেশ দত্ত যে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁর অভিমত দিয়েছেন তা কতটা নির্ভরযোগ্য সে প্রশ্ন তুলে তদানীন্তন ভারত সরকারের সেক্রেটারী অফ ষ্টেট লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন্ সরকারের পক্ষকে সমর্থন করেন। তিনি অবশ্য বলেন মিঃ দত্তের মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি "ভারতের কয়েকটি স্থানে ভূমির খাজনা খুব বেশী তা প্রমাণ করতে তথ্যসম্বলিত একটা বিবৃতি

দিয়েছেন। তাই তাঁর বক্তব্যকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এই তথ্য ও বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন।” বাংলাদেশের এমন অনেক জমিদার আছেন যাঁরা সরকারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছেন। তাঁরা তাঁদের পাওনা আদায় করতে কৃষকদের ওপর অনেক বেশী অত্যাচার করেন। কিন্তু রায়তদের প্রতি ব্যবহারে সরকার সে রকম মনোভাব দেখান না—এটা প্রমাণ করতে তিনি শ্রীদত্তের যুক্তির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। রমেশ দত্ত বলেছেন, বাংলা দেশে জমির থেকে আয়ের পরিমাণ খুব কম এবং উৎপাদনের ছয় ভাগের এক ভাগ অথবা শতকরা ১৬ ভাগের বেশী নয়। সেক্রেটারী অফ স্টেট-এর মতে “বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের খাজনা বিলি শতকরা ৫১ ভাগেরও বেশী এবং অনেক সময় শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগও বৃদ্ধি পায়।”

তথ্যের ভুল সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, রমেশ দত্ত একটি চিঠি 'টাইমসে' এবং অন্য একটি চিঠি 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে' প্রকাশ করে তার উত্তর দেন। বাংলাদেশে রাজস্ব অফিসার হিসাবে বহুদিন কাজ করে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেন শুধুমাত্র তার ভিত্তিতেই তিনি যে তাঁর তথ্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন তাই নয়, বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের তথ্যকেও সমান মূল্য দিয়েছিলেন। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁর লেখা 'বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের হিসাব' গ্রন্থে এই সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেন। এই বিতর্ক সম্পর্কে 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান'-এ নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয়:

“ভারত-বিষয় সংক্রান্ত একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের অভিমতের ওপর ভিত্তি করে যে ভারতীয় পদস্থ কর্মচারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর প্রামাণিক সাক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে তার সঙ্গে লর্ড জর্জ হ্যামিল্টনের বিনা দ্বিধায় ঘোষিত নীতির কোন সামঞ্জস্য নেই, কারণ এতে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের কোথাও জমির খাজনা মোট উৎপাদনের আয়ের ছয় ভাগের এক ভাগের কম নয়। মিঃ দত্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে।

মি: দত্তের এই উক্তিকে অস্বীকার করা অতটা সহজ হবে না বলেই মনে হয়। মিঃ দত্ত যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, লর্ড জর্জ হ্যামিল্টন সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন—এটাই আমরা আশা করবো—এবং বাংলাদেশের জেলা অফিসারের মাধ্যমে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য তিনি আদেশ দেবেন বলেই বিশ্বাস।"

রমেশ দত্তের কংগ্রেস ভাষণ নিয়ে ইংলণ্ডে এতটা মতবিরোধ দেখা দেবে এবং বিষয়টিকে আবার বিবেচনা করে দেখার সুযোগ করে দেবে—এটা দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। তিনি ভাইকে লিখলেন :

"জমির অত্যধিক খাজনা ধার্য করা সম্পর্কে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ শুনে ইংলণ্ডের ও ভারতের সরকারী মহল বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আমার কানে এসেছে এখানকার ভারতীয় অফিস বেশ বিব্রত হয়েছে এবং তথ্য, দলিল ও পরিসংখ্যান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছেন। আমি এদের বিশ্রাম দেবো না। আমার অভিযোগ পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করবো।"

খ

১৯০০ সালের জুলাই মাসে রমেশ দত্ত "ভারতে ছুর্ভিক্ষ" নামে বইটি প্রকাশ করেন। ১৭৭০ সাল থেকে নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ছুর্ভিক্ষের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে বইটি আরম্ভ। মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ এবং উত্তর ভারতের জমির পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে তিনি লর্ড কার্জনকে যে পাঁচটি "খোলা চিঠি" লিখেছিলেন, বইটিতে সেগুলিও প্রকাশ করা হয়।

ভূমিকায় তিনি এই সব সুপারিশের সারাংশ দিয়েছেন :

"এই বইয়ে যেসব সুপারিশ করেছি আমি মনে করি সেগুলি বাস্তবানুগ ও গ্রহণযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যেসব ভূমি ব্যবস্থা চালু রয়েছে—এইসব সুপারিশ গ্রহণ করলে সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন

হবেনা। স্থবিধার জন্য আমি সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই।

"(১) যেখানে রাজ্য সরকার জমিদারদের মারফৎ খাজনা পান এবং খাজনার পরিমাণ যেখানে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়নি—সেখানে আমরা সুপারিশ করছি যে 'সাহারাণপুর নিয়মকানুন' অনুসারে মোট খাজনার অর্ধেক রাজ্য সরকারকে দেওয়ার রীতি সর্বত্র চালু করা হোক।

"(২) যেখানে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায় করেন—সেখানে আমরা বলতে চাই যে, জমির খাজনা ভূমিতে উৎপাদিত শস্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগের অতিরিক্ত কোন মতেই হওয়া উচিত নয়। চাষ-আবাদের পক্ষে উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত জমি সমেত একটি জেলার গড়পড়তা খাজনার হিসাব মোট উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশের যেন বেশী না হয়। উত্তর ভারতের খাজনার এটাই হচ্ছে সাধারণ হিসাব।

"(৩) যেখানে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ভূমির খাজনা পান সেখানে দাম বাড়াবার কারণ ছাড়া অন্য কোন সময় খাজনার পরিমাণ বাড়ানো চলবে না বলে লর্ড রিপন যে নিয়ম চালু করেছেন—আমরা বলতে চাই যে সে নিয়ম সর্বত্র চালু হোক।

"(৪) যেখানে ভূমির খাজনা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়নি, সেখানে ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর খাজনা নির্দিষ্ট করতে আমরা সুপারিশ করছি কারণ সেটাই উত্তর ভারত ও বোম্বাই-এর নিয়ম।

"(৫) ভূমির উন্নতি ছাড়া অন্য কোন কারণে খাজনা বাদে ভূমির ওপর অন্য কোন কর বসানো উচিত হবে না। ভারতের কোন প্রদেশে মোট করের পরিমাণ শতকরা সওয়া ৬ ভাগের (অর্থাৎ টাকায় এক আনা) বেশী হবে না।

"(৬) নিরাপত্তামূলক রেল লাইন বসাবার কাজ যখন শেষ হয়েছে, আমরা চাই যে সেচ ব্যবস্থার জন্য দুর্ভিক্ষ বীমা মঞ্জুরী ব্যবস্থার থেকে বছরে ১ কোটি

টাকার মত খরচ করা হোক, ১৮৯৮ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এইসব সেচ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ হাতে নেওয়া হোক। তবে এই বিনিয়োগ থেকে 'কোন রকম লাভের আশা না করেই' এটা করতে হবে। কৃষকদের ইচ্ছামত এই জল ব্যবহার করার অধিকার থাকবে এবং জল ব্যবহার করলে তারা তার জন্য খরচও দেবে।

"(৭) এবং সর্বশেষে আমরা অনুরোধ করছি যে, জমির খাজনার হিসাব কষতে গিয়ে যদি কোন সময় কৃষকদের সঙ্গে খাজনা-নির্ধারণ সংক্রান্ত অফিসারদের মতপার্থক্য দেখা দেয়—তাহলে জমির খাজনা নির্ধারণের সঙ্গে সংযোগ নেই এমন কোন নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের কাছে আপিল করার অধিকার কৃষকদের দেওয়া হোক।"

প্রস্তাবগুলি মোটেই কাল্পনিক নয়, এতে চরমপন্থার নির্দেশ নেই। এগুলি মধ্যপন্থী যুক্তিসম্মত প্রস্তাব। তাছাড়া কৃষকদের ওপর থেকে গুরুভার নামিয়ে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে তাদের লড়াই করার মত শক্তি যোগানোর উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এই প্রস্তাব করা হয়েছে। রমেশ দত্ত তাঁর বই-এ লিখেছেন, "কোনরকম পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী না নিয়ে সম্প্রতি ভারতে দুর্ভিক্ষ হবার সঠিক কারণগুলি নিয়ে যদি আমরা আন্তরিকভাবে বিচার করি তাহলে কারণগুলি খুঁজে বার করা অসম্ভব হবে না। প্রায় প্রত্যেকবারই দুর্ভিক্ষের আশু কারণ হল অনাবৃষ্টি। যদি আমরা একটা ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারি—যা এ পর্যন্ত আমরা পারিনি—তাহলে দুর্ভিক্ষ বার বার আসবে। তবে সাম্প্রতিককালে দুর্ভিক্ষ এত ঘন ঘন দেখা দিচ্ছে কেন এবং তার রূপ এত ভয়াবহ আকার ধারণ করছে কেন—তা বিচার করলে দেখতে পাব এরজন্য দায়ী কৃষকদের বিত্তহীন অবস্থা এবং নিদারুণ দারিদ্র্য।" দুর্ভিক্ষ কৃষকদের এই দারিদ্র্যের জন্যই বার বার দেখা দেয় এবং সরকার জমির থেকে অত্যধিক হারে খাজনা আদায় করছে বলেই এই দারিদ্র্য আরও বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে—রমেশ দত্তের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল

হয়েছিল বলেই তিনি জমির খাজনা আদায়ের সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলেছিলেন। সচ্ছলাবস্থায় কৃষকরা যদি টাকা পয়সা জমাতে না পারে—তাহলে যে বছর ভাল ফসল হবে না—তখন তারা কি দিয়ে তাদের বছরের খোরাক মেটাবে? আর এটা যদি না করা যায় তাহলে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের মত মর্মন্তুদ অবস্থার পরিবর্তনের উপায়ই বা কি? তবুও এই ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে সরকার অন্ধ হয়েই রইলেন। আরো দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, জমির খাজনার হার যে বেশী, সরকারী মহল তা শুধু অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হলেন না, এ বোঝা যে খুব বেশী নয় সেটা প্রমাণ করতে যত সব আজগুবি যুক্তিতর্ক পেশ করলেন। রমেশ দত্ত লক্ষ লক্ষ কৃষকদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে এত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন যে, এইসব যুক্তিতর্কে তাঁর মন ভেজবার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি এতে ক্ষুব্ধ হলেন। মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতি এত নির্বিকার থেকে সমর্থনের অযোগ্য বিধিব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে যেসব যুক্তি দেখান হচ্ছিল—রমেশ দত্ত তাতে বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তি চাপা রইল না। খাজনা ও করের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তার মাপকাঠিতে এরকম একটা যুক্তি খাড়া করা হলো। ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীদের মতে খাজনা হল ভূমির উদ্‌বৃত্ত যা ভূমি কর থেকে পৃথক বলে গণ্য হওয়া উচিত। ভূমি থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর উপর যে লেভি তাই হল ভূমি কর। সুতরাং এই যুক্তি দেওয়া হলো যে ভূমিরাজস্ব হলো খাজনা, নিশ্চয়ই কর নয়। রমেশ দত্ত এ অভিমত মানতে পারলেন না। তিনি বললেন, এটা ভূমি কর ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাঁর 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে তিনি এই অভিমতের উল্লেখ করে বলেছেন, ভারতে ভূমি কর সম্বন্ধে ভুল ধারণা রয়েছে। তিনি বলেছেন, "ভারতের এই দরিদ্র কৃষকদের কথা যদি তোলা হয় তাহলে এই বিতর্ককে অনেকটা কথার ম্যারপ্যাঁচ বলে মনে হবে, এটাকে মনে হবে বৃথা বাক্‌চাতুরী। ভারতে জনগণের শতকরা পাঁচভাগের চার ভাগ লোকের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে জমিতে উৎপাদিত শস্যের ওপর নির্ভরশীল। সরকার তাদের কাছ থেকে যদি উৎপন্ন শস্যের একটা বড় অংশ আদায় করে তাদের দারিদ্র্যের পথে ঠেলে দেন—আর সুযোগ্য কয়েকজন অর্থনীতিবিদ যদি এটাকে কর না বলে খাজনা বলেন, তাহলে সে কথা শুনে এই দুর্ভাগ্য লোকগুলি কি খুব স্বস্তি অনুভব করবে? রাজ্যের চাহিদা মেটাতে পারে না বলে মাদ্রাজে প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষককে তাদের ঘরবাড়ি ও জমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। মাননীয় ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা যদি এই একই চাহিদাকে একটা নামের বদলে অন্য নামে ডাকতে চান তাহলে সেটুকু জেনে তারা কি সত্যিই সন্তুষ্ট হতে পারবে? ফসল কাটার দু'মাসের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের সরকারী চাহিদা মেটাতেই হবে। রাজনীতিতে বিশ্বাসী য়ুরোপের কয়েকজন অর্থনীতিবিদ যদি এই প্রচণ্ড চাহিদাকে একটা গালভরা নামে অভিহিত করেন, তাহলে সেটুকু জেনেই কি এরা খুব একটা সান্ত্বনা পাবে? গত কয়েক বছর যাবৎ ৬ লক্ষ অভুক্ত নারী-পুরুষ ও শিশু রাষ্ট্রের দাবীদাওয়া মিটিয়ে ভবিষ্যতের জন্য কানাকড়িও বাঁচাতে পারছে না। আর এই বছর খরা দেখা দিয়েছে, শস্য ফলানো যায়নি, এরা এখন ত্রাণ শিবিরে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে। এখন এইসব সুদক্ষ ও কথায় সুপটু তর্কবাগীশরা প্রমাণ করতে তৈরী হয়ে যাবেন যে এই চাহিদা আর যাই হোক কর নয়। কিন্তু এই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষরা কি এঁদের করুণায় বিগলিত হয়ে যাবে?"

গ

'ভারতে দুর্ভিক্ষ' বইটি সম্পর্কে ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মোটামুটি সপ্রশংস মন্তব্য করেন। যেমন 'দি টাইমস' রমেশ দত্তের অভিমত না মানলেও লিখেছিলেন: "এটা এমন একটা বিষয় যা বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বিচার করা মুস্কিল······একটা ন্যায্য পরিসরের মধ্যে খুঁটিনাটি এবং কারিগরি বিষয়ের গভীরে না গিয়ে এটার প্রধান বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বলা খুবই দরকার।

ভারত সরকারের কাছ থেকে মিঃ দত্ত যদি খুব সংক্ষিপ্ত ও সবার মনঃপূত উত্তর জোগাড় করতে সক্ষম হতেন তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য অনেক বেশী সফল হতো। আর তিনিও সত্যিকারের কাজের কাজ করতেন। কারণ শুধু তাঁর নিজের কাছে নয় ভারতের অন্য বন্ধুদের কাছেও এ বিষয়টা প্রিয়, যদিও এতে তাঁর নিজের মর্যাদা হয়তো কিছুটা ক্ষুণ্ণ হতো।

এই সময় 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' বইটি প্রকাশ করা ছাড়াও তিনি অন্য একটা বড় কাজও করেন। ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগ থেকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া যুগ পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার মত একটা বিরাট কাজেও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। ভারতীয় সমস্যাবলী সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করে তোলার কাজেও তিনি এই সময় খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এ দুরূহ কাজে দাদাভাই নওরোজী এবং ডব্লিউ সি ব্যানার্জীর সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেন। ভারতে দুর্ভিক্ষ হবার কারণগুলি অনুসন্ধান করতে এবং সেগুলি প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাবলী গ্রহণের জন্য তিনি লণ্ডনে একটি ভারতীয় দুর্ভিক্ষ ইউনিয়ন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই সংস্থার উদ্যোগেই ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখবার জন্য একটা স্মারকগ্রন্থ পেশ করা হয়। স্মারক গ্রন্থে যাঁরা সাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যেমন ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ, লিভারপুলের ধর্মযাজক এবং ম্যানচেষ্টারের ডীন।

'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের' (১৭৫৭-১৮৫৭) প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালের প্রথম দিকে। এই গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই রমেশ দত্তের জীবনের একটা অধ্যায় সমাপ্ত হলো। বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। এতে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের যাবতীয় কাহিনী। এই দু'টো বই এক সঙ্গে বিচার করে দেখলে অর্থনৈতিক ইতিহাস একটা

উল্লেখযোগ্য কার্তি, কারণ সরকারী রেকর্ডের পুরো দলিলই শুধু যে এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে তাই নয়—এতে রয়েছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দেড়শো বছরের ইতিহাস। অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভারতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে। এতে ডঃ ডি. আর. গ্যাডগিল তাঁর ভূমিকায় বলেছেন যে, এই বইয়ে যে সব অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে রমেশ দত্ত তার মৌলিকত্ব দাবী করতে পারেন না, ডঃ গ্যাডগিলের মতে এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শকের দাবী করতে পারেন দাদাভাই, রমেশ দত্ত নয়। তবুও ডঃ গ্যাডগিল বলেন, রমেশ দত্তের গ্রন্থটি "ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার বিষয় সংক্রান্ত প্রথম ইতিহাস। এক সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। অনেক পরে যাকে আমরা ঔপনিবেশিকতার অর্থনীতি বলে বুঝলাম, তার একটা মৌলিক পর্যালোচনা এই বইটিতে ছিল"।

পরবর্তী যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অর্থনৈতিক ইতিহাসের তথ্য ও অভিমতের ওপর নির্ভর করে নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন। রমেশ দত্তের কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এই দুই খণ্ড বই তিনি সরকারী তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক পরিণতির একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। ভারতের বাইরে এর সম্বন্ধে খুবই আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই বই ভারতবাসীদের মনে প্রথম নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে একটা সচেতনতা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রথম জীবন-যাত্রার মান উন্নততর করার একটা প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা গেল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি সম্বন্ধে যেসব ছাত্র আগ্রহী ছিল—তাদের কাছে এই বইটির অসীম তাৎপর্য ছিল। ভারত ছাড়া সমস্ত পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক শাসনের এত বড় উদাহরণ আর কোথায় আছে? কারণ, এক পুরাতন ও সমৃদ্ধ সভ্যতা যখন সাময়িকভাবে ধ্বসে পড়ছে তখন তার সংস্পর্শে এলো ক্রমবর্ধমান ঔপনিবেশিক শক্তি। এই সংযোগের ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তা পৃথিবীর

অন্যান্য ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার চেয়ে এখানে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নীতির ফলে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা অবক্ষয় দ্রুত ঘনিয়ে আসে। আর তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় সাময়িকভাবে পদানত দেশের আত্মা আবার জেগে ওঠে। এই পরবর্তী কাল বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস। তখন রমেশ দত্ত আর নেই। কিন্তু এই অবক্ষয় যুগের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর ওপর। এতে সাধারণভাবে ইতিহাসের ছাত্ররাই যে নতুন আলো পেয়েছে তাই নয়, এটা তাঁর নিজের দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের পুনরুজ্জীবনের পথ করে দিয়ে গেছে। সেদিন সেই সাংস্কৃতিক জীবনে এসেছিল এক অপরিসীম নৈরাশ্য ও বিভ্রান্তি।

অর্থ নৈতিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রমেশ দত্ত, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের যে অর্থনৈতিক পরিণতি, তা সংক্ষেপে এভাবে বলেছেন :

"যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে, ভূমির ওপর প্রচণ্ড ও অনিশ্চিত হারে কর ধার্যের ফলে যেখানে কৃষি ব্যবস্থা বিপন্ন, এমন একটা আর্থিক ব্যবস্থা যেখানে দেশের অর্ধেক রাজস্ব প্রতি বছর দেশের বাইরে পাঠাতে হয়—পৃথিবীর যে কোন সমৃদ্ধ দেশকে সেই অবস্থায় রাখুন, দেখবেন সেখানে দুর্ভিক্ষের করালছায়া দ্রুত নেমে এসেছে। সহায় সম্পদ বাড়াবার পথ ব্যাপকতর করা হলে একটি দেশ সমৃদ্ধ হয়। যখন কর বাবদ আয়ের অংশ সে দেশের লোকেদের কল্যাণের জন্যই খরচ করা হয় তখন সে দেশ হয় সমৃদ্ধ। কিন্তু যদি কোন দেশের সহায় সম্পত্তি বাড়াবার পথ সঙ্কীর্ণতর হতে থাকে, যদি কর বাবদ আয়ের বেশীর ভাগ অংশ বাইরে পাঠিয়ে দিতে হয় তবে দিন দিন সে দেশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠতে বাধ্য। এটা খুব সরল ও সহজবোধ্য অর্থনীতি যা সব দেশের মত ভারতেও প্রযোজ্য। ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকদের এটা ভেবে দেখা উচিত যে, যতদিন না ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজীবিত করা সম্ভব হচ্ছে, যতদিন না ভারতের ভূমিকরের একটা ন্যায্য

সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, যতদিন না ভারতের রাজস্ব এ দেশেই বেশীর ভাগ ব্যয় করা হচ্ছে ততদিন ভারতের দারিদ্র্য ঘোচান কখনই সম্ভব হবে না।"

রমেশ দত্ত তাঁর ভূমিকার আর একটি স্থানে, ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ভারতীয় প্রশাসনের মূলগত পার্থক্যের ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও প্রশাসনিক বিভাগের দূরদর্শিতার অভাব খুবই সুস্পষ্ট। এটার আংশিক উদ্ধৃতি করলে মন্দ হবে না :

"ভারতের কবি বলেছেন, রাজা যখন কর বসান—তা যেন অনেকটা পৃথিবীর বুকের আর্দ্রতার মত, সূর্য তাকে শুষে নেয়, কিন্তু তা আবার ফিরে আসে বৃষ্টি হয়ে, মাটিকে করে উর্বরা শস্য শ্যামলা। কিন্তু এখন ভারতের মাটি থেকে যে আর্দ্রতা শুষে নেওয়া হয় তা আর ভারতের বুকে বৃষ্টি হয়ে নামে না, তা অন্য দেশের মাটিকে উর্বর করে। প্রত্যেক দেশ ন্যায্যতই আশা করে যে তার দেশের কর বাবদ আয়ের অংশ সে দেশেই বেশীর ভাগ ব্যয় করা হবে। সুদূর অতীতে যখন এক অপকৃষ্ট ধরনের সরকারী ব্যবস্থা চালু ছিল তখন কিন্তু তাই হতো। আফগান ও মুঘল সম্রাটরা তাঁদের সামরিক বাহিনীকে পুষতে প্রচুর টাকা খরচ করতেন। এরাই রক্ষা করতো বিরাট ও রাজকীয় সব প্রাসাদ। এই অর্থ দিয়ে হাজার হাজার সৈন্য ও তাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করা হতো। তাঁরা যেসব জাঁকজমক রাজপ্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতেন, যে বিলাসের জগতে তাঁরা থাকতেন, যেরকম ছিল ঠাটঠমক তা অন্যভাবে ভারতের চারুশিল্পী, ও অন্যান্য শিল্পীদের উৎসাহ দিতো, তাদের অন্নের সংস্থান করতো। খেতাবধারী, সশস্ত্রবাহিনীর সেনাপতি, সুবেদার, দেওয়ান ও কাজি এবং প্রত্যেক প্রদেশ ও প্রত্যেক জেলার অধস্তন বহু অফিসার এই দরবারের আদর্শ মেনে চলতো। মন্দির, মসজিদ, রাস্তাঘাট, খালবিল, এমনকি বাঁধগুলি পর্যন্ত তাঁদের উদার মনের স্মৃতি বা গর্বের, আত্মদম্ভের নিদর্শন হয়ে থাকতো। বিচক্ষণ শাসক হোক অথবা নির্বোধ রাজা—করের উপার্জন জনসাধারণের

কল্যাণেই ব্যয় করা হতো এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটতো।”

'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের' মত বই ব্রিটিশ সংবাদ পত্রে সমালোচনার বস্তু হতে বাধ্য। কারণ তদানীন্তন প্রশাসকগণ এটাই বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতের পক্ষে অবিমিশ্র আশীর্বাদ। তাঁরা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে নিজেদেরই বাহবা দিতেন। রমেশ চন্দ্রের এই বইটি সেই বিশ্বাসের মূলে গিয়ে আঘাত করলো। সুতরাং এই বইয়ের সমালোচনা তো স্বাভাবিক। তবুও কয়েকটি ব্রিটিশ সংবাদপত্রের লেখককে অভিনন্দন জানানো হয়। ব্রিটিশ সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের এটা কম বড় নিদর্শন নয়। 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' বলেছে, “মিঃ দত্ত কোম্পানীর বৈষয়িক নীতি সম্পর্কে সহজবোধ্য একটা ইতিহাস রচনা করেছেন। এর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা যায় কিনা সন্দেহ।……ভারতের অসংখ্য জনসাধারণের জীবন ধারণের উপযোগী রসদ মেটাতে আমরা যদি ব্যর্থ হয়ে থাকি—ব্যর্থ আমরা নিশ্চয় হয়েছি—তবে তার কারণ একটি ব্যবসায়িক কোম্পানীর অশুভ নীতির ওপরেই আমাদের বুনিয়াদ তৈরী করেছি—যে কোম্পানীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সে দেশে বাণিজ্য বাড়িয়ে ও কর আদায় করে শেয়ার হোল্ডারদের মুনাফা বাড়ানো।”

অন্যদিকে 'দি টাইমস' বিরূপ মন্তব্য করেছিল, “মিঃ রমেশ দত্তের লেখা বই পড়ে নেটিভদের যে চরিত্র ফুটে ওঠে—তা সত্য হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কোনদিনই প্রয়োজন হতো না এবং নেটিভরাও এ সাম্রাজ্য কোনদিন গড়তে দিত না।” রমেশ দত্তের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে তার ওপর প্রশংসার পলেস্তরা লাগিয়ে সংবাদপত্রটি বলেছিল, “যে সাহিত্যিক দক্ষতা ও গবেষণার দৃষ্টি নিয়ে মিঃ দত্ত তাঁর উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছেন, তাতে প্রমাণ হয় তিনি যদি এক মুহূর্তের জন্য রাজনীতি ভুলতে পারতেন তবে বোঝা যেত ইতিহাস লিখবার ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু যে বইটা আমাদের হাতে তুলে দেওয়া

হলো সেটা ইতিহাস নয়, এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের সুবিধার জন্য কতকগুলি ঐতিহাসিক বাকচাতুর্য এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।"

ঘ

'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের' প্রথম খণ্ড ছাপার পরে রমেশ দত্ত স্বদেশে ফিরে আসার সুযোগ পেলেন। ১৯০২ সালের ৯ই জানুয়ারী তিনি জাহাজে করে ইংলণ্ড থেকে রওনা হন। মাদ্রাজে এসে পৌঁছলেন ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে। একই জাহাজে তাঁর সহযাত্রিণী ছিলেন স্বনামধন্যা সিস্টার নিবেদিতা (মিস্ মারগারেট নোবল), স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। মাদ্রাজে ছু'জনকে একসঙ্গে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে এক সভার আয়োজন করা হয়। রমেশ দত্ত এই মহিলার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। তিনি বলেন, "এমন একজন মহিলাকে আপনারা আজ আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন যিনি আমাদের মধ্যে থেকে আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন। আমাদের জীবনই তাঁর জীবন, আমাদের সুখ-দুঃখ, আমাদের সংগ্রাম ও দুর্ভোগে আমাদের আপন মানুষ এবং যিনি মাতৃভূমির স্বার্থে আমাদেরই মত স্বার্থত্যাগী। এমন একজন মহিলাকে আপনারা সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন দেখে আমার আনন্দের সীমা নেই।"

স্বদেশে ফিরে এসে রমেশ চন্দ্রের বিশ্রাম ছিলনা। ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে লর্ড কার্জনের ভূমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিখ্যাত সরকারী প্রস্তাবটি প্রকাশ করা হয়। এই প্রস্তাবে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। রমেশ দত্ত এই ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে লর্ড কার্জনকে একটি খোলা চিঠি লেখেন। এই প্রস্তাবটিতে রমেশ চন্দ্রের অভিমত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অভিমতকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেখানে প্রধান প্রধান বিষয়ে স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে সেখানে সরকার অনমনীয়। প্রথমেই বলা যায়, প্রস্তাবটি রমেশ দত্তের অভিমতের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষকদের অবস্থার খুবই উন্নতি

হয়েছে সে অভিমতকেও এতে অস্বীকার করা হয়েছে। এই প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে যে, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি পেয়েছে—এই মত পোষণ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে ভারত সরকার মনে করেন না।" এই ব্যাপারে রমেশ দত্তের অভিমতকে তাচ্ছিল্য করতে চেয়ে প্রস্তাবটি তাঁর প্রতি খুবই অবিচার করেছে। এতে আরো বলা হয়েছে রায়তদের কাছ থেকে জমিদারদের দাবি-দাওয়ার সীমা কতটা হতে পারে সে সম্বন্ধে মিঃ দত্ত ও অন্যান্য স্মারকলিপি রচয়িতা তাঁদের সুপারিশে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি। রায়তদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে এর প্রতিকার প্রয়োজন এটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হয় যারা ভারত সরকারকে রাজস্ব হিসাবে টাকা পয়সা দিয়ে থাকে তাদের চেয়ে, যে রায়তরা খাজনা হিসাবে দেশীয় জমিদারদের কর দেয়, তাদের স্বার্থ রক্ষাও কম জরুরী নয়।

সমালোচনার প্রথম অংশটির উত্তর দিয়ে রমেশ দত্ত বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যই বাংলাদেশকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করেছে একথা তিনি কখনো বলেন নি। তিনি শুধু একথা বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের অপেক্ষাকৃত ভাগ্যহানদের তুলনায় বাংলাদেশের রায়তদের দুর্ভিক্ষ জুঝবার ক্ষমতা বেশী। তর্কের দ্বিতীয় বিষয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যই বাংলাদেশের কৃষকদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল এটা কখনও তিনি বলেন নি। প্রজাসত্ব আইনের সুফল সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের ওপর থেকে বোঝা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি বেশী জোর দেননি বলে যে সমালোচনা করা হয়েছে—তাতে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে, কারণ সরকারী প্রস্তাব ছাপাবার অনেক আগে তিনি 'পাওনিয়ারে' লিখেছিলেন :

"জমিদার অথবা তালুকদার বা মালগুজার অথবা ভূমির মালিক শ্রেণীর সম্পর্কে আমার মতামত পোষণ করার মত কিছু নেই। সারাটা চাকরী জীবনে

আমার যা মত ছিল, এখনও তাই আছে। আমি মনে করি জমিতে যারা সত্যিকারের চাষ করে তাদের কাছ থেকে অনেক কম খাজনা আদায় করা উচিত। কৃষকরা হল ভারতের প্রাণকেন্দ্র। তারা যদি সমৃদ্ধ হয়, তাদের গাঁটে যদি পয়সাকড়ি থাকে তাহলে দুর্ভিক্ষ এত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে না—যা আজকাল করে থাকে।"

যে হারে খাজনা আদায় করা হয় সেটাই ছিল রমেশ দত্তের প্রধান বক্তব্য। এই খাজনার হার সত্যিই খুব বেশী ছিল। প্রস্তাবে বলা হয় যে, "ভূসম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগের ক্ষেত্রে যে মান নির্দিষ্ট হয়ে আছে তা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এর কখনো হেরফের করা হয় সেটা উদ্বৃত্তের কারণে নয়, ঘাটতির কারণে।" ভূমি থেকে মোট উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের বেশী রাজস্ব হিসাবে আদায় করা উচিত নয় বলে রমেশ চন্দ্রের যে বক্তব্য ছিল প্রস্তাবে সে বিষয়ের উল্লেখ করা হয় এবং রমেশ দত্তের অভিমতকে অনেকটা বিকৃত করে বলা হয় যে, "যেসব অঞ্চলে কৃষকদের কাছ থেকে সরকার সরাসরি খাজনা আদায় করেন সেখানে মোট উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে সেটা জনগণের উপর আরো বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।" রমেশ দত্তের জবাব তৈরী। তিনি বললেন, মোট উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ সর্বাধিক মাত্রা হিসাবে ধরা হোক এটাই ছিল তাঁর প্রস্তাব এবং এই মাত্রা কোন ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। এটা গড়পড়তা হার হবে তা তিনি চাননি।

পরিশেষে কোন ভিত্তিতে ভূমিকর বসালে সেটা যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য করা হবে সে প্রশ্নের উল্লেখ করে প্রস্তাবে বলা হয়:

"মূল্যমানের পরিসংখ্যান ছকের ভিত্তিতে যেসব বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি সেসব ছাড়া বর্ধিত আয়ের অংশ থেকে যদি সরকারকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে সেটা খুব নির্ভুল ও নিরপেক্ষ বিচার হবে না। এর অর্থ হবে এই যে সরকার বর্ধিত আয়ের সেই অংশ ছেড়ে দিচ্ছেন যা লোকেরা বিনা পরিশ্রমে

রোজকার করেছেন। দুটি কারণে এই আয় বেড়েছে, অংশতঃ বেড়েছে এই জন্য যে সরকার সমাজ কল্যাণমূলক কাজে, যেমন রেলওয়ে, খাল ইত্যাদির ওপর খরচপত্র করেছেন। বর্ধিত রসদকে কাজে লাগাবার ফলে আয় বেড়েছে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকেদের অনুপার্জিত আয় বাড়বার এটাও অন্য আংশিক কারণ।"

রমেশ দত্ত উত্তর দিলেন :

"এই সিদ্ধান্ত হতাশাব্যঞ্জক। আয় বেড়েছে কিনা মূল্যসূচী দেখলেই তা বোঝা যায়। লর্ড রিপনের আইনও যা বলে, স্মারকলিপি রচয়িতারাও সেই কথাই বলেন। তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন যে মূল্যমান বাড়লে সরকারও বেশী রাজস্ব দাবী করতে পারবেন। তাঁদের এই যুক্তি অকাট্য ছিল যে দাম না বাড়লে কিন্তু সরকারের বেশী রাজস্ব দাবি করা উচিত হবে না। নতুন রাস্তা বা নতুন রেললাইন থেকে কৃষকরা যে প্রকৃত সুবিধা ভোগ করেন বর্ধিত মূল্যসূচীতে তার প্রতিফলন ঘটে।......অস্থায়ীভাবে যদি কোথাও দাম বাড়ে ন্যায্য কারণেই সরকার বেশী রাজস্ব বাড়াতে পারেন, তবে পরবর্তী ব্যবস্থার সময়েই এই হার বাড়ানো যেতে পারে, আগে নয়। মূল্যমান যদি না বাড়ে তাহলে ধরতে হবে কৃষকরা তার থেকে কোন সুবিধা পাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে রাজস্ব দাবি করা হলে কৃষকদের ঋণের বোঝা বাড়বে আর দারিদ্র্যের দিকে তাদের ঠেলে দেওয়া হবে। কোন ভিত্তিতে সরকার ভূমি থেকে রাজস্ব বাড়াতে পারেন তা যদি খুব স্পষ্ট করে ও সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা না করা হয় তাহলে তার একটাই অর্থ এবং সেটা হল এই, চিরকালের জন্য এসব লোককে অনিশ্চয়তা ও হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার এত বড় উপায় মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি থেকে আর কখনো বের হয়নি।"

তিনি পরিশেষে বলেছেন :

"জমির মালিক ও ভাড়াটে কৃষকদের মধ্যে কোন ভিত্তিতে খাজনা বাড়ানো

যায় বাংলাদেশের খাজনা সংক্রান্ত আইনে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এইসব বিশেষ কারণ ছাড়া আদালত কোনমতেই খাজনা বাড়বার অনুমতি দেন না। কিন্তু সরকার ও ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকারী কৃষকদের মধ্যে কোন ভিত্তিতে খাজনা বাড়ানো যায় তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সে কারণেই এ ব্যাপারে আদালতে আপিল করা যায় না।"

এইসব উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় তদানীন্তন সরকার রমেশ দত্তের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি গ্রহণ করেননি। প্রকৃতপক্ষে আবহাওয়ার কারণে অত নয়, যতটা অত্যধিক কর ভারের ফলেই ভারতে বারবার দুর্ভিক্ষ হয়। রমেশ দত্তের এই মূল বক্তব্যকেও অগ্রাহ্য করা হয়। তবুও রমেশ দত্ত তর্কের যে ঝড় তুলেছিলেন তা বিফল হয়নি। তাঁর প্রয়াসও বৃথা যায়নি। মূল সমস্যাটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে সরকারকে তিনি যে শুধু বাধ্য করেছিলেন তাই নয়, তাঁর সুচিন্তিত যুক্তির বিরুদ্ধে প্রচলিত প্রথা চালু রাখার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে তাঁদের আত্মরক্ষার ভূমিকা নিতে হয়েছিল। একটা একনায়কতান্ত্রিক সরকার, যার নীতি কায়েমী স্বার্থ সমূহের সঙ্গে জড়িত, যাদের বিরুদ্ধে তার একেবারেই রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, সেরকম একটি সরকার যে সামান্য একটু মতবিরোধের জন্য তার নীতি রাতারাতি পাল্টাবে সে আশা করা দুরাশা। এই তর্কবিতর্কের ফলে ভারতে বিরাট একটা জনমত গড়ে ওঠে। ইংলণ্ডেও কিছুটা সাড়া পড়ে। এই জনমতের চাপে পড়ে পরিবর্তনের ঢেউ আসতে শুরু করে। ভারতের প্রশাসকরা এবার থেকে ভারতীয় জনমতকে স্বতঃসিদ্ধ বলে আর গণ্য করতে পারলেন না। অনেক সত্য কথা সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনমত যে সচেতন হয়ে উঠেছিল সেটাও তাদের আর অস্বীকার করার উপায় রইল না। এই জনমত একটা আলাদা ধরনের, কারণ এর সঙ্গে কোন কায়েমী স্বার্থ জড়িত ছিলনা। একনায়ক শাসনের সবচেয়ে বড় মিত্র অজ্ঞতা ও নির্বিকার মনোভাব। জনগণ যখন সরকারের নীতি সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকেন, প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে যখন তাঁরা

সচেতন থাকেন না সেই নির্বিকার অবস্থার উপরেই একনায়ক শাসন ব্যবস্থা বাঁচতে পারে। ভূমি রাজস্বে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই মতবিরোধ যতটা অজ্ঞতা ও নির্বিকার মনোভাব দূর করতে পেরেছিল ততটাই লাভ বলে ধরা যায়। এটাই এই সমস্যার এক ন্যায্য সমাধানের পথ করে দিতে সক্ষম হয়।

৬

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে লর্ড কার্জন দিল্লীতে দরবার উৎসবের আয়োজন করেন। সেটা ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাস। রমেশ চন্দ্র এই দরবার দেখতে দিল্লীতে আসেন। এই জাঁকজমকপূর্ণ দরবার দেখবার মত হয়েছিল। রমেশ দত্তের মত একজন অনুভূতিশীল মানুষের মনে এর কোন প্রভাব পড়েনি। তাই তিনি লিখলেন, "এত বড় প্রদর্শনী ভারতের জনগণকে নাড়া দিতে পারেনি, তারা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। তারা জিজ্ঞাসা করেছে, 'আমরা কি পেলাম?' তারা যা পেলো তাতে খুশী হওয়া যায়না। দেশীয় রাজ্যগুলিকে দেয় ঋণের সুদ কমিয়ে দেওয়া হল আর এক অদূর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সাহায্যের বৃথা আশ্বাস দেওয়া হল।"

এই দিল্লী দরবার ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করার সুযোগ দিয়েছিল। 'ডেইলী নিউজে' একটি চিঠি লিখে ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত এই প্রায় দুই দশককে তিনি শান্তি, সংস্কার ও ছাঁটাইয়ের কাল বলে বর্ণনা করেন। "সীমান্ত যুদ্ধ ও অন্য দেশের অঞ্চল অধিকারভুক্ত করার আগ্রাসী নীতি বর্জন করা হয়, মহীশূর রাজ্যকে আবার নৃপতি শাসকের হাতে তুলে দেওয়া হল, ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা আইন যেগুলি ভারতের অন্যতম বৃহৎ আইনবিধি—তা চালু হয়। বাংলাদেশের খাজনা আইন, কৃষকদের অত্যাচার ও হয়রানি থেকে রক্ষা করে। ভূমি থেকে সরকারের যা প্রাপ্য, সমগ্র ভারতের জন্য তা স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করার সুপারিশ

করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারেও উৎসাহ দেওয়া হয়। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়।"

১৮৭৭ সাল থেকে ১৯০৩, এই সময়টাকে তিনি সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলে বর্ণনা করেন। "এই সময়ের মধ্যে দু'বার আফগান যুদ্ধ এবং একবার বর্মা যুদ্ধ বাধে। ভারতের ঋণের বোঝা বেড়ে দাঁড়াল ২ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশী টাকা। আমরা দেখলাম ভারতের কর ভার ৩ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে। একে ভারতের সমৃদ্ধির যুগ বলুন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমরা দেখলাম সৈন্য সামন্তের জন্য খরচপত্র বৃদ্ধি পেলো ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হল। পৌর স্বায়ত্বশাসনব্যবস্থাকে খর্ব করা হয়। রেল চলাচল বাড়লো বটে কিন্তু সেচ ব্যবস্থা হল অবহেলিত। আর আমরা দেখলাম দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, দুর্ভিক্ষ শুধু যে বার বার এল তাই নয়, তা হল ব্যাপক ও মর্মান্তিক। ইতিহাস তার কোন সাক্ষ্য রাখেনি।"

গভীর আবেগের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

"ভারতের রাজস্বের প্রায় অর্ধেক প্রতি বছর হোয়াইট হলের অফিসে চলে যায়। এমন কি কেউ নেই যে দৃঢ়তার সঙ্গে ও অসীম মনোবল নিয়ে এটাকে বন্ধ করতে পারে? লবণ কর তুলে দিয়ে, ভূমি করের সীমা বেঁধে দিয়ে, সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করে, ভারতীয় শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে, কার্য নির্বাহক পরিষদে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চাকরীর দরজা জনসাধারণের জন্য খুলে দিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তাদের প্রকৃত অংশীদার করার মত কেউ কি নেই? এইসব সংস্কার যদি না করা হয়, তাহলে ১৯০৩ সালের দরবার ছলনা ও প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি? লর্ড কার্জনের ভাষায়, এসব সংস্কার না করা হলে ভারতবর্ষ 'প্রাচুর্যের হ্রাস ও রিক্ত সম্ভাবনা ও যুক্তিযুক্ত অসন্তোষপূর্ণ' একটি দেশ হয়েই থাকবে।

দিল্লী দরবারের পরে রমেশ দত্ত অন্ধ্র ও গুজরাট সফরে বেরুলেন। তিনি

গেলেন কাকিনাড়া, রাজামুন্দ্রি এবং হায়দ্রাবাদে। সেখান থেকে খেদা, আহমদাবাদ, ব্রোচ এবং সুরাটের গ্রমে। যেখানেই গেছেন, পেয়েছেন বিপুল সম্বর্ধনা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, কারণ, ভূমি খাজনা নির্ণয়ের একটা ন্যায্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি যে সংগ্রাম করছিলেন, তা ফলাও করে প্রচার করা হয়। আন্তরিক অভ্যর্থনা এই কারণেই। তিনিও সাড়া দিলেন। আদিকালের যানবাহনে করে তিনি দুর্ভেদ্য পথ দিয়ে বহু দূরের গ্রাম, ছোট ছোট কুটিরে গিয়ে গ্রামবাসী-দের সঙ্গে আলাপ জমালেন। গুজরাটের গ্রামবাসীদের সম্পর্কে তিনি বলছেন :

"মার্চ মাসের রোদ্দুরে ও ধূলোয় মাঝে মাঝে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। গ্রামের রাস্তা তো, এব্ড়োখেব্ড়ো পথ। যানবাহন মানে তো গরুর গাড়ী। গরুর গাড়ী করে বহু দূরে যাওয়া—বুঝতাম আমার এই পাকা হাড়ের পক্ষে সহ্য করা একটু যেন মুশকিল। কিন্তু যাত্রার শেষে যখন দূর দুরান্তরের গ্রামে গিয়ে উঠতাম, যখন কৃষকরা পরিবার ও ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাকে ঘিরে ধরতো, তাদের সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভাষায় যখন কথাবার্তা বলতাম—গুজরাটের লোকেরা হিন্দুস্থানী ভাষা বেশ বুঝতে পারে—যখন তাদের ক্ষেত-খামারে গিয়ে দাঁড়াতাম, দেখতাম তাদের ঘর, বলদ ও মহিষ, শুনতাম জমিতে কতটা শস্য তারা ফলাতে পারে, কত খাজনা দেয়, কত আয় করে, তাদের ধার-কর্জই বা কতটা, তখন মনে হত দিনের শেষে এত ভাল কাজ আর কখনও করতে পারিনি কিংবা কাজ করে এতটা পুরস্কার কখনও পাইনি। সত্যি বলছি, তিন মাস আগে দিল্লী দরবার দেখে এলাম। সেই এলাহী দরবার যদি আমি নাও দেখতাম আমার কষ্ট হত না। বরঞ্চ এই ঘুরে ঘুরে নানা কথা জিজ্ঞেস করে গুজরাটের গ্রাম্য জীবনের যে আকর্ষণীয় চিত্র পাচ্ছি, দরবারের চেয়ে এ আমার কাছে অনেক প্রিয়। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো এসব অভিজ্ঞতা অম্লান হয়ে থাকবে।"

এ সফরের শেষে তাঁর আর একবার য়ুরোপে যেতে হয়। ১৯০৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল তিনি বোম্বাই থেকে জাহাজযোগে রওনা হন—পৌঁছান ২৪ তারিখে।

চ

ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি ব্রিটিশ জনগণের মনে ভারত সম্বন্ধে একটা যথার্থ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ভারতের স্বার্থ কি করলে পূরণ হয় তা তিনি তাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন। ১৯০৩ সালের ১৫ই জুলাই তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্যালেসে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—নাম "মালিকানা স্বত্বাধিকারী ভারতের কৃষক"। জনসমক্ষে এই তাঁর প্রথম ভাষণ। একই মাসে 'ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ানে' তাঁর চিঠি প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় সামরিকবাহিনীকে মোতায়েন রাখতে যা খরচপত্র হচ্ছে ভারত তার আংশিক খরচ বহন করবে—সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি এই চিঠিতে বিরূপ মন্তব্য করেন।

তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন :

"বর্তমান সরকারের সৎ ও শুভবুদ্ধি সম্বন্ধে দেশবাসীর কি ধারণা হবে, তারা ভাববেই বা কি? সৈন্যদের ভাল শিক্ষাকেন্দ্র তাই সরকার দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন করেছেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার জন্য এই সৈন্যের প্রয়োজন। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্য মোতায়েন রাখার জন্য ভারত তার আংশিক খরচ মেটাবে। সাম্রাজ্যবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! ঘোরতর অন্যায়কে একটা অযৌক্তিক তর্কের আড়ালে ঢাকবার চালাকি ভারতের একজন স্কুলের ছেলেও বুঝে ফেলবে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে গত ৪৫ বছরে ভারত কি কখনও সাহায্য চেয়েছে? অথচ গত কয়েক বছর ধরে গ্রেট বৃটেন, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে কি ভারত সৈন্যসামন্ত জুগিয়ে যাচ্ছেনা? যুক্তি ও ন্যায্য বিচারের দিক থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কিছুটা খরচ কি ইংলণ্ডের বহন করা উচিত নয়? না কি তার বদলে ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনীর জন্য ভারতের আংশিক খরচ জোগান উচিত?

নভেম্বর মাসে লাংকাশায়ারে বেশ কয়েকটি সমাবেশে তিনি ভারত সম্পর্কে ভাষণ দেন। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে লণ্ডনে তিনি, "ভারতে শুল্কের প্রশ্ন"

সম্পর্কে এক ভাষণে বলেন :

"উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ড তার কারখানাগুলিকে রক্ষা করেছে, কলোনিগুলি যেমন তাদের ক্রমবর্ধমান শিল্প সংস্থার জন্য রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করেছে তেমনি সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। শুল্কের বিশেষ সুবিধা দিয়ে আরও বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল রপ্তানী করতে বাধ্য করলে সেটা ভারতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হবে, অন্যায় হবে। ভারত যদি আরও কম পরিমাণে খাদ্য রপ্তানী করতে বাধ্য হয়, যদি তৈরী জিনিষপত্র তাকে আরও কম আমদানী করতে হয় তাহলে ভারতের সমৃদ্ধির পথ সুগম হত।"

এই বছরের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ। এতে রয়েছে ভিক্টোরিয়া যুগের ইতিহাস। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এ যুগের প্রথম পর্ব। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রশাসনের এটা হল শেষ অধ্যায়। ১৮৫৮ সালে হয় সিপাহী বিদ্রোহ। সেই বছরেই ইংলণ্ডের রাণী সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ সালে রাণী ভারতের সাম্রাজ্ঞীর পদমর্যাদা গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। রমেশ দত্তের এই বইয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এই পরিবর্তনের সব ইতিহাস স্থান পেয়েছে।

রমেশ দত্ত লিখছেন, "যে কোন দেশের সম্পদ হল তার কৃষিব্যবস্থা, শিল্প উৎপাদন এবং সুসম্বদ্ধ অর্থনৈতিক প্রশাসন ব্যবস্থা। ব্রিটিশ শাসন ভারতকে দিয়েছে শান্তির রাজত্ব কিন্তু ভারতের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ শাসন কিছুই করেনি, ধনসম্পদ বাড়বার সুযোগ ব্যাপক করতে পারেনি।" কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় শিল্পপতিদের গলায় কিভাবে ফাঁস দিয়েছে, রমেশ দত্ত তাঁর গ্রন্থের পূর্বখণ্ডে তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি মন্তব্য করেন, "১৮৩৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া যখন সিংহাসনে বসেন তখন এ

হুর্ভোগ দূর হয়। তবুও আগে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল—তার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলছেন, "ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে চাষ-আবাদ অনেক বেড়েছে। কিন্তু কৃষকদের ঘরোয়া জীবন সম্বন্ধে যিনি দু'কথা জানেন, তিনি নিশ্চয় বলবেন যে, কৃষিব্যবস্থার প্রসার সত্ত্বেও আগের চেয়ে দেশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি, দেশের সম্পদ বাড়েনি এবং দেশ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচার জন্য আগের চেয়ে নিরাপদ হয়নি।"

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "সম্পদ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ থেকে যদি আমরা সম্পদ বণ্টন ও ভারতের আর্থিক অবস্থার কথায় ফিরে আসি তবে দেখবো সেই একই হুর্দশা।" তিনি আরও বলেছেন, "ভারতের সংগৃহীত মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশের সবটাই স্বরাষ্ট্র ব্যবস্থার খরচ বাবদ ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভারতে যেসব য়ুরোপীয় অফিসার চাকরি করছেন—বছরে তাঁরা যত টাকাকড়ি ইংলণ্ডে পাঠান—তা এই হিসাবের মধ্যে ধরলে দেখা যাবে যে, ইংলণ্ডে ২ কোটি টাকারও বেশী ভারতীয় রাজস্ব পাঠানো হয়। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ, দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর একটা দেশের কাছ থেকে বছরে এই পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে চলেছে। যাঁদের মাথাপিছু ৪২ পাউণ্ড রোজগার সেই জাতির লোক মাথাপিছু আয় যাঁদের মাত্র ২ পাউণ্ড সেই দেশের মানুষের কাছ থেকে আবার মাথাপিছু ১০ শিলিং করে আদায় করতে চাইছেন। ব্রিটেনের জনগণ যে ভারতের কাছ থেকে মাথা পিছু ১০ শিলিং আদায় করছেন—এটাই ভারত-বাসীকে দরিদ্র করে তুলছে। এর ফলে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে। এতে ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্যের কোনো লাভ হচ্ছেনা এবং সেই সঙ্গে তা ভারতের জীবনী শক্তিকেও নিঃশেষ করে দিচ্ছে।"

ভূমিকার শেষের দিকে রমেশ দত্ত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন, "জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যে সরকার তার অস্তিত্বের একটা

তাৎপর্য আছে। কিন্তু একটি দেশ অন্য দেশকে শাসন করবে, এটা হতে পারে না। এক দেশের লোক নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য দেশের ওপর শাসন করে, নিজেদের দেশের লোকের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে, লাভের জন্য হয়ত এমন একটি জায়গার, বা এমন একটি মানুষের খোঁয়াড়ের প্রয়োজন।" রমেশ দত্ত মন্তব্য করেন, "এই বিবৃতির গভীর তাৎপর্য রয়েছে।" তিনি বলেন, "অন্য লোকেদের স্বার্থ বড় করে দেখলে এক বিরাট জনসংখ্যার কল্যাণ করা সম্ভব হয়না। পৃথিবীর যে কোন ভোটদাতার মতই ব্রিটিশ ভোটদাতা ন্যায়পরায়ণ। কিন্তু তার যদি মানবিক গুণ না থাকে, যদি সে নিজের স্বার্থ না দেখে এবং নিজের মুনাফার কথা চিন্তা না করে তবে তাকে কেউ ব্রিটিশ ভোটার বলবে না।"

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই পটভূমিকায় যদি রমেশ দত্তের চিন্তাধারাকে আমরা বিচার করে দেখি তবে বুঝব যে তিনি দূর ভবিষ্যতের কথা কত চিন্তা করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্রও এই চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত। মহাত্মা গান্ধী পরে আমাদের যেকথা বলতেন, তার গভীর তাৎপর্য রয়েছে। ব্রিটিশ জনগণের কোনো দোষ নেই, যে সম্পর্ক ও অবস্থার ফলে একটি দেশ অন্য দেশের ওপর প্রভুত্ব করে—দোষটা সে অবস্থার, সে সম্পর্কের।

১৯০৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর রমেশ দত্ত ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। এটাই তাঁর শেষ ইংলণ্ড বাস। তিনি বরোদার প্রশাসনিক দায়িত্বভার নিতে এলেন। ব্রিটেনে তাঁর প্রয়াস শেষ হল। দীর্ঘ সাত বছর ধরে তিনি একটি দেশের জনসাধারণের কাছে ভারতের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁর সমসাময়িক কালের সঙ্গী দাদাভাই নওরোজী এবং ডবলিউ. সি. ব্যানার্জির মতই তিনি জনসমাবেশে ভাষণ দেন। ব্রিটিশ সংবাদপত্রে চিঠিপত্র লেখেন। ব্রিটিশ কূটনীতিজ্ঞ ও নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। এবার ইংলণ্ডে বাসকালে ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়ে তিনি তাঁর সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' নামে তাঁর প্রথম বইতে তিনি লর্ড কার্জনকে

লেখা পাঁচটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। এতে তিনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মূল কয়েকটি সমস্যার বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার পরেই বেরোয় তাঁর উল্লেখযোগ্য দুই খণ্ডের বই—'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস'। আগেই আমরা দেখেছি, তিনি 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে,' ভারতে উপনিবেশবাদের পটে অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। তখনকার দিনে দেশে অর্থনৈতিক বিষয়ে যে চিরাচরিত ধারণা ও বিশ্বাস ছিল—এটা তার থেকে একেবারে আলাদা, একেবারে আমূল পরিবর্তন বলা যায়। সময়কালে এই বইয়ের প্রভাব লক্ষণীয় হয়। সেদিন ব্রিটিশ সমাজ এই বইটিকে বিরূপ ও সন্দেহজনক মন নিয়ে দেখে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের সত্যিকারের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ভারতের কম সময় লাগেনি কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপারে এর প্রভাব খুবই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সাত বছরের কম সময়ে এ কৃতিত্ব অর্জন করা কম কথা নয়। রমেশ দত্তের ভারতে ফেরার সময় হয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন ক্ষেত্রে প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণের সুযোগও এসে গেল। রমেশ দত্ত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। তাঁর বিশিষ্ট ও কর্মবহুল জীবনের এটাই হল শেষ অধ্যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

বরোদার রাজস্ব মন্ত্রী

এই শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে বরোদার প্রশাসনের খুব সুনাম ছিল। গাইকোয়াড় প্রগতিশীল শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। রমেশ দত্ত যখন প্রশাসক হিসেবে সার্ভিসে বহাল ছিলেন, গাইকোয়াড় তাঁর কাজকর্ম দেখে প্রীত হন। ১৮৯৫ সালে রমেশ দত্ত যখন বর্ধমান ডিভিশনের অস্থায়ী কমিশনার ছিলেন তখনই গাইকোয়াড় বরোদা সার্ভিসে যোগ দেবার জন্য রমেশ দত্তকে আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় রমেশ দত্ত এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেবার পর এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করার অনুমতি যেন তাঁকে দেওয়া হয়। ১৯০৪ সালে গাইকোয়াড় রমেশ দত্তকে বরোদার রাজস্ব মন্ত্রী হবার জন্য আবার আমন্ত্রণ জানান। এবার রমেশ দত্ত এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সেটা ১৯০৪ সালের আগষ্ট মাস।

রমেশ দত্তের এই নিয়োগকে ইংলণ্ড ও ভারত উভয় দেশের অনেকেই স্বাগত জানান। কিছু কিছু সমালোচক অবশ্য বলেছিলেন যে এতদিন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য আত্মনিয়োগ করে রমেশ দত্ত এখন অপেক্ষাকৃত সীমিত অঞ্চলে তাঁর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখবেন এটা খুবই দুঃখের কথা। এই সমালোচনা একেবারে উড়িয়ে দেবার উপায় ছিল না, কারণ রমেশ দত্ত এতদিন একটা বিরাট কাজে হাত দিয়েছিলেন। দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বুনিয়াদ গড়ে তোলায় তাঁর অবদান ছিল যথেষ্ট। ভারতের স্বার্থ কোথায়—সে বিষয়ে ধারণা ও বিশ্বাস জাগাতে তিনি ইংলণ্ডে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তার ফলে সেখানে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে অতটা জাগরণ না হলেও, ভারতে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর গবেষণা, বিশেষ করে 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের' মত তাঁর

স্মরণীয় গ্রন্থ প্রকাশের ফলে ঔপনিবেশিক-শাসিত অঞ্চলের জনগণের নতুন দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। এই সক্রিয় রাজনীতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ব্যাপক ক্ষেত্র ছেড়ে, ভারতের নৃপতি শাসিত একটি রাজ্যের প্রশাসনভার নেওয়ার সার্থকতা যে অনেক কম, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। ব্যাবহারিক জীবনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে অবশ্য এ প্রশাসনিক দায়িত্বের মূল্য হয়তো ছিল। সুযোগ সীমিত হলেও এর একটা মস্ত সুবিধেও ছিল। রমেশ দত্ত যে সব পুঁথিগত ধারণা ও প্রস্তাব পেশ করেছিলেন—ব্যাবহারিক জীবনের পরীক্ষায় সেগুলি সত্যি সত্যি দাঁড়াতে পারে কিনা—তা বিচার করার সুযোগ তিনি পেলেন।

বাঁধা-ধরা গৎ আওড়ানোর মত যুক্তিবাগীশ রমেশ দত্ত ছিলেন না। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্রশাসনিক বিভাগে তিনি যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন—তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস সে অভিজ্ঞতার উৎস। তবু কায়েমী স্বার্থ-সম্পন্ন সমালোচকদের অভাবও ছিল না, তাঁরা রমেশ দত্তের বিশ্বাসকে কল্পিত ও অবাস্তব আখ্যা দিতে দ্বিধা করেননি। জনসমক্ষে তিনি এতদিন যা প্রচার করেছেন তা প্রশাসনিক বিভাগে কাজে লাগাবার এইতো সুযোগ! ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে তিনি যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করছিলেন, ভাবলেন সাময়িকভাবে সরকারী চাকরী ও প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব নিলে সেই উদ্দেশ্যই পূর্ণ করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে বরোদার প্রশাসন-দায়িত্বকে জীবন নাটকের একটা সাময়িক অঙ্ক হিসেবেই তিনি গণ্য করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এ কাজ শেষ হলে তিনি আবার গবেষণায় মগ্ন হবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। বরোদার দেওয়ানের দায়িত্বভার গ্রহণ করার কয়েক মাসের মধ্যেই সেখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

যেমন তাঁর স্বভাব, রমেশ দত্ত প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। তাঁর ছিল তারুণ্যের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। তিনি অকপটে সিস্টার নিবেদিতার কাছে মনের

কথা লিখলেন। সিস্টার নিবেদিতাকে ডাকতেন "ঈশ্বর-দুহিতা" বলে।

তিনি লিখলেন, "আমি নতুন পথ নিতে চাইছি নতুনভাবে সংস্কার করতে। এ রাজ্যকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাব এই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প। উৎসাহ ও শক্তি এখানে ছড়িয়ে আছে। আমি সে শক্তিকে সুসম্বদ্ধ করার চেষ্টায় আছি। আমি যুবকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রতিভাকে বিকাশ করতে চাই। নতুন কার্যসূচী নতুন অভিমতকে স্বাগত জানাতে চাই। অগ্রগতির পথকে সব দিক থেকে উন্মুক্ত করতে চাই। এভাবে বরোদাকে একটি সমৃদ্ধ ও সুখী রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলবো এই আমার অভিপ্রায়। লোকের সঙ্গে বিনাদ্বিধায় আমি মেলামেশা করি, কার্যসূচী ছাপাই, প্রস্তাবগুলি নিয়ে মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করি। আমি যা করতে চাই ঠিক করে ছাড়ি। এমনভাবে করি যা দেখে রাজ্যের প্রবীন অফিসাররা মন্তব্য করেন 'ওটা তো নিয়ম বহির্ভূত'। কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত কর তুলে দিয়ে তাদের ওপর থেকে বোঝা নামাতে চেষ্টা করছি। নতুন নতুন কলকারখানা চালু করতে আমি পুঁজিবাদীদের এক করতে চাইছি। তার ওপর যদি আমি বিধান পরিষদ গড়ে তুলতে পারি, তাহলে জনগণের সঙ্গে সংযোগ রেখে এবং তাদের স্বার্থে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থাকে চালাতে পারবো। সব দরজাই খোলা থাকবে, সন্দেহের ঊর্ধে, একনায়কের অত্যাচারিত পথে গোপনে অন্ধকারে বা আড়ালে কাজ নয়। বিস্মিত হয়ে কেউ কেউ বলবেন—এসব স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন! হোক না স্বপ্ন, নিষ্ক্রিয় ও স্থাবর চিন্তার চেয়ে কর্ম ও অগ্রগতির স্বপ্ন দেখা অনেক ভাল………।"

রমেশ দত্ত রাজস্ব মন্ত্রী হিসেবে যেসব সংস্কার সাধন করেন, রাজ্যের বার্ষিক প্রশাসনিক রিপোর্টগুলিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বোধ হয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথক করার ব্যবস্থা গ্রহণ। বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, "রাজস্ব দাবীর ক্ষেত্রে যে অফিসার প্রকৃতপক্ষে ফরিয়াদীর পথ নেন—তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। জেলা

বা তালুকের প্রধান, এমন অফিসার যাতে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে সন্দেহ মুক্ত থেকে প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেটা বিবেচনা করেই মাননীয় মহারাজা দুটি বিভাগকে পৃথক করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।”

অবৈতনিক গ্রামীণ মুন্সেফ ব্যবস্থা অন্য একটি সংস্কার সাধন। ন্যায্য বিচারে ছোটখাট দায়-দায়িত্ব পালনে পল্লী অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা পাওয়া এবং সাধারণ ব্যাপার নিয়ে বহুদিন ব্যয়সাপেক্ষ মামলা এড়ানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। বিচার বিভাগের দায় দায়িত্ব পালনে জনগণকে অংশীদার করে তুলতেই প্রত্যেক জেলায় বিচার বিভাগীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হত। জেলা বিচারপতি এইসব সম্মেলনের পৌরোহিত্য করতেন এবং এতে যোগ দিতেন মুন্সেফ, ম্যাজিস্ট্রেট ও উকিলরা। বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়—“মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বহু অমূল্য তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এসব প্রশ্ন সমাধানের জন্য আইন সংশোধনের সুপারিশও করা হয়েছে। এগুলি এখন বিবেচনাধীন।”

রাজস্ব প্রশাসনের ক্ষেত্রে রমেশ দত্ত উদার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এসব ব্যবস্থা তিনি সমগ্র দেশে চালু করার কথাই সারা জীবন ধরে ভেবেছেন। গাইকোয়াড় শিক্ষা প্রসারে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যেসব উদার ব্যবস্থা নেন—তারজন্য তাঁকে প্রশংসা করে রমেশ দত্ত একটা চিঠি লেখেন। তিনি তাতে বলেন :

“প্রত্যেক তালুকের বন্দোবস্ত করার সময় অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাকে যদি আমরা যুক্তিসম্মত ভিত্তিতে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে শিক্ষা ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রসারের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। ভূমি খাজনার ব্যবস্থা ভারতের উন্নতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। চল্লিশ বছরেরও আগে কর্ণেল বেয়ার্ডস্মিথ ঠিকই বলেছিলেন, “ভূমি খাজনা নির্ধারণের ব্যাপারটা লোকেদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এর ওপরেই তাদের সমৃদ্ধি বা অসচ্ছলতা নির্ভরশীল।” উল্লিখিত কারণগুলির মধ্যে এটা সবচেয়ে বড় কারণ। প্রত্যেকটি

তালুকের 'পুনর্বিন্যাস করার যখন সময় হবে তখন যদি ভূমি রাজস্ব নির্ণয়ের ব্যবস্থাকে আমরা যুক্তিসম্মত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে সক্ষম হই তবে বরোদা একটা জনবহুল, সমৃদ্ধিশালী ও প্রগতিশীল রাজ্য হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু ভূমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাটা যদি অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, যা পূর্বতন গাই-কোয়াড়ের আমলে হয়েছিল, তাহলে বরোদা দরিদ্র ও বিত্তহীন হয়ে থাকবে, লোকেরাও অন্য জায়গায় চলে যাবে। এটা খুব সহজ ও সত্য কথা, রাজ্যের একজন বিশ্বস্ত পদস্থকর্মচারী হিসাবে সত্য কথা বলাই আমার কর্তব্য। মহারাজ যেমন ভাল বুঝবেন করবেন।"

এই ব্যাপারে রমেশ দত্তের সুপারিশগুলি এই রকম—

১) অতীতে ভাল ও খারাপ সময়ের হিসাবে কোন একটি তালুক যতটা দিতে পেরেছে এবং কৃষি অগ্রগতির ক্ষতি না করে সে ভবিষ্যতে যা দিতে পারবে সে সব কথা বিচার করে তালুকের প্রাপ্য ভূমির খাজনা নির্দিষ্ট করা উচিত।

২) দাম যদি বাড়ে অথবা উৎপাদন বৃদ্ধি ও চাষ আবাদ বাড়ানোর মত অন্য কোন কারণ যদি দেখা যায় যার বিচার করে খাজনা বাড়ানো অযৌক্তিক মনে হবে না সেরকম অবস্থা ছাড়া কোন মতেই খাজনা বাড়ানো উচিত নয়।

৩) কোনো কৃষককে তার ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্যের এক ভাগের বেশী দিতে বলা উচিত নয়। এক খণ্ড জমি থেকে গড়পড়তা উৎপাদনের সঙ্গে যদি কৃষি আবাদের খরচ বাদ দিই তবে নীট উৎপাদন বেরিয়ে পড়ে। কৃষি আবাদের খরচের মধ্যে রয়েছে কৃষক ও জমিতে কর্মরত তার পরিবারের অন্য সদস্যদের ন্যায্য মজুরা, আর তার কৃষি ভাণ্ডারের বিভিন্ন সামগ্রী যেমন লাঙ্গল, বলদ ইত্যাদির ওপর ন্যায্যহারে সুদ।

স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের ব্যাপারেও রমেশ দত্ত রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার জনগণকে সহযোগী করে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন। বরোদায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইউনিট ছিলো গ্রামীণ পর্ষদ। এই প্রধান ইউনিটের ভিত্তিতে

রমেশ দত্ত একটা বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রায় পনেরো ষোলটি গ্রামীণ পর্ষদকে একত্র করে একটি নির্বাচনী কলেজ স্থাপিত হয়। এই নির্বাচনী কলেজ তালুক পর্ষদের জন্য একজন করে সদস্য নির্বাচন করত। গ্রামীণ পর্ষদগুলির প্রতিনিধি এবং পৌর সভাগুলির প্রতিনিধি নিয়ে তালুক পর্ষদের অন্ততপক্ষে অর্ধেক নির্দিষ্ট হত। সরকার তালুক পর্ষদের বাকি সদস্যদের মনোনীত করতেন। অন্যদিকে তালুক পর্ষদগুলি জেলা পর্ষদকে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতেন। দশ হাজারেরও বেশী জনসংখ্যা অধ্যুষিত জেলার পৌরসভা, জেলা পর্ষদকে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতেন। তালুক পর্ষদের মত জেলা পর্ষদগুলির কম করে হলেও প্রায় অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত হত। বাকি সদস্য বা অর্ধেকেরও কম সদস্যকে সরকার মনোনীত করতেন।

স্বায়ত্বশাসনের বিধিব্যবস্থায় সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা ছিল রাজ্য বিধান পরিষদ। এই পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে নির্বাচন করতেন জেলা পর্ষদ, বরোদা মিউনিসিপ্যালিটি এবং রাজ্যের সরদারবৃন্দ। বাকী দুই তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার থেকে বেছে নেওয়া হত। এদের মধ্যে কয়েকজন থাকতেন পদাধিকারী সদস্য।

এইভাবে স্বায়ত্বশাসনের যে ক্রমোচ্চ শাসন বিভাগ স্থাপিত হয়েছিল তাদের ওপর সাধারণ কাজকর্মের দায়িত্ব দেওয়া হত—প্রধানতঃ পূর্ত বিভাগের কাজকর্ম ও রক্ষণাবেক্ষণ। কর থেকে যে রাজস্ব আসত তা দিয়ে প্রধানতঃ এইসব সংস্থা খরচপত্র মেটাতেন। অবশ্য ঘাটতির বছরে বা অন্য কোন বিশেষ উপলক্ষে সরকার এদের সাহায্য দিতেন। যেসব গ্রামীণ পর্ষদ ভাল কাজকর্ম দেখাতে পারতেন, তাদের ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে স্বায়ত্বশাসনের একটা ধাঁচ গড়ে উঠলো যা পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল। দেশের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থার এইভাবেই বুনিয়াদ গড়ে ওঠে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের বাকি অংশের চেয়ে বরোদা এগিয়ে গিয়েছিল। রমেশ দত্ত তাঁর প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে বলেছিলেন, "শিক্ষা বিস্তারের জন্য বরোদায় রাজ্যের রাজস্বের শতকরা ৬.৫ ভাগ খরচ করা হয়। বাংলাদেশে খরচ করা হয় শতকরা ১.১৭ ভাগ, বোম্বাইতে ১.৪৪ ভাগ, মাদ্রাজে ১.৩৩ ভাগ এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বাকি অংশে শতকরা প্রায় ১ ভাগ।" রমেশ দত্তের কার্যভার গ্রহণ করার আগেই, বরোদার কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯০৫ সালে রমেশ দত্ত যখন রাজস্ব মন্ত্রী হন অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যের সর্বত্র প্রবর্তিত করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৭ থেকে ১২ বছরের সব ছেলে, এবং ৭ থেকে ১০ বছরের সব মেয়েকে স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে হত এবং যোগ না দিলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। লিখতে, পড়তে ও অঙ্ক শেখাবার জন্য চারশ অবৈতনিক পল্লী-স্কুল বা গ্রাম্য-পাঠশালা গঠন করা হয়।

পরিশেষে • রাজস্ব মন্ত্রীর কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পেয়ে শিল্পের উন্নতি হয়েছিল। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য নিঃসন্দেহে পিছিয়ে পড়েছিল। রমেশ দত্ত এই অনগ্রসর অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "প্রথমেই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে বরোদার রেকর্ড খুবই খারাপ। পুরানো যেসব শিল্প আছে সেগুলি নিশ্চিহ্ন হবার মুখে, যেসব শিল্পে নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। সরকার যেসব শিল্প গড়ে তুলেছেন, ব্যবসায়িক দিক থেকে সেগুলি ব্যর্থ প্রতিপন্ন। "রমেশ দত্ত তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্টে অন্য চিত্র তুলে ধরেন। গত বছর তাঁত শিল্প প্রসারে উৎসাহ পেয়েছে, আমাদের তন্তুবায় স্কুলে সায়াজী নামে নতুন ধরনের তাঁত আবিষ্কৃত হওয়ায় পেটলাড ও ভাসা শহরে তাঁতের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে, নাহসালায় তাঁতের কাপড় বোনার একটি নতুন কোম্পানী স্থাপিত হয়েছে। গত বছর কাপড়ের কলের সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়েছে।…বরোদায় দু'টি

নতুন কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছে। কাদিতে বীজ থেকে তুলো বার করবার একটি কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে সুতো তৈরী করবার যন্ত্রপাতিও বসানো হয়েছে। পেটলাডে রঙ বানাবার কারখানায় উৎপাদন বেড়েছে, চলতি বছরে বিল্লিমোরাতে একটি চকোলেট তৈরীর কারখানা আবার চালু করা হয়েছে, গান্‌ডেভীর চিনি কারখানাটির পরিচালনা বেসরকারী হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে, এইসব অঞ্চলের কৃষকদের উল্লেখযোগ্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তাদের জমিতে যারা খেজুর গাছ বাড়াবে—তারা তাদের মালিকও হবে। এতে চিনি শিল্পের সাহায্য হতে পারে।"

রমেশ দত্ত সারা জীবনই কৃষি উন্নয়নের প্রতি সবিশেষ নজর দিয়েছিলেন, বিশেষ করে ভূমি কর নির্ধারণ সমস্যার বিহিত কি করে করা যায় সেটা নিয়ে ভেবেছেন। অর্থনীতিবিদ্ হিসেবে তিনি অবশ্য বুঝেছিলেন যে, দেশের সুসম অর্থনৈতিক অগ্রগতির ব্যাপারে শিল্পোন্নয়নের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তিনি তাঁর লেখা অর্থনৈতিক ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন লোকেদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের প্রধান কারণ কী বা কোথায়? বরোদার প্রশাসনকালে, স্থানীয় শিল্প প্রসারের জন্য যা কিছু উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন তা তিনি দিয়েছিলেন। শুধু যে অর্থনীতির ইতিহাস রচয়িতা বা অর্থবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত গড়ে তুলবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাই নয়, তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কাছে একজন বাস্তবধর্মী নেতা হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোন্নয়নের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত এবং শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হলে কোন বাধাগুলি সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় সেসব কথা তাঁর এক ভাষণে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বারানসীতে অনুষ্ঠিত প্রথম শিল্প সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন—

তাতে এসব কথার উল্লেখ রয়েছে। *এ বিষয়ে দুটি চরম অভিমত প্রকাশ করা হত। রমেশ দত্ত তাঁর অভিভাষণে এই দুটি অভিমতই উল্লেখ করে বলেন, দুই অভিমতের মাঝামাঝি রয়েছে আসল সত্য। তিনি বলেছেন, "এটা একটা হতাশাব্যঞ্জক উক্তি যে য়ুরোপের প্রতিযোগিতার মুখে ভারতীয় শিল্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। প্রধান কৃষিভিত্তিক দেশ হিসেবে ভারত অন্ধকারের গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে। অন্য অভিমত একটু রঙ চড়ানো। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য হু হু করে বেড়ে চলেছে। ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের প্রসার হচ্ছে কিনা, লোকেদের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ছে কিনা—রপ্তানী সূচীতেই তা প্রতিফলিত। আমি প্রথম অভিমতটার তাৎপর্য উপলব্ধি করেই বলছি আমাদের ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে এই নৈরাশ্যজনক উক্তি ও হতাশাব্যঞ্জক অভিমত ছাপা হয়। লণ্ডনে ইংরেজদের যেসব বৈঠক বসতো—সেখানে আমি দ্বিতীয় অভিমত ব্যক্ত করতে শুনেছি। এঁরা বাণিজ্যের পরিসংখ্যান দিয়ে একটি দেশের অগ্রগতি বিচার করতে অভ্যস্ত।"

রমেশ দত্ত ঘোষণা করেন—"যেমন প্রায় সব সময় হয়ে থাকে, সত্য আছে মাঝ পথে, আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু নিরাশ হবার মত কারণ ঘটেনি। বর্তমানে শিল্পোন্নয়ন যতটুকু হয়েছে তা হয়তো শোচনীয় কিন্তু নৈরাশ্য-জনক নয়।" শিল্পোন্নয়নের পথে যে দুটো বাধা প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়ায় তিনি সে কথার উল্লেখ করেন। "প্রথমত নিঃসন্দেহে আমাদের পুরোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পেছিয়ে পড়েছে। হারানো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে। দ্বিতীয়ত আমাদের অর্থ নৈতিক অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, পৃথিবীর খুব কম দেশেরই তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। একথা মনে রেখে আমাদের হারানো পথ খুঁজে পেতে হবে। দুটি প্রধান অসুবিধার কথা আমরা সংক্ষেপে এভাবে বলতে পারি : প্রথমত, অন্য প্রতিযোগীরা আমাদের

* পূর্ণাঙ্গ ভাষণটি পরিশিষ্ট ৪-এ দ্রষ্টব্য।

চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিযোগিতায় আমরা অন্যায়ভাবে পিছিয়ে আছি।"

রমেশ দত্ত তাঁর প্রথম দিকের লেখায় এ অসুবিধার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. উইলসনের কথা উদ্ধৃত করে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে সংক্ষেপে বলেছেন, "ব্রিটিশ প্রস্তুতকারকরা রাজনৈতিক অবিচারের অস্ত্র প্রয়োগ করে একজন অপরাজেয় প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চেয়েছে, তার গলায় ফাঁস লাগাতে চেয়েছে, কারণ তারা জানতো এই প্রতিযোগীর সঙ্গে সমান তালে তারা এগিয়ে যেতে পারবে না।" কিন্তু তিনি বলেছেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের দেশ কাঁচামালের বা অন্য দেশের তৈরী জিনিসপত্র মজুত করে রাখার কেন্দ্র হয়ে উঠবে—এতে আমরা সম্মত হতে পারি না। একটি দেশ শুধু কৃষিপ্রধান হয়ে উঠতে পারে এ যেমন আমি বিশ্বাস করি না, তেমনি অন্য একটি দেশ শুধু জিনিসপত্র প্রস্তুত করে সমৃদ্ধ হবে—এও বিশ্বাসযোগ্য নয়। দেশের জনগণকে চাকরী দিতে হলে দুটিকেই পাশাপাশি বাঁচিয়ে তুলতে হবে।" রমেশ দত্ত আরও বলেছেন, "আমরা যতটুকু পিছিয়ে পড়েছি তা যদি আবার ফিরে পেতে চাই, নতুন নতুন শিল্প যদি গড়ে তুলতে চাই—তাহলে দেখবো আমাদের সামনে এসেছে অদ্ভুত সব সমস্যা ও বাধাবিঘ্ন। প্রথমতঃ ভারতের অবস্থাটা মূলধন বাড়াবার পক্ষে অনুকূল নয়, কারণ সঞ্চয়ের থেকেই মূলধন বাড়তে পারে। আর ভোগ্য পণ্যের প্রয়োজন মিটিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবেই আমরা সঞ্চয় বাড়াবার কথা ভাবতে পারি। এ দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের ফলে বাড়তি যেটুকু থাকে সেটা নেহাৎ সামান্য। তাই রমেশ দত্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ইংলণ্ড আমেরিকা বা জাপানের তুলনায় আমাদের দেশের ওপর কর-বোঝা অনেক বেশী। প্রত্যেকবার ভূমি ব্যবস্থার হিসেব নিকেশ করার সময় বেশীর ভাগ প্রদেশের ভূমির খাজনা বাড়ানো হয়। আমাদেরই রাজস্বের সবটা

ভারতের জন্য ব্যয় করা হয় না। রাজস্বের একটা বড় অংশ বছরের পর বছর স্বরাষ্ট্র ব্যয় বাবদ অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ও লাভবান পদে কাউকে নিয়োগ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এইসব তথ্য আমাদের বলে দেয় যে, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আমাদের মূলধন জমা করা দরকার অথচ এসব অবস্থা মূলধন বাড়বার পক্ষে সহায়ক নয়। সুতরাং অন্য দেশের তুলনায় আমাদের পয়সাওয়ালা লোকরাও গরীব। "রমেশ দত্তের মতে, ভারতে শিল্প গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় বাধা এই ছিল যে, তদানীন্তন সরকার যেসব আর্থিক নিয়মকানুন করেছিলেন সেগুলি লাংকাশায়ার থেকেই বেশীর ভাগ নিয়ন্ত্রিত হত—আমাদের দেশে নয়।" উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বলেছেন, "আপনাদের হয়তো সবার মনে আছে যে লর্ড লিটনের সরকার কিভাবে স্যার জন্ স্ট্র্যাচে এবং সামরিক সদস্য ছাড়া পরিষদের আর সব কজন সদস্যের উপদেশ অগ্রাহ্য করে সূতীবস্ত্রের ওপর থেকে আমদানী কর উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমদানী কর আবার যখন বসানো হল, সে কথাও নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। লাংকাশায়ারকে খুশী করতে ভারতের মিলের তৈরী সূতী বস্ত্রের ওপর আবগারী শুল্ক বসাতে কিভাবে লর্ড এলগিনের সরকারকে বাধ্য করা হয়েছিল। অপরিণত শিল্পের ওপর আবগারী শুল্ক বসাবার মত এত বড় অন্যায্য ও ক্ষতিকারক আর্থিক আইনবিধি আর কোনো সভ্য দেশে আছে কিনা আমার জানা নেই। কিভাবে এইসব বৈষয়িক নিয়ম বিধির পরিবর্তন করা হল সেসব চিঠিপত্র পার্লামেন্টারী ব্লু বুকে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের মত এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যের সরকারের পক্ষে এর চেয়ে অপমানের বিষয় আর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই।"

যে কোনো দেশের পক্ষে এগুলো কম বাধা নয়। এ দেশে শুধু রাজনৈতিক পরাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক পরাধীনতাও কম ছিলনা। শাসক দেশকে কম দামে কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য শাসিত দেশকে বাধ্য করা হত।

শুধু তাই নয়, শাসক দেশের তৈরী জিনিসপত্র এ দেশের বাজারে বিক্রি করা হত। এরকম একটা অবস্থায় এ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান বাড়বে এবং তারা শাসক দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে এতটা আশা করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ভারতের অবস্থাটা ঔপনিবেশিক শাসনের চরম উদাহরণ হয়ে আছে। ঔপনিবেশিক শাসনের ধাঁচাই এই। এই অবস্থায় শিল্পের প্রসার হওয়া ঔপনিবেশিক শাসন বিরুদ্ধ। তাই এ শাসনব্যবস্থা সম্প্রসারণের আগে নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ হয় এবং তা হয় যে কোন সময়ে। রমেশ দত্তের কাছে ঔপনিবেশিক শাসনের কার্যকারণ ও তার বিরূপ পরিণতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবু দেশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। একটি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা যেসব বাধার সৃষ্টি করেছে—তা ভবিষ্যতে কোন একদিন দূর করা যাবে—এই আশা তিনি পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন, "আমি আপনাদের নিরুৎসাহিত করতে এসব বাধা-বিঘ্নর কথা বলছি না। বলছি তার কারণ এসব বাধাবিঘ্ন আপনাদের মোকাবিলা করতে হবে। এ বাধা কাটিয়ে উঠতে হবে। এসব অসুবিধার মধ্যে পড়ে খুব কম দেশই সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার গভীর আস্থা আছে। আমাদের কারিগরদের দক্ষতা, আমাদের জাতির নতুন নতুন প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা, এ বিরাট দেশের সহায় সম্পদ, এবং সর্বোপরি সুলভ মূল্যে শ্রমিক নিয়োগের সুবিধা—এগুলিই আমার বিশ্বাসের বুনিয়াদ।" বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য আবেদন করে তিনি বলেন, "আমার মনে হয় সংগ্রাম না করার চেয়ে সংগ্রাম করে পরাজিত হওয়া অনেক শ্রেয়, তবে শিল্প আন্দোলনের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস আমাদের সংগ্রাম করতেই হবে এবং আমরা জয়ী হবই। আমাদের দেশের যেসব লোক হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলে হেরে গেছি, তারা আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়।"

তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। সংগ্রামে নেমে পড়া ছিল ভারতের

ভাগ্যলিখন। চলার পথে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বাধাবিঘ্ন নিয়ে এসেছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে ভারত সেই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকেই খর্ব করতে পেরেছিল। 'সংগ্রাম' যে পথ ধরে শুরু হয়েছিল, তা হয়তো রমেশ দত্ত অনুমান করতে পারেন নি। কিন্তু যে সময়ে সম্ভাবনা অন্ধকারাচ্ছন্ন, যখন দিগন্তে আশার কোন রূপালী আলো ঝলসিয়ে ওঠেনি—তখন নৈরাশ্যে ভেঙ্গে না পড়ে সংগ্রামে নেমে পড়তে রমেশ দত্ত দেশবাসীকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিল, তাদের মনে আশার সঞ্চার করতে পেরেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে রমেশ দত্ত আপোষ করেছিলেন এবং তিনি দেশবাসীকে ঔপনিবেশকতার লক্ষণ ও পরিণামের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে বলেছিলেন, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়—এটা ভাবা অন্যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হল—স্বদেশী আন্দোলনেই তার প্রকাশ। সেটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। স্বদেশী আন্দোলন, ভারতীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সবার সামনে তুলে ধরল। শাসক গোষ্টির স্বার্থে যেসব অর্থ বিষয়ক আইনকানুন প্রণয়ন করা হয়েছিল—তার ওপরে ভারতের কোন হাত ছিলনা। এই আইনকানুনের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার পথ দেখিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন ও আত্মত্যাগ। শান্তিপূর্ণ ও সংবিধানগত পথ হলেও এটা প্রতিরোধেরই পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলন যে তীব্র প্রতিরোধ ও অসহযোগের পূর্ণরূপ ধারণ করেছিল—শান্তিপূর্ণ ও সংবিধানগত আন্দোলন তারই পূর্বাভাস।

এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, রমেশ দত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি ঘোষণা করেন, "এই যে মাঝে মাঝে হাঙ্গামার ঘটনা ঘটে কিংবা বিবেচনাহীন অত্যাচার চালানো হয়—এর কোনটাই স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ নয়। আমি স্বদেশী আন্দোলনের কার্যসূচী বলতে যা বুঝি তা হল, স্বদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও প্রসারের জন্য যা

কিছু বিধিবদ্ধ উপায় আছে তা অবলম্বন করা। ভারতের সব শ্রেণীর জনগণের মধ্যে দেশের তৈরী জিনিসপত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলাও স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র। ভদ্র মহোদয়গণ, আমি সর্বান্তঃকরণে এই আন্দোলনকে সমর্থন করি। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি এই আন্দোলনের সহযোগিতা করব।"

স্বদেশী আন্দোলনকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে তিনি আরও বললেন, "আজকের দিনে পৃথিবীর সব দেশই স্বদেশী আন্দোলনের পথ অনুসরণ করতে চাইছে। মিঃ চেমবারলেন রক্ষাকবচের কার্যসূচী রূপায়ণের এই পথ গ্রহণ করছেন। মিঃ ব্যালফোর প্রতিশোধমূলক কর্মসূচীর অজুহাতে এই পন্থা অবলম্বন করতে চাইছেন। ফ্রান্স, জার্মাণী যুক্তরাষ্ট্র এবং সব কটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসিত অঞ্চল অত্যধিক পরিমাণে করের প্রাচীর তুলে দিয়ে এই একই নীতি অনুসরণ করেছিল। আর্থিক আইনকানুনের ব্যাপারে আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং বাস্তবোচিত দৃষ্টিতে দেশী জিনিসপত্র ব্যবহার জনপ্রিয় করার প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যেমে আমরা স্বদেশী আন্দোলন গ্রহণ করেছি। আমি এতে তো কোন অন্যায় দেখছি না, ক্ষতিকারক্ বলেও তো এটা আমার মনে হয় না। বরঞ্চ এটাকে আমি প্রশংসনীয় ও সুবিধেজনক বলেই গণ্য করি।"

আবেদন নিবেদন করে পরিশেষে সমাপ্তি ভাষণে তিনি বলেন, "এই মহৎ কাজে সফল হলে আমরা পৃথিবীর সামনে একটা উদাহরণ তুলে ধরতে সক্ষম হব। আমরা দেখাতে পারব রক্ষাকবচের জন্য কোনরকম শুল্ক বা কর ছাড়াই একটি দেশ তার প্রস্তুতকারক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাতে পারে। এতে সাফল্য অর্জন করলে এ ঘটনা আধুনিক কালের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর যদি আমরা এই মহৎ কাজে ব্যর্থ হই—তাহলে বুঝব যে প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করেছি কিন্তু যা আমরা প্রচার করছি—তাতে আমরা একনিষ্ঠ নই। তখন এটাই বুঝব যে আমরা শিল্পক্ষেত্রে অন্য জাতির কাছে ক্রীতদাস

হয়ে থাকার যোগ্য, যদিও এর থেকে মুক্ত হতেই আমরা সংগ্রাম করছি।

নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে এই বরোদাকেই রমেশ চন্দ্র নিজের মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবন ভারতের মূলগত ঐক্যের নিদর্শন। বিভিন্ন রাজ্য ও সম্প্রদায়ের লোককে তিনি অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাদের এক উদার ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় প্রত্যেকে নিজেকে একটি সুখী পরিবারের সদস্য ভাবতেন। মেহেতা বা তায়েবজীরা তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি সারদাকে (ডঃ মেহতার স্ত্রী) এবং সারিফাকে (মিঃ তায়েবজীব দুহিতা) নিজের মেয়েদের মতই ভালবাসতেন। কোন এক নতুন বছরে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা তাদের উপহার দেন।

"এক তরুণী-সুন্দর মা
অন্য-যে, নবীন আদর্শে দীক্ষিতা কন্যা,
ভালবাসা পেয়েছি এদের, ধন্য আমি,
সঙ্গীত শুনেছি, কখনও বা করেছি খেলা :
চিত্ত আমার ভরে গেছে সঙ্গীত মাধুরীতে
ভালবাসায় হৃদয় হয়েছে পরিপূর্ণ, কন্যা জ্ঞানে
দেখেছি এদের আমার আপন
এরা থাকবে আপন হয়ে হৃদয়ের ভালবাসাই তার সাক্ষী
এক বিনম্র হিন্দু মা
    কর্তব্যে অবিচল মুসলমান কন্যা,
ভালবাসার অকৃপণ বন্ধনে আপন
    লতা যেমন নিবিড় আলিঙ্গনে চিরমুক্ত।
দুই বোন যেন দুই স্রোতধারার
    অপূর্ব মিলন,
একই বৃন্তে দু'টি ফুল অপরের

আশ্রয়

লতা ভিন্ন হোক, কর্তব্যে, প্রেমে
ভারতমাতার প্রতি আনুগত্যে অভিন্ন আত্মা।
এরা তো পশ্চিমী, আমি সুদূর পূর্ব দেশের
এদের সত্যে নিষ্ঠা, তার বিনম্র মাধুর্য
দিয়েছে হৃদয় ভরি, আশিষ ধন্য কুটির।
পৃথিবীর ফাঁকে ফাঁকে এত আলো, এত সূর্যোদয়
দিয়েছে জীবন ভরি আনন্দ আশিষে,
অক্ষম হোক দাক্ষিণ্যের স্মৃতি
হৃদয় অম্লান পরিপূর্ণ প্রেমে।

রমেশ দত্তের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ আর একটি কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিতাটি তিনি জাঞ্জিরার বেগমকে লিখেছিলেন :

পবিত্র মাতৃভূমির ফসল তোমার হাতে
তন্তুবায় ও লোহারের সন্তান,
সেও তোমার আপন মানুষ
মাটি আঁকড়ে যে চাষী পড়ে আছে
তোমাকে ভর দিয়ে সে
মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়—
এদেরই একজন তুমি, এদের সাহায্য
তোমার মহান লক্ষ্য হোক
বিনম্র কর্তব্যে থাকুক অনির্বাণ বিশ্বাস
অনড় আস্থা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে
অনাগত পুত্র, অনাগত কন্যা
তারা হবে

আমাদের চেয়ে মহৎ
অবিচল এ বিশ্বাস যেন থাকে
মেঘের কালো মুখ ঢেকে দেয়
যেমন উজ্জ্বল দিনের আলো
সন্দেহ, বিভেদ দুর্বিপাক তেমনি
এগিয়ে চলার বাধা।
তুমি ভাই, তুমি আমার বোন
উদার-হৃদয় পুরুষ, সত্যনিষ্ঠ তুমি নারী
তোমাদেরই বলিষ্ঠ হাতে দূর হবে
চলার পথের বাধা।
ধন্য হোক পিতৃপুরুষের দেশ
তোমাদেরই সেবায়
তোমরা এক আত্মা, জাতিভেদ, বর্ণভেদের অভিশাপে
হও শত বিভক্ত
লোভ, স্বার্থ মস্ত সে বাধা
নিঃস্বার্থ কাজ আনে মুক্তির আনন্দ।
সত্যনিষ্ঠ পুরুষ, সত্যনিষ্ঠ তুমি নারী
হলেই বা মুসলমান কিংবা হিন্দু
প্রেম—সে তো সব ধর্মের মূলকথা
দেশ সেবা হোক আমরণ স্বপ্ন।

বরোদায় গাইকোয়াড়ের উদার দৃষ্টি ছিল : মনোভাব ছিল সঙ্কীর্ণ শ্রেণী সমাজের উর্ধে। তাই তিনি রাজ্যের প্রশাসনের জন্য যোগ্যতম লোকদের বেছে নিতে পারতেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ্য লোকের আবির্ভাব হওয়ায় রমেশ দত্ত এঁদের সঙ্গে কাজ করার দুর্লভ পরিবেশ পেয়েছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রী

ও দেওয়ান ছিলেন পার্শীসম্প্রদায়ের লোক, মুখ্য মেডিকেল অফিসার এবং অস্থায়ী মুখ্য বিচারপতি ছিলেন মুসলমান, রাজস্ব বিভাগের কমিশনার ও মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার গুজরাটী এবং স্থায়ী মুখ্য বিচারপতি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। আর বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন বাঙালী। রমেশ দত্ত বাঙালী হয়েও খুব সহজেই এই সর্বভারতীয় গোষ্ঠীকে আপন করে পেয়েছিলেন—নিজ বিশিষ্ট পদমর্যাদার আসনে বসেছিলেন। তাঁর লেখা কবিতাগুলিতে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই অখণ্ড ভারতের ভাবমুর্তি তাঁর অন্তরে প্রতিভাত হয়েছিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে নারী ও পুরুষ দেশের নানা জায়গা থেকে একত্রে মিলিত হয়ে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবে—দেশ-মাতৃকার অভিন্ন স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে—এই যে অখিল অখণ্ড ভারত এ তাঁর মনপ্রাণকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই দূরাগত স্বপ্ন গড়ে তিনি আনন্দ পেতেন। এই স্বপ্ন সার্থক করে তোলার জন্য খুবই পরিশ্রম করতেন। তিনি চেয়েছিলেন, দেশের মধ্যে বরোদা একটা আদর্শ রাজ্য হয়ে উঠুক।

কিন্তু প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বের চেয়ে তাঁর মন সাহিত্যানুরাগে অস্থির হয়ে উঠল। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভাইকে চিঠি লেখেন। প্রাচীন-কাল থেকে নিয়ে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় জনসাধারণের ইতিহাস রচনা করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি সেকথা সেই চিঠিতে জানান। "ছয় খণ্ডে লিখব এই বই। দেড়শো বছর ব্যাপী মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনকালে লোকেদের অবস্থা, তাদের অগ্রগতি, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে ভারতীয়দের অভিমত—এসব ইতিহাস একটি খণ্ডে লিপিবদ্ধ থাকবে।" ভাগ্যের লিখন ছিল অন্য, কারণ রুটিন মাফিক কাজ করতে করতেই তিনি মারা যান। তিনি আর সৃষ্টিশীল কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করতে পারেননি। এই কাজটা শেষ পর্যন্ত "মহৎ চিন্তার অপমৃত্যু" বলে গণ্য হবে বলে তিনি যে আশঙ্কা করেছিলেন—দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটাই সত্যে পরিণত হয়েছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সদস্য

১৯০৬ সালের জুন মাসে রমেশ দত্ত কিছুদিন অবসর বিনোদনের জন্য আবার ইংলণ্ডে যান। শরীরটা মজবুত ছিল ঠিকই কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হৃদযন্ত্রের একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। বোম্বাই ও ইংলণ্ডের নামকরা ডাক্তাররা তাঁকে বেশ কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে বলেন। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেন হৃদযন্ত্র ভাল আছে তবুও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন ছিল। জায়গার পরিবর্তনে বিশ্রাম হবে—একথা ভেবেই তিনি তিন মাসের জন্য ইংলণ্ডে যাবেন ঠিক করলেন। বরোদার প্রশাসনিক উন্নতির জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন—তার থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেলেন না বটে তবুও ইংলণ্ডে একটা নতুন পরিবেশে গিয়ে পড়লেন। পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া অবশ্য সম্ভব হলো না। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। এই অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য তিনি সরকারকে সাধ্যমত বোঝাবেন বলে স্থির করেন।

ভারতের আবহাওয়া তখন দ্রুত পালটাচ্ছে, যাদের সেদিন উগ্রপন্থী বলে মনে করা হতো, তাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে সেদিনের আবহাওয়া ছিল মুখর। এই অবস্থায় রমেশ দত্তের মনে হলো প্রশাসনিক বিভাগের সংস্কার সাধন এবং সরকার পরিচালনা ব্যবস্থায় আরও বেশী সংখ্যক ভারতীয়দের নেওয়াই বোধ হয় সরকারের সামনে একটিমাত্র সুবিবেচনার পথ। তিনি উপলব্ধি করেন, শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে নৈরাশ্য ও অসহায়তার কালো ছাপ ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ তাদের দিলে এই নৈরাশ্য হয়তো দূর হবে। এখনও যদি তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে আইন ও শৃঙ্খলা আরও বিপর্যস্ত হবে এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া

হবে। যদি এই অবস্থা আর বেশীদিন চলতে থাকে তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপক বুনিয়াদকে মেনে নিয়ে আরও অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের সহযোগিতা লাভের জন্য এ পর্যন্ত যাঁরা উপদেশ দিয়ে আসছিলেন, তাঁদের কথার কোন তাৎপর্য থাকবে না। তাই রমেশ দত্ত ভাবলেন তাঁর প্রথম কাজ হবে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ করার চেষ্টা। পরে তিনি দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরও অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধনের জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করতে পারবেন।

১৯০৬ সালের ২৫শে জুন তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছেই গণ্যমান্য বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পার্লামেণ্টের প্রখ্যাত সদস্য ছাড়াও ভারতের তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট জন মরলে, পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী এলিস্ এবং স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী স্যার আর্থার গড্লের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেন। গোপাল কৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে তিনি পার্লামেণ্টের বেশ কয়েকজন সদস্যের এক সমাবেশে ভারতের বক্তব্য তুলে ধরলেন। ইংলণ্ড বাসের প্রথম মাসের শেষের দিকে তিনি বেশ আশাবাদী হয়ে ওঠেন। তাঁর এক নাতনীকে লেখা একটি চিঠিতে সেই আশাবাদী মনটারই পরিচয় পাওয়া যায়, "মরলে বলেছেন বঙ্গভঙ্গ 'নিশ্চিত সত্য' তাই হয়তো এ সিদ্ধান্তকে অবিলম্বে পালটানো যাবে না। কিন্তু পরে যদি এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা হয় তাহলে আমার নৈরাশ্যের কারণ থাকবে না।……আগামী বছর আমি বরোদা থেকে অবসর নেবো।" তিনি আরও লিখেছেন—"এক মাস বা আরও কিছুদিন কলকাতায় থাকবো। তারপর স্থায়ীভাবে বাস করতে ইংলণ্ডে আসবো। রক্ষণশীল দলের সরকার লর্ড হ্যামিলটনের আমলে গত নয় বছরে আমি আমার কাজে যতটা সফল হয়েছি, স্থায়ীভাবে ইংলণ্ডে থেকে আমি অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করবো বলে আশা করছি। বিউগ্লের ধ্বনি শুনে যুদ্ধের ঘোড়া যেমন অধীর হয়ে ওঠে, ঠিক আমারও সেই অবস্থা।"

এই কাজটা ছাড়া রমেশ দত্ত তাঁর সফরকালে স্বাস্থ্যোদ্ধার ও বিশ্রামের জন্য অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডেই কাটান। আবার যতটা বেশী সম্ভব রাক্সটনেই ছিলেন কারণ জায়গাটাকে "ইংলণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা" বলে তাঁর মনে হতো। এই অবসর বিনোদনের সময়েই তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী ডবলিউ. সি. ব্যানার্জীর মৃত্যু হয়। রমেশ দত্ত তাঁর দেশপ্রেম ও মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ বছর ভারতের আরও দু'জন মহাপ্রাণের তিরোধানের খবর আসে, আনন্দ মোহন বসু এবং বিচারপতি বদরুদ্দীন তায়েবজী। তাঁদের মৃত্যু সংবাদ শুনে রমেশ দত্ত মন্তব্য করেন, "গত শতাব্দীর যেসব মানুষ ভারতের কল্যাণের জন্য গত পঁচিশ বছর ধরে নিরলস প্রয়াস করে গেছেন তাঁরা একে একে সব বিদায় নিচ্ছেন। এ কাজের দায়িত্ব পড়বে তরুণদের ওপর। সে সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। বদরুদ্দীন তায়েবজী ও বসুর মত মহৎ প্রাণ তরুণদের দেশপ্রেম ও আনুগত্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্‌বুদ্ধ করবে এবং তাঁরা বিচক্ষণতা, সুস্থ-চিন্তা ও বুদ্ধিকে সম্বল করে কাজ করে যাবেন এটাই তাঁর আশা।"

খ

১৯০৭ সালে ভারতের তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট লর্ড মরলে, রমেশ দত্তকে বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত রয়েল কমিশনের একজন সদস্য নিয়োগ করেন। প্রথমে এই কমিশনের চেয়ারম্যান হন স্যার হেনরী প্রিমরোজ এবং তাঁর পদত্যাগের পরে মিঃ চার্লস হবহাউস। রমেশ দত্ত ছিলেন কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য। কমিশনের অন্যান্য সদস্য হন স্যর ফ্রেডারিক লেলী, স্যর ষ্টেনিং এডগারলে, স্যর ডবলিউ. এস. মেয়ার এবং মিঃ ডবলিউ. এল. হিচেন্স। কমিশনের সেক্রেটারী হন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মিঃ এইচ. হুইলার।

সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা এবং তার বিকেন্দ্রীকরণের

সুপারিশ করতে সরকার এই কমিশন গঠন করেন। এদেশের প্রশাসনে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গ্রহণের মত রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে বিচারের দায়িত্ব কমিটির ওপর ছিলনা। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হল, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ফলে যেসব অঞ্চলের ওপর তার প্রভাব পড়বে, এই সিদ্ধান্ত সেই সব অঞ্চলের যত নিকটে সম্ভব নেওয়া উচিত। সুতরাং প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে না—বিশেষ করে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ফলে যেসব ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—তাঁদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেবার ভারপ্রাপ্ত অফিসের যোগসূত্র ও কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ পৃথক করা চলে না। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সুপারিশগুলির ওপর অনেকাংশে প্রশাসনিক যন্ত্রের সংস্কার সাধনের রাজনৈতিক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল ছিল।

মাননীয় সরকার এই তথ্যটি স্বীকার করে নেন, কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন কমিশন তাঁদের রিপোর্টে যেসব চূড়ান্ত সুপারিশ সংযোজিত করবেন—তার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি কমিশন সরকারকে আগেভাগে জানিয়ে দিন। সরকার সেই সময় যে সংস্কার সাধনের কথা ভাবছিলেন তার সাংগঠনিক ধাঁচ স্থির করার আগে সরকার কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে ভাবতে চাইছিলেন।

বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনকে যে বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করতে বলা হয়েছিল—রমেশ দত্তের কাছে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন ছিলনা। আগেই জানানো হয়েছে ভারতে প্রতিনিধিত্বকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা রূপায়ণের ব্যাপারে আরও অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের সহযোগিতা পাবার সুযোগ করে দেবার বিষয়ে রমেশ দত্ত গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। এরই দাবী, এরই প্রচার ও এর গুরুত্ব বোঝাতে তিনি প্রায় ন'বছর ইংলণ্ডে থাকেন। কিন্তু তাঁর অভিমত পৌঁছিয়ে দেবার মত কোনো সংবিধানগত ব্যবস্থা না থাকায় তিনি বাইরে থেকে বন্ধ-দরজা ও আধা-খোলা দরজায় শুধু

ধাক্কা দিয়েছেন। সরকারী পদ থেকে অবসর নেবার পর এই প্রথম তিনি একটি সরকারী রিপোর্টে তাঁর অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন। এটা এমন রিপোর্ট হবে যেটা সরকার নীতিগতভাবে বিবেচনা করতে বাধ্য, তাছাড়া সার্ভিসে থাকলে যেসব বিধিনিষেধ থাকে তা আর তাঁর পালন করার প্রয়োজন ছিল না।

রমেশ দত্তের তথাকথিত "আমূল সংস্কারের" মতবাদ, সরকারী কমিশনের বাঁধা আবহাওয়ায় ঠিক খাপ খাবে কিনা সে বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের মনে স্বভাবতই কিছুটা সন্দেহ ছিল। ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে তদানীন্তন ভারতের সেক্রেটারী অফ ষ্টেট লর্ড মরলে রমেশ দত্তকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁকে কিছু সদুপদেশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন, "আমি আশা করছি আপনি নিশ্চয় সক্রিয় ভূমিকা নেবেন। কিন্তু আপনার নিজস্ব অভিমতে আপনি যদি অবিচল থাকেন এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তা যদি অন্যদিকে মোড় নেয়—তাহলে আপনার ভূমিকার সার্থকতা থাকবে না। এ ব্যাপারে আমি এতটা বলছি দেখে আপনি যেন আমাকে আবার ভুল না বোঝেন। যদি সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ন্যায্য সহযোগিতা পেলে সফলতা অর্জন করা যায়। "চাঁদে হাত বাড়াবার" মত যদি যুক্তিহীন দাবী পেশ করা হয়—সেটা শুধু বিশৃঙ্খলাই আনবে, নিরর্থক প্রতিপন্ন হবে। শুরু থেকেই সে বিষয়ে আমাদের সুনিশ্চিত হওয়া দরকার।"

বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন ১৯০৭ সালের শেষের দিকে কাজ শুরু করেন। ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে কমিশন ভারতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ১২,৩০০ মাইল সফর করেন। ১১৯ জন বেসরকারী পদস্থ কর্মচারী সমেত ৩০৭ জনের বক্তব্য শোনেন। কমিশন প্রধান প্রধান সবকটি সদর কার্যালয় পরিদর্শন করেন। প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে প্রস্তাব ও অভিমত সম্বলিত বিবৃতি সংগ্রহ করেন। সাধারণ নীতি সম্পর্কে যাঁরা দু'কথা বলবার ক্ষমতা রাখেন—কমিশন সেইসব

পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা করেন। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদস্থ কর্মচারীদেরও কমিশন জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন ভারতীয়। কমিশনের বিবেচ্য বিষয়ে যেসব লোক অর্থপূর্ণ অভিমত দিতে পারবেন—কমিশন হয় সরাসরি তাঁদের আমন্ত্রণ জানান, না হয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন।

সাক্ষীসাবুদ পরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ করার পর কমিশন তাঁদের রিপোর্ট তৈরী করতে ও কাজ গুছিয়ে নিতে ১৯০৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে ফিরে যান। কমিশনের রিপোর্ট ১৯০৮ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি ছিল :

১) ভূমির খাজনার পরিমাণ হিসাব করার সূত্রধারা কার্যনির্বাহক ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে না দিয়ে আইনকানুনের মাধ্যমে স্থির হওয়া উচিত।

২) বড় বড় প্রদেশগুলিতে, একজন গভর্নর ছাড়া, যোগ্য ভারতীয় সদস্য সমেত চারজন সদস্য নিয়ে সরকার গঠিত হওয়া উচিত।

৩) পল্লী পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে। তাঁরাই সাধারণ মামলার নিষ্পত্তি করবেন। ছোটখাট পল্লীশিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করা ছাড়াও এঁরা গ্রামের স্কুলগুলি চালাবেন। জ্বালানী ও গবাদিপশু খাদ্যের মজুত ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৪) জেলা ও সাব-জেলা পর্ষদগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত সদস্য থাকা উচিত।

৫) পৌর পরিষদগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত সদস্য থাকা উচিত এবং এঁরাই সাধারণতঃ বেসরকারী চেয়ারম্যানদের নিয়োগ করবেন।

এগুলি হল গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এবং রমেশ দত্তের চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলির সামঞ্জস্য রয়েছে। এতে স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃত কোনো সুপারিশ ছিলনা কারণ স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। তাছাড়া এটা

বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের আওতার বাইরে ছিল। কমিশনের সুপারিশগুলিতে জেলা এবং পল্লী প্রশাসনের পর্যায়ে জনগণের প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণের সংস্থান ছিলো। এটা ন্যায্য পদক্ষেপ। তবে কমিশন এই বিষয়টির গভীরে যেতে চেষ্টা করেছেন—এমন দাবী কেউ করবেন না। রমেশ দত্ত ব্যক্তিগতভাবে হয়তো অনেক দূর পর্যন্ত যেতে চাইতেন কিন্তু এর বেশী দূর এগোবার মত তখন অনুকুল সরকারী পরিবেশ ছিলনা। সম্ভাব্যর সীমার মধ্যেই রমেশ দত্তের সঙ্গে কমিশনের বেশীর ভাগ সদস্যের মতপার্থক্য দেখা দেয়। নিম্নলিখিত বিষয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি :

১) প্রত্যেক জেলা অফিসরকে জেলা শাসনে সাহায্য করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বেশীর ভাগ সদস্যই মেনে নিতে পারেন। রমেশ দত্ত এই ধরনের একটি পরিষদের পক্ষপাতী ছিলেন কারণ তাঁর মতে জেলায় একজন মানুষের শাসনের ফলেই ভারতে যত অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে।

রমেশ দত্তের এ বিষয়ে সুদৃঢ় অভিমত ছিল। ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণরকে তিনি একটি চিঠি লিখে ঐ বিষয়ে তাঁর অভিমত খোলাখুলি জানিয়েছিলেন :

"জেলা প্রশাসনে আমরা জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা পাই না, আমরা যখন অপরাধ দমন করতে এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে চাই, তখনও মাঝে মাঝে দেখি জনগণের সহানুভূতি আমাদের বিরুদ্ধে। এটা খুব দুঃখের কথা হলেও খুবই স্বাভাবিক। তারা যার অংশীদার নয় এবং যেখানে লোকায়ত উপদেশ ছাড়াই একজন বিদেশী জেলা অফিসার শাসন করেন—সে ধরনের প্রশাসনে জনগণের সহানুভূতি না থাকাই স্বাভাবিক। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। উপদেষ্টা পরিষদ যদি গঠন করা না যায় তবে জেলা পর্ষদগুলিকে এই দায়িত্ব দেওয়া উচিত। জেলার সব ব্যাপারে পর্ষদগুলির পরামর্শ নেওয়া উচিত—যেমন জল নিষ্কাশন, সেচ, জল সরবরাহ, ত্রাণ, অপরাধ দমন, পুনর্বাসন, মদের

দোকান, শিল্প, কারিগরি শিক্ষা, গবাদি পশু, খাদ্য ফলনের জমি, বন সংক্রান্ত নিয়মবিধি, কাঠ, জ্বালানী, নতুন শস্য, জলের হার, ফিডার লাইন এবং আরও অনেক বিষয়ে জেলা পর্ষদের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।"

২) কমিশনের বেশীর ভাগ সদস্যই সুপারিশ করেন যে, জেলা অফিসাররাই সব সময় জেলা পর্ষদের সভাপতি হবেন। রমেশ দত্ত এটা ঠিক মানতে পারেননি। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন ছোটখাট প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যদি লোকেদের বিশ্বাস না করা হয় তাহলে সরকার তাদের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা আশা করতে পারেন না। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপন একটি সরকারী প্রস্তাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বাইরে থেকে জেলা পরিষদগুলির ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। রমেশ দত্ত তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে লর্ড রিপনের সেই প্রস্তাবটি উদ্ধৃত করেন।

৩) কমিশনের বেশীর ভাগ সদস্যের সঙ্গে তৃতীয় একটি বিষয়েও রমেশ দত্ত একমত হতে পারেননি। নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের ওপর দায়িত্ব দেবার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কার্যনির্বাহক পর্যায়ে বিধানমণ্ডলীর আইন সংশোধন করার ক্ষমতা সরকারকে দেবার জন্য ক্ষমতা হস্তান্তরিত আইন পাশ করতে বলে কমিশন যে সুপারিশ করেন, রমেশ দত্ত তাতে সম্মতি দিতে পারেন নি। রমেশ দত্ত এরকম একটি আইনকে নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করেন। তাঁর অভিমত ছিল, যে-আইন একবার প্রচলিত আছে তাকে যদি বদলাবার চেষ্টা করা হয় সেটা যে শুধু বিপজ্জনক তাই নয়, সেটা হবে বিশ্বাস ভঙ্গের সামিল।

৪) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারদের ফৌজদারী মামলার আবেদন শুনবার ক্ষমতা দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ডিভিশন্যাল কমিশনারদের থাকা উচিত বলে কমিশনের বেশীর ভাগ সদস্য সুপারিশ করেন। রমেশ দত্ত এ বিষয়েও একমত হতে পারেননি। রমেশ দত্তের অভিমত ছিল, এটা করা হলে বিচার বিভাগের প্রশাসনকে অযথা বিপদে

ফেলা হবে এবং বিচার বিভাগ সম্বন্ধে লোকেদের বিশ্বাসে ফাটল ধরবে।

গ

১৯০৮ সালের বসন্তকালে রমেশ দত্ত শেষবারের মত ইংলণ্ডে যান। তিনি বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সঙ্গেই ইংলণ্ডে যান, কারণ কমিশন তাঁর রিপোর্ট লিখতে লণ্ডনে যাওয়া স্থির করেন। প্রথম কয়েক মাস তিনি কমিশনের কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু অন্যান্য কাজ করার আগ্রহ তাঁর কম ছিলনা। ভারতে থাকতে তিনি লর্ড মরলের কাছে চিঠি লেখেন। তিনি চিঠিতে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, ভারতে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের ব্যবস্থা নিলে এ দেশের মধ্যপন্থীদের অসন্তোষ কিছুটা লাঘব করা যাবে এবং উগ্রপন্থীরা তাদের কার্যকলাপের যৌক্তিকতা অতটা ফলাও করে প্রমাণ করতে পারবে না। নেতা হিসেবে তিনি চিরকাল শান্তিপূর্ণ পথ ও সংবিধানগত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ করতে চান, কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য বা অমান্য করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। রমেশ দত্ত নিজে ও তাঁর সময়কার মধ্যপন্থীরা, দেশের সরকারের প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান বীতরাগ দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রারম্ভকালে কর্তৃপক্ষকে অমান্য করার মনোভাব বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বিপ্লব ও হিংসাত্মক কার্যকলাপও বেড়ে গিয়েছিল। এতেও রমেশ দত্ত ও অন্যান্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে রমেশ দত্ত ভারত থেকে লর্ড মরলেকে একটি চিঠি লিখে বঙ্গভঙ্গের কথা উল্লেখ করে বলেন, "একটা কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের ঘটনা ভারতের সর্বত্র উগ্রপন্থীদের হাত আরও মজবুত করে দিয়েছে, ভগবানের দান বলে তাঁরা এটা মনে করছেন। বুঝিয়ে শুনিয়ে ও যুক্তি দেখিয়ে প্রশাসন বিভাগকে প্রভাবিত করার অক্ষমতা ও নৈরাশ্য হাজার হাজার মানুষকে অযৌক্তিক পথে ঠেলে দিয়েছে। এই অবস্থায় কিছু সংখ্যক নির্বুদ্ধি বাক্যবাগীশ একটা দুর্দান্ত দল গড়ে তোলার সুযোগ পেলো।"

রমেশ দত্ত জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে "আধুনিক যুগের মানবিক সংস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট" বলে মনে করতেন। 'ভিক্টোরিয়ান এজ্' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি একথা লিখেও যান। পরে অবশ্য তিনি প্রমাণ পান, যে সংস্থার সার্থকতা দেখে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তা ঠিক তাল রেখে এগিয়ে যেতে পারেনি। গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নীতি রচনাকালে জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও অভিমত যাতে জানা সম্ভব হয় সেই জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগে জনগণের আরও অধিক অংশ গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন সম্পর্কে রমেশ দত্ত বহুদিন ধরেই জোর দিচ্ছিলেন। ইংলণ্ডে বছরের পর বছর রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকায় এ পথে এগোন সম্ভব হয়নি। অন্য দিকে বঙ্গভঙ্গের মত মস্ত একটা ভুল পদক্ষেপের ফলে লোকেদের ভাবাবেশ সুতীব্র হয়ে ওঠে। এই ভুল সংশোধন করার চেষ্টা না করে, সরকার অত্যাচার ও নিপীড়নের নীতি অনুসরণ করেন। এতে আরও আগুন জ্বলে ওঠে। জনগণের আবেগ-প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। শান্তিপূর্ণ ও বোঝাপড়ার পথে এগোনো সম্ভব কিনা—জনগণের মনে এ সংশয় জাগলো। এ স্বপ্নভঙ্গ রমেশ দত্তের কাছে কম বেদনা-দায়ক ছিল না। তিনি উভয়সঙ্কটে পড়লেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন সরকার যদি তাঁর এই নীতি চালিয়ে যান, তবে এতদিন তিনি যে রাজনৈতিক মতবাদকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে এসেছেন—তা প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে তিনি এইসব বিশ্বাস একেবারে ত্যাগ করেন কি করে ? নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় তিনি লর্ড মরলেকে চিঠি লেখেন। এই একই চিঠির একটা উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে।

"এই দেশে ব্রিটিশ শাসন কেন জনপ্রিয় হয়ে উঠবে না ? প্রশাসনিক ব্যাপারের খুঁটিনাটি ও নীতি নির্ধারণে জনগণের নেতাদের অংশীদার করতে কেন

ব্রিটিশ অফিসাররা রাজী হবেন না? ভারতীয় নেতারা গর্বভরে কেন ব্রিটিশ প্রশাসকদের পাশে এসে দাঁড়াবেন না—তাঁরা এই বিরাট সাম্রাজ্যের জন্য একাত্ম হয়ে কেন কাজ করবেন না? এটা যদি হতো তবে এ দেশকে তারা উভয়েই নিজের বলে ভাবতে পারতো।" কিন্তু রমেশ দত্তের মনে সন্দেহ জাগলো এবং তিনি বললেন :

"সরকারী পদস্থ কর্মচারীরা এসব প্রশ্নে খুব একটা সাড়া দিতে অভ্যস্ত নন। ক্ষমতাশীল লোকেরা শাসিতদের সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদার হতে রাজী হয়েছে—পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির খুবই কম। নতুন বছরে এই আমার আশা, কারণ এ আশা আমি সারা জীবন ধরে বহন করেছি। হয় সহযোগিতা বাড়বে, না হয় দেখা দেবে ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা, অসন্তোষ ও ব্যাপক অসাম্য। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।"

ইংলণ্ডে শেষ বারের মত সফরের সময় এটাই ছিল রমেশ দত্তের প্রধান কাজ। ভারত সরকারের "সংস্কার সাধনের" পরিকল্পনা সেই সময় ভারতের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল। গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে কতকগুলি প্রস্তাব আসে এবং সেগুলিকে রূপ দেবার চেষ্টা হয়। একটা সুসংহত কার্যসূচী রচনার জন্য সেক্রেটারী তাঁর পরিষদের সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন লর্ড ম্যাকডোনাল্ড। এটা খুবই সৌভাগ্যের কথা, কারণ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন প্রাক্তন সদস্য হিসেবে লর্ড ম্যাকডোনাল্ড বাংলার প্রশাসনিক ব্যাপারে রমেশ দত্তের একজন সহকর্মী ছিলেন। তাই রমেশ দত্ত তাঁর অভিমত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছে দেবার একটা সুযোগ পেলেন। সেই সময় গোখলেও ইংলণ্ডে ছিলেন। প্রকৃত সংস্কার সাধনের জন্য তাঁরা দু'জনেই সচেষ্ট হন। দেশের প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রভাবিত করতে সক্ষম এমন ভারতীয়দের আরও বেশী সংখ্যায় নিলে ভারতের ঘটনা স্রোতের পরিবর্তন করা যাবে এটাই ছিল তাঁদের অভিমত।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে লর্ড মরলে এই "সংস্কারের" কথা ঘোষণা করেন। এতে কতকগুলি সুবিধার কথা বলা হয় এবং তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল :

(১) ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদে একজন ভারতীয় সদস্য নিয়োগ করা উচিত।

(২) প্রাদেশিক বিধান পরিষদগুলিতে বেসরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য থাকা উচিত।

(৩) প্রাদেশিক বিধান পরিষদের প্রাদেশিক বাজেট রচনার ব্যাপারে অধিকতর ক্ষমতা থাকা উচিত যদিও বাজেট সরকারের অনুমতি সাপেক্ষ হবে।

(৪) প্রাদেশিক বিধান পরিষদের কার্যনির্বাহক প্রশাসনের ব্যাপারে সাধারণ প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার থাকবে।

(৫) বড় বড় প্রদেশে একজন বা ততোধিক ভারতীয় সদস্য নিয়ে গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত।

(৬) লর্ড রিপনের রচিত ১৮৮২ সালের স্বায়ত্ব শাসনের পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেওয়া উচিত। জেলা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন সরকারের ভেতর থেকে নয়, বাইরে থেকে।

(৭) জেলা স্বায়ত্ব শাসনের বুনিয়াদ হিসেবে পল্লী স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

আধুনিক মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলে এইসব পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টাকে অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ বলে মনে হতে পারে। বহু বছরের নিষ্ক্রিয়তার পরে এই দাবী অনিচ্ছা সত্বেও পূরণ করা হয়েছে। তবুও সমসাময়িক কালের দৃষ্টিতে সেই প্রথম একটা নৈতিক দাবী মেনে নেওয়া হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নেতারা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন—যেমন, দেশের প্রশাসনিক বিভাগে ভারতীয় প্রতিনিধিদের আরও বেশী সংখ্যায় নেওয়া—তাও মেনে নেওয়া হয়। এই যে পরিবর্তনের স্রোতধারা বইতে শুরু করলো, এটাই ভারতীয় অভিমতের যথার্থতা প্রমাণ করছে। শাসকগোষ্ঠি ধীরে সুস্থে চলার নীতির

ওপরে কখনও কখনও জোর দিয়ে থাকেন। তাঁরা নিজেদের হাতের ক্ষমতা অন্যের হাতে তুলে দিতে চান না, এমন নয়, এসব করে তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা স্থগিত রাখতে চান। তবে এই 'দাঁড়াও হচ্ছে' নীতির স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয়—তার বৈধতা হয়তো মেনে নেওয়া যায় কিন্তু পরিবর্তন নিয়ে আসার অবস্থার সৃষ্টি না হলে পরিবর্তন আসে না—এটা হক কথা। বিশ্বের ইতিহাসে শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে উপহার হিসেবে কেউ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। সময় না হতে আগেভাগে স্বাধীনতা কখনও আসেনি, কেউ পায়নি। লোকেরা স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সংগ্রাম করে স্বাধীনতা পাবার মত যোগ্যতা অর্জন করেছে।

এ সময় যে পরিবর্তন আসে তা মিণ্টো-মরলে সংস্কার নামে পরিচিত হয়। এ পরিবর্তনও নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে আসেনি। রমেশ দত্তের অভিমত উনবিংশ শতাব্দীর নেতারা এই পরিবর্তন আনার জন্য বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এর জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। পরিবর্তন কখনও বা বড় দেরী করে আসে—এই জাতের পরিবর্তনের ইতিহাস প্রায় সব ক্ষেত্রে এক। তবুও যে পরিবর্তন এসেছিলো তার কারণ তার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল। এতেই বোঝা গেল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা পাল্টাতে শুরু করেছিলো। বহু নেতাই এতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ তাঁরা এই পরিবর্তন আনার জন্যই এতদিন চেষ্টা করেছিলেন। এমন একটা অবস্থার তাঁরা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যখন "সংস্কার-সাধন"কে আর স্থগিত রাখা যায় না। যতটা পরিবর্তন মেনে নেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে এ "সংস্কার সাধনের" তাৎপর্য ছিল অনেক বেশী। কারণ এটা পরিবর্তনের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, আংশিক হলেও স্বায়ত্বশাসনের দাবী পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী, তা স্বীকৃত হয়েছিল। এর ফলে পরিবর্তনের চাকা আরও জোরে ঘুরতে শুরু করে। ক্ষমতাসীন সরকার আরও কিছু সুযোগ সুবিধে দিতে

বাধ্য হন। ১৯০৮ সালে মিণ্টো-মরলে সংস্কার যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল—পরবর্তী চল্লিশ বছরের মধ্যে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ পরিবর্তনের ইতিহাস নির্বিঘ্ন ও বাধামুক্ত ইতিহাস ছিল না। এর ফলেই ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখে শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তরিত হয়।

অথচ পরিবর্তনের এ চরম পরিণতি ১৯০৮ সালে মোটেই বোঝা যায়নি, সেই সুদূর অতীতে যে পরিবর্তনের সূচনা করা হয় তা একদিন স্বাধীনতা নিয়ে আসবে—সেদিন কেউ তা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু রমেশ দত্তের মত নেতারা প্রথম পর্যায়ের এ পরিবর্তন আনার সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। যত বড় ক্ষমতাশীল ও মেধাবী নেতা হোক—মানুষ পঞ্চাশ বছর আগের ইতিহাসের বিবর্তন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। যদি সীমিত সময়কালের আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—সেটাই যথেষ্ট। রমেশ দত্ত যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন—তা পূরণ না হলেও তা স্বীকৃত হয়েছিল। ১৯০৯ সালে 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ'তে একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি এরজন্য কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি লেখেন :

"নভেম্বর মাসে লর্ড মরলে যে সংস্কার সাধনের কথা ঘোষণা করেছেন, এবং ডিসেম্বর মাসের ভাষণে যে কথা উল্লেখ করেন—তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গত কুড়ি বছর বা তারও বেশী সময় ধরে যেসব সংস্কারের জন্য দাবী করে আসছেন—সে পথেই এ সংস্কার সাধন করা হচ্ছে। এক কথায় যেসব পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে তা ভারতের জনগণকে নিজেদের ব্যাপারে অনেকটা অংশীদার করে তুলতে পারবে। এখন থেকে সরকারের গৃহীত নীতির পটভূমিকায় জনগণ তাঁদের মতামত দিতে পারবেন। লোকেদের অভিমত দেশের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারবে, নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারবে।

তিনি ঠিক কথা বলেছেন। পরিবর্তনের সূচনা করা হয়েছে, পথ নির্দিষ্ট হয়েছে। দাদাভাই নৌরোজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডবলিউ. সি. ব্যানার্জী, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং রমেশ দত্তের মত নেতাদের এটাই কৃতিত্ব। আরও জোরালো করে শাসন ক্ষমতা পুরোপুরি হস্তান্তরিত করার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার দায়িত্ব ছিল তাঁদের উত্তরসূরীদের, ভারতের জনগণের ওপর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বরোদার দেওয়ান

১৯০৯ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে রমেশ দত্ত ভারতে ফিরে আসেন। সেটা ছিল তাঁর জীবনের অন্তিম অধ্যায়। তিনি যে হঠাৎ মারা যাবেন—কেউ ভাবতেও পারেনি। উপভোগ করেছিলেন পরিপূর্ণ এক জীবন। যে কাজের জন্য তিনি সংগ্রাম করছিলেন—তার সফলতায় তিনি তখন আনন্দে মশগুল। ভাবছেন কি করে এ সংগ্রামকে আরও সার্থক করে তোলা যায়। মিন্টো-মরলে সংস্কারগুলি তখন সবে ঘোষিত হয়েছে। তিনি পেয়েছেন আত্ম-তৃপ্তি। যে পথে তিনি সংস্কার চেয়েছিলেন—সেই পথেই প্রধানতঃ এইসব সংস্কার করতে চাওয়া হয়েছে। দেশের কল্যাণের জন্য যখন এইসব নতুন ব্যবস্থা কাজে রূপায়িত হবে—সেই শুভ দিনটির জন্যই তিনি অপেক্ষা করছেন। তিনি তাতে অংশ নিতেও প্রস্তুত। তিনি ভারতে ফিরে আসার পরেই সরকার ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে প্রথম ভারতীয় সদস্য হিসেবে এস.পি. সিংহকে (পরে লর্ড সিংহ) নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেন। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতীয় অভিমত জানার জন্য দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কাউন্সিলে ভারতীয়দের অংশীদার করার কথা রমেশ দত্ত বহুদিন থেকে বলে আসছেন। তাই কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের ঘটনাকে রমেশ দত্ত স্বাগত জানালেন। সিংহের সম্মানে তিনি তাঁর কলকাতার বাড়িতে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। তিনি শিশুর মত সরল মনে এই সম্বর্ধনা সভার বিষয়ে তাঁর মেয়েকে চিঠি লিখে জানান।

কলকাতায় কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে রমেশ দত্ত শিলং-এ কিছুদিন ছুটি কাটাতে যান।

তিনি সেখানে তাঁর জীবনসঙ্গী বিহারী লাল গুপ্তের সঙ্গে মিলিত হন।

দু'জনে একসঙ্গে খুব আনন্দে সময় কাটালেন। এই শৈলাবাসকে প্রশংসা করে তাঁরা বলেছেন, "এত চমৎকার পাহাড়ী জায়গা আমরা এর আগে আর কখনও দেখিনি।"

১৯০৯ সালের ১লা জুন তারিখে রমেশ দত্ত বরোদার দেওয়ানের কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রাক্তন দেওয়ান কারসাম্পজী অবসর গ্রহণ করলে রমেশ দত্ত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। রমেশ দত্তের পরামর্শে গাইকোয়াড়, বিহারী লাল গুপ্তকে রাজ্যের দলিল রক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। দু'বন্ধু একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন ভেবে রমেশ দত্ত খুব খুশী হন। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে এক ফলপ্রসূ সহযোগিতার অধ্যায় শুরু হবে বলে দু'জনেই আশা করেছিলেন। কিন্তু বিধাতার অন্য ইচ্ছা ছিল কারণ দেওয়ান হিসেবে তিনি বেশী দিন কাজ করতে পারেননি।

১৯০৬ সালের প্রথম দিকে রমেশ দত্ত বুকে একটা ব্যথা অনুভব করায় নামী ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁরা তাঁকে দীর্ঘদিন বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। তিনি এই উপদেশ মাথা পেতে নেন, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, "প্রকৃতি আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, সাবধানবাক্য উপেক্ষা করা আমার উচিত নয়!" ব্যস্ত দিনের মধ্যেও তিনি বিশ্রাম নিতে ভুলতেন না আর এতে তাঁর উপকারও হচ্ছিল। বুকের ব্যথাটা আর অনুভব করতেন না যদিও খুব খাটাখাটনি করলে মাঝে মাঝে ব্যথা হতো। বরোদার দেওয়ানের পদ গ্রহণ করার আগে তিনি ডাক্তার দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করান। ডাক্তাররা বলেছিলেন, হৃদযন্ত্র বেশ ভাল আছে।

দেওয়ানের খুবই দায়-দায়িত্ব। তিনি বলেছেন, "এখানে খুব কাজ, এত কাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রশাসক নাজেহাল, নিজের প্রভু সে আর নিজে নয়।" যেমন তাঁর স্বভাব, রমেশ দত্ত দেওয়ানের কাজে উঠে পড়ে লাগলেন। লর্ড ও লেডি মিণ্টোর রাজ্য-সফর বোঝার উপর শাকের আঁটির সামিল হলো। সব

দায়িত্ব পড়লো রমেশ দত্তের ওপর। হৃদযন্ত্রের বিশ্রাম যেখানে দরকার ছিল সেখানে করতে হলো প্রচুর পরিশ্রম। ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে অভ্যাগতদের সম্মানে এক রাজকীয় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। রমেশ দত্ত হৃদযন্ত্রে এক অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করলেন। এ তীব্র যন্ত্রণা এবার অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়। তবুও তিনি নিজের দিকে তাকালেন না। অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ঘেমে নেয়ে উঠেছিলেন কিন্তু এত যন্ত্রণা মাথায় করেও তিনি নৈশভোজ সমাধা করলেন। সব অতিথি একে একে চলে গেলে তিনি আসন ত্যাগ করেন। এটা কর্তব্যনিষ্ঠা ও সংযমের এক বিরাট নিদর্শন হলেও এর মূল্যস্বরূপ তাঁকে নিজের জীবন দিতে হল। এ নিদারুণ পরিশ্রমে তাঁর হৃদযন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। সেই রাত থেকেই তিনি বিছানা নিলেন। অসুখটা গুরুতর আকার ধারণ করলো। ভাল ভাল ডাক্তারের চেষ্টা, ওষুধ, পথ্য এবং স্ত্রী ও কন্যার অক্লান্ত সেবাতেও তিনি আর সুস্থ হলেন না।

মাত্র এক পক্ষকাল অসহ্য কষ্ট পেয়ে বেঁচে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলে এলেন কলকাতা থেকে। কিন্তু প্রতিদিন তাঁর শরীর খারাপের দিকে যেতে লাগলো। তিনি অসম্ভব কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর বন্ধু বিহারীলাল গুপ্ত অসুখের সময় সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখেছেন :

"দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তিনি বিছানায় শুতে পারেননি। আরাম কেদারায় আরাম করে মাথা নুইয়ে শুয়ে থাকবেন, তাও ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তাঁকে বসে থাকতে হতো। হৃদযন্ত্র ও শ্বাসপ্রণালীকে একটু স্বস্তি দিতে তাঁকে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে থাকতে হতো। শ্বাসপ্রশ্বাসের খুবই কষ্ট ছিল। হৃদযন্ত্র দুর্বল দেখে ডাক্তাররা তাঁকে নড়াচড়া করতে বারণ করেছিলেন।"

তবুও তিনি অভিযোগ বা আপসোস করেন নি। এক পক্ষকালের এ নিদারুণ পরীক্ষা তিনি নিঃশব্দে সহ্য করেন। বরোদার সব জাতির সব ধর্মের লোকেরা উদ্বিগ্নভাবে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্রমাগত খোঁজখবর নিতে থাকেন।

মহারাজা ও মহারাণী অনবরত খোঁজখবর নিচ্ছিলেন, মহারাজা একাধিকবার নিজে এসে তাঁর সেবাযত্নের খোঁজ নেন। ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে রাত দুটোর সময় রমেশ দত্তের জীবনাবসান ঘটে। এক অমূল্য জীবন এভাবে শেষ হয়ে যায়।

খ

বরোদার সকল শ্রেণীর জনগণের কাছে তিনি যে কত আপনজন হয়ে উঠেছিলেন, তাদের যে কত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছিলেন—রমেশ দত্তের শেষকৃত্যের সময় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহারাজা শেষ কৃত্য সামরিক কায়দায় সমাপন করতে নির্দেশ দেন। তাঁর মরদেহ এক পালঙ্কের উপর শায়িত রাখা হলো। সবার আগে হজরত পদাতিক সৈন্যবাহিনীর ৪০ জন "সওয়ার" এবং 'ছোটি খাস বাগা'-র ১১ জন অশ্বারোহী। তারপরে রাজ্যের সর্দার ও অফিসাররা। রাজ পরিবারের জন্য সুরক্ষিত বিশেষ একটি জায়গায় বিশ্বামিত্রের তীরে মহারাজের নির্দেশে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজকীয় সম্মান ছাড়াও, বরোদার হিন্দু, মুসলমান, পার্শি সব জাতের লোকেরা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে, তাঁকে তারা বলতো, 'গরীব কা দোস্ত' বা গরীবের বন্ধু। প্রজ্জ্বলিত চিতার সামনে সমবেত বিরাট জনতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু সেই অন্তিম অনুষ্ঠানে বরোদার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছিলেন তাই চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

তাঁর মৃত্যুতে বরোদায় যে নৈরাশ্য দেখা গেল তার কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। কয়েক মাস আগে রমেশ দত্ত রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদ দেওয়ানের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁকে নিয়ে ছিল অনেকের অনেক আশা। একজন বিচক্ষণ প্রশাসক, একজন পণ্ডিত, সংস্কারক এবং একজন নামী লেখক হিসেবে তাঁর ছিল ভারতজোড়া সুনাম। শুধু তাই নয়, বরোদার রাজস্ব মন্ত্রী হিসেবে তিনি অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেন। বরোদার

লোকেরা ভেবেছিল রমেশ দত্ত দেওয়ান হিসেবে প্রশাসনিক বিভাগের অনেক উন্নতি করবেন। কিন্তু এই নতুন পদে ছয় মাস পূর্ণ হবার আগেই তাঁর দেহান্ত হয়। রমেশ দত্তের মৃত্যুতে যে নৈরাশ্যের ছায়া পড়ে, বরোদার একজন বিশিষ্ট নাগরিক লালা আত্মারাম তার একটা উদাহরণ দিয়েছেন। রামচন্দ্র কোশল রাজ্য ছেড়ে বনে চলে যাওয়ায় লোকেরা যে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলো, রমেশ দত্তের মৃত্যুতে বরোদার লোকেদের মনেরও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল।

এই স্বনামধন্য প্রশাসকের মৃত্যুতে শুধু বরোদার লোকেরাই শোকে মুহ্যমান হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সমাজ জীবনের নানা দিকে তাঁর অবদান শুধু যে বহুমুখী ছিল তাই নয়—অমূল্য ছিল। ভারতের এমন এক যোগ্য সন্তানের মৃত্যুতে সমগ্র দেশের মানুষ শোক প্রকাশ করে, ইংলণ্ড থেকে শোকবার্তা আসে—কারণ ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বহুদিনের, ছিল আন্তরিকতা। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ছিল কিন্তু ওদেশের গুণীজ্ঞানী ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে রমেশ দত্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, আর এ এ সম্পর্কের ভিত্তি ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

রমেশ দত্তের স্মৃতির প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান—তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিনি বলেন, "ভারতের যেসব দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতা আছেন—রমেশ দত্ত নিঃসন্দেহে তাঁদের অগ্রগণ্য। আমাদের জাতীয় জীবনে এটা একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত। তাঁর মৃত্যুতে এই সময় ভারতবাসীর যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, তা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।"

ভগিনী নিবেদিতা রমেশ দত্তের বিধবা স্ত্রীর কাছে এক ব্যক্তিগত ও মর্মস্পর্শী বার্তায় বলেন :

"আপনার মত ভারতের আর কোনো নারী এত বড় কৃতিত্বের স্মৃতিচারণ

করবে না—এত বড় একটি নামের কীর্তি আর কেউ বহন করবে না, এত বড় গর্বে গর্বিত হবার মত আর কারুর সুযোগ নেই। তিনি সত্যিই চমৎকার মানুষ ছিলেন।"

কলকাতার 'মডার্ন রিভিউ'তে একটি প্রবন্ধ লিখে নিবেদিতা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান :

"বিনম্র সরল, এত উদার যে অনেক সময়ে তাঁকে সমর্থনও করা যায় না। এটা আধুনিক মনের প্রকাশ হতে পারে কিন্তু অন্তরের যে মহত্ব সে মহত্বের শিকড় প্রাচীনকালের মাটিতে। রমেশ দত্ত তাঁর দেশবাসীর আপন মানুষ ছিলেন। যা কিছু তিনি করেছেন, নিজের সুনামের জন্য তিনি তা কখনই করেননি, করেছেন ভারতের উন্নতির জন্যে। কিন্তু এ কর্মসাধনা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে, মৃত্যু তার কাছে তুচ্ছ। একটি দুটি বই লোকেরা হয়তো মনে রাখবে বা ভুলে যাবে তাতে কি এসে যায়? কিন্তু দেশবাসী যদি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে ভুলে যায়, যদি সমালোচনার কটূক্তি বন্ধ না হয়, শেষকৃত্যের সময় যদি সব রকম চালাকি স্তব্ধ না হয়, তাহলে সে লোকসান দেশবাসীর, মহাকালের। কারণ ভবিষ্যতের মানুষদের কাছে তিনি পাবেন পিতার সম্মান—তাদের কাছে তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। তারা জানবে এই মানুষটি দেখে গেছেন সুমহান স্বপ্ন এবং তা সার্থক করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তবু তিনি দেশের বেদীমূলে যে শ্রদ্ধার্ঘ রেখে গেছেন—পেছনে যে কীর্তি রেখে গেছেন, তার চেয়ে মূল্যবান আর কি হতে পারে? তিনি রেখে গেছেন এমন অপূরণীয় ও এমন মহামূল্য রত্ন যা তিনি নিজেও কখনও ভাবেননি—সে মহামূল্য জিনিসটি হলো তাঁর নিজের চরিত্র এবং তাঁর ভালবাসা।"

এই চরম দুর্দিনে সারা দেশ হতাশা ও শোকে আচ্ছন্ন হল। দূর-দূরান্তে বাংলাদেশের দুর্গম গ্রামের লোকেরাও শোকে বিহ্বল হলো। কারণ তিনি এদের ভালবাসতেন, আপন বলে জানতেন। শুধু তাই নয়, ভারত ও বিদেশের

আধুনিক শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ও নাগরিকরা রমেশ দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলো, কারণ দেশের উন্নতির জন্যে, দেশকে গণতন্ত্র ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর বিদগ্ধ চিন্তা ও পরিশ্রমের মূল্য তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। 'ষ্টেটসম্যান', 'বেঙ্গলী', কলকাতার 'অমৃত বাজার পত্রিকা', পাটনার 'ইনডিয়ান নেশান', এবং মাদ্রাজের 'হিন্দু'—এ মানুষটির অমূল্য জীবন ও কর্মসাধনার বিষয়ে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্যে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন। এমন কি ব্রিটিশ সংবাদপত্র তাঁর অভিমতের সত্যতা স্বীকার না করলেও তাঁর মহত্ব ও কর্মসাধনার স্বীকৃতি দিলো। লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের অধ্যাপক লীস্ স্মিথ যা বলেছিলেন—তাতে এটা স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন, "ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে মিঃ দত্তকে যে সম্মান দেখান হয়েছে তা দেখে আমি একটু বিস্মিত হয়েছি। এতে এটাই প্রমাণ হয়, ইংলণ্ডের জনগণ তাঁদের নিজেদের মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে ভারতের মহৎ ব্যক্তিদেরও সমকক্ষ বলে ভাবতে শুরু করেছেন।"

স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন ভিন্ন অভিমত দেখা দেয়। তাঁর অর্থ নৈতিক অভিমতের জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রশংসা করা হয়, কিন্তু ব্রিটিশ সংবাদপত্রে তাঁর সমালোচনা। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লেখে, "ভারতে ভূমির খাজনার অত্যধিক বোঝার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি লর্ড কার্জনকে যে 'খোলা-চিঠি' লিখেছিলেন এবং লর্ড কার্জনের চিঠির উত্তরে তিনি যে 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' লেখেন—সেটা ভারতের জটিল রাজস্ব প্রশাসনের ওপর একটা মূল্যবান পাঠ্যপুস্তক বলে আমরা মনে করি।" অন্যদিকে, লণ্ডনের 'দি টাইমস্' মন্তব্য করে, "মিঃ দত্তের মৃত্যুতে ভারতের মধ্যপন্থীরা তাঁদের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে হারালো। বাংলা সাহিত্যে ও ভারতীয় অর্থনীতিতে তাঁর অবদান অসামান্য। ভূমি রাজস্ব বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন

করেন। কিন্তু সেই উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করে লর্ড কার্জনকে লেখা তাঁর চিঠিগুলির ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি ফাঁস করে দেওয়ার ফলে তাঁর সুনাম ব্যাহত হয়।"

ভ্রান্ত ধারণাই বটে। দেশের মানুষরা তাঁর এই "ভ্রান্ত ধারণা"কেই মূল্য দিলেন বেশী, কারণ ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তিত হবার আগে একদিন এদেশ মোটামুটিভাবে সমৃদ্ধ ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ফলে সে দেশের অর্থনীতি কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল, রমেশ দত্তের অর্থ নৈতিক চিন্তাধারার আলোতে দেশের লোকেরা তা বুঝতে পেরেছিল, তারা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিল। অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থে এই সঙ্কীর্ণ সমালোচনা করা হয়েছিল। তাই বলে ভারতের এই সুযোগ্য সন্তানকে ব্রিটিশ সংবাদ পত্র উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেনি বলে যদি আমরা ভেবে নি, তবে অন্যায় হবে। ব্রিটিশ জনমতের প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকটি সংস্থা রমেশ দত্তের স্মৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন—তাকেই বরঞ্চ নির্ভরযোগ্য অভিমত বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ লণ্ডনের 'দি ডেইলি নিউজ' রমেশ দত্তের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মজীবনের বিশদ বর্ণনা দিয়ে এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা স্মরণ করে লেখেন :

"ভূমির রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার একজন সমালোচক হিসেবে তিনি লর্ড কার্জনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন। একজন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারক হিসেবে তাঁর প্রভাব ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মিঃ দত্ত বেশ কয়েক বছর ইংলণ্ডে বাস করেন এবং পরেও বেশ ঘন ঘন তিনি য়ুরোপ সফর করেন। এদেশে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। রমেশ দত্তের উদার ও বিনম্র দৃষ্টিভঙ্গি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুদৃঢ় চরিত্রের জন্য এবং একজন রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে শত শত ইংরেজ নারী ও পুরুষ শ্রদ্ধা করতেন। এ প্রবীণ মানুষটির মৃত্যুকে তাঁরা ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে গণ্য করেন।

রাজনীতিজ্ঞের যে দূরদর্শিতা তাঁর ছিল—তা দিয়ে বিশ্বের যে কোন জনসমাজে তিনি বিশেষ মর্যাদা পেতেন।"

গ

কালস্রোতে সবকিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ইতিহাস নিষ্ঠুর বিচারক। ঘটনার স্রোতে অনুভূতির যে জোয়ার বয়ে যায় সময়ের আবর্তে তার তীব্রতা ক্ষীণতর হতে বাধ্য। ক্রমে ঘটনা পায় ঐতিহাসিক তাৎপর্য। কার্যকারণের বিচারে ইতিহাস নির্মম। দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস ন্যায্য কথাও বলে। শহীদ হয়তো সমসাময়িককালের সমাজে স্বীকৃতি পায় না। যে শহীদ একদিন অমর্যাদায় বিস্মৃত হন—ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আবার তিনি শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন। কৃতিত্বের গুণে যাঁরা সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত তাঁরাই কালের অমোঘ নিয়ম এড়িয়ে বেঁচে থাকেন।

রমেশ দত্তের মৃত্যুতে যে অনুভূতির উদ্রেক হয়েছিল—তা আগেই বলা হয়েছে। সমসাময়িককালে তিনি কতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন, সেটাই তার প্রমাণ। ভারতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার অনেকটাই ছিল তাঁর অনুকূলে কারণ তিনি তো দেশের কল্যাণের জন্যই কাজ করেন, দেশের স্বার্থ নির্ভীকভাবে তুলে ধরেন। বিদেশে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে, যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—তা ছিল সমধিক প্রতিকূলে, কারণ তিনি যে পন্থা পদ্ধতি গ্রহণের জন্য সংগ্রাম করেন, তখন তা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করা হতো। এ ধারণা ভুল হতে পারে কিন্তু এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল।

রমেশ দত্তের মৃত্যুর পর প্রায় ৬০ বছর কেটে গেছে। ভারত এখন স্বাধীন। ভারতের উন্নয়নমূলক প্রয়াসে ব্রিটেন অন্য দেশগুলির সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগী। তখন ছিল শাসক ও শাসিতের অবস্থা, সেই পরিবেশে রমেশ চন্দ্র কাজ করেছিলেন। কিন্তু সে অবস্থা এখন পালটেছে, এখন তা ইতিহাস। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার পথে তাঁর কতটুকু অবদান? ইতিহাসের

নিঃস্বার্থ বিচারের পক্ষে ষাট বছর হয়তো যথেষ্ট নয়। যে লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি কাজ করেছেন তার অনেকটাই পূরণ হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে যে ভাবে ঘটনার মোড় নেবে বলে তিনি ভেবেছিলেন—সে পথে ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি হয়নি। তবুও তাঁর অবদান সম্পর্কে এখন একটা নিরপেক্ষ ধারণা করা সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে তার কার্যকারণ সম্পর্কে সমকাল ও উত্তর পুরুষেরা যাতে একটা সম্যক ধারণা করতে পারেন—তার জন্য তাঁর অবদানের একটা অনুশীলন হওয়া দরকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর কয়েকজন কৃতী সহকর্মীর সহযোগিতায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বুনিয়াদ রচনা করেছেন—তাঁর সেই অবদানের হিসাব না নিলে এ বই লেখার সার্থকতা সম্পূর্ণ হবে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি দিক

শাজাহানের তাজমহলের অমর স্মৃতি সৌধের স্মরণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" মহৎ ব্যক্তিদের কৃতিত্ব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখে অথবা আরও সহজ করে বলা যায়, ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকে মানব সমাজের অগ্রগতির কথা। মহৎ ব্যক্তিরা তাঁদের মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা ও কীর্তি দিয়ে সেই সমাজের অগ্রগতির অবদান যোগান। কীর্তির পিছনে যে মানুষ, তাকে অনেক সময় আমরা ভুলে যাই, কিন্তু মানবিক দিক থেকে বিচার করে কবি বলেছেন, নিজের কীর্তির চেয়েও মানুষ মহান। একজন মানুষের কর্ম ও কৃতিত্ব অনেকটা তাঁর পরিবেশের ফল। এ পরিবেশ আবার অনেক সময় আকস্মিক। তবুও মানুষের কৃতিত্বের পিছনে তাঁর ব্যক্তিত্বের কম মূল্য নেই। সব প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য মানুষ। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া অনেক বেশী মূল্যবান প্রয়াস। একজন মহৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বস্ফূরণের অর্থ হলো এই যে, সমকালীন বেশীর ভাগ লোকের চেয়ে তাঁর অনেক বেশী মানসিক বিকাশ ঘটেছে। কৃতিত্বের চেয়ে তাঁর মানসিক বিকাশের তাৎপর্য অনেক বেশী। যত আংশিক হোক, এরকম একজন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ মানবিক ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের সহায়ক। মানুষের সব প্রয়াসের এটাই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এরকম একজন পুরুষ, তাঁর নিজের জীবনকে উদাহরণস্বরূপ সবার সামনে তুলে ধরেন। তাঁর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মানুষের বিকাশের পথ আরও উন্মুক্ত হয়। বুদ্ধ বা গান্ধী মহৎ ব্যক্তি, তাঁদের জীবদ্দশায় যা তাঁরা অর্জন করেছেন—তার জন্য ততটা নয়, যতটা তাঁরা মানুষের ব্যক্তিত্ব-স্ফূরণে একটা উন্নততর সোপানের পরিচায়ক। তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে আরও আদর্শ মানুষ গড়ে ওঠে, মহৎ মানুষের জন্ম হয়।

আমরা আগের কয়েকটি পরিচ্ছেদে রমেশ দত্তের জীবনের ঘটনাবলী তুলে ধরেছি, তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছি এবং সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছি। এতে তাঁর ব্যক্তিত্বের আভাস পেয়েছি সত্যি কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের সমগ্র পরিচয় তুলে ধরা দরকার। কারণ বক্তৃতায় বা প্রকাশিত গ্রন্থে যতটুকু মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়—ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন তার চেয়ে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মৃত্যুর পরে ভগিনী নিবেদিতা কি বলেছিলেন তা আমরা দেখেছি। তিনি বলেছিলেন······"একটি বা ছুটি বই কে মনে রাখলো কিংবা মহাকালের গহ্বরে তা তলিয়ে গেল কিনা—এমন স্মরণীয় মৃত্যুর কাছে তার কিই বা মূল্য ?" ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে কত বড় সম্মান দিয়েছিলেন—তাও আমরা দেখেছি। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ—"যিনি মহৎ স্বপ্ন দেখেছেন এবং তা সার্থক করার জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। তবু তিনি দেশের বেদীমূলে যে শ্রদ্ধার্ঘ রেখে গেছেন, পিছনে যে কৃতিত্ব রেখে গেছেন, তার চেয়ে মূল্যবান আর কি হতে পারে ? তিনি রেখে গেছেন এক মহামূল্য রত্ন যদিও সে গুণটির সম্বন্ধে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন না—সে মহামূল্য রত্ন হল তাঁর নিজের চরিত্র এবং তাঁর ভালবাসার ক্ষমতা।" প্রকৃতপক্ষে এটাই রমেশ চন্দ্রের সবচেয়ে বড় অবদান কারণ এটাই এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য—যাকে বলা যায় "তাঁর নিজের চরিত্র, তাঁর ভালবাসার ক্ষমতা।"

তাঁর জীবনকাহিনী থেকে তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য জানা যায়। তিনি জীবদ্দশায় এমন সার্থক কিছু করে যেতে চেয়েছিলেন যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ ভাবনা সারাজীবনই তাঁকে বিভোর করে রেখেছিল। তিনি বলতেন, "জীবনটা খেলা নয় যে হেরে গেলে আমরা আবার খেলব।"

সার্থক কিছু করতে হবে—এ অনুভাবনা তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করতো। আর কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসীম। তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র ৬১ বছর। তার মধ্যে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে

জীবনের বেশীর ভাগ সময় উত্তীর্ণ হয়। পরে শুরু হয় রাজনৈতিক কর্মসাধনা। তা সত্বেও তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস, বৈদিক গবেষণা, প্রাচীন ইতিহাস এবং ভারতের আধুনিক অর্থনীতি ইত্যাদি এত বিভিন্ন বিষয়ে সার্থক বই লেখার সময় কী করে পেয়েছিলেন—ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। লেখক ও পণ্ডিত হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করতে চেয়েছিলেন। এইজন্য তিনি কম পরিশ্রম করেননি। তবে তিনি তাঁর লেখাপত্র ও বইয়ের মূল্যায়নের ভার দিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে। অবশ্য একথাও ঠিক যে সমকালে বা মৃত্যুর পর সার্থক কিছু সৃষ্টি রেখে যাওয়াই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। দেশের দারিদ্র্য ও পীড়ন দেখে তাঁর দরদী মন কাতর হয়ে উঠেছিল। ভগিনী নিবেদিতা ঠিকই বলেছিলেন, দেশের মুখ, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে তিনি "মহৎ স্বপ্ন" দেখেছিলেন। ইতিহাসের গভীর জ্ঞান তাঁকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল। ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য, ইতিহাসের ধারা ও বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর মত এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি কার এত ছিল ?

ইতিহাসের যে ধারা ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একদা গর্বিত যে সভ্যতা, সারা বিশ্বকে একদিন পরিচালিত করেছিল সাময়িক ভাবে তা অস্তমিত হয়েছিল কিভাবে—সে ইতিহাস রমেশ দত্তের চেয়ে বেশী আর কার জানা ছিল ? য়ুরোপ তিনি অনেক ঘুরেছেন। শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে ওসব দেশের অগ্রগতি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তাই তিনি নিজের পিছিয়ে পড়া দেশকে তুলনামূলক বিচার করতে পেরেছিলেন। তিনি এমন একটা যুগের মানুষ যখন ভারতে নব জাগরণের সূচনা হয়েছে। ভাবে ও চিন্তায় তিনি এই নবজাগরণের পথে নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন। দেশের জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়েছেন। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তিনি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষকে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে রূপান্তরের

পথকে সুগম করতে চান। এমন রূপান্তর তিনি চেয়েছিলেন যা পরিবর্তনকে অস্বীকার করবে না, রূপান্তরের গতিকে ত্বরান্বিত করবে। এই প্রচেষ্টায় তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন, নতুন ভারত গড়ে তোলায় তাঁর অবদান কতটুকু—পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে তা আমরা বিশদভাবে বলবো। সারা জীবন এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, এত প্রচণ্ড প্রয়াসের পিছনে কোন্ অনুপ্রেরণা কাজ করেছিলো, তাঁর রচনায় তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরেছেন, তাঁর চোখের সামনে কোন্ উদ্দেশ্য বড় ছিল—এসব কথা এখানে বললেই চলবে।

সারা জীবনে যে বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল তা হল তাঁর সংযম ও মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি। দুর্বলতা থেকে এ সংযম আসেনি, এসেছে পরিস্থিতির বাস্তব দৃষ্টি আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধাপে ধাপে অগ্রগতির পথ করে দেবার সুতীব্র বাসনা থেকে। সাংবিধানিক উপায়ে অগ্রগতি আসুক এটাই তাঁর কাম্য ছিল। তাঁর মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা সম্ভব বিশেষ করে পরবর্তী ঘটনার পটে। এখন বলা যায় এই মনোভাব রাজনৈতিক অগ্রগতির গতিকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু এই সমালোচনাকে মেনে নেবার আগে একটা কথা মনে রাখা উচিত। সেদিন এমন একটা রাজনৈতিক অবস্থায় তাঁর বেশীর ভাগ জীবন অতিবাহিত যখন দ্রুত এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। এটা বোঝা দরকার। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সংযম ও মধ্যপন্থী নীতিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় কিনা সেটা বিচার করার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে। তাঁর এই মধ্যপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে উঠেছিল তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস থেকে, উগ্রপন্থী রাজনীতি গ্রহণ করলে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে, সে আশঙ্কা থেকে নয়। সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে রমেশ দত্তের যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অপূর্ব ভাষায় তার যে পরিচয় দিয়েছেন আর কেউ তা দিতে পারতো কিনা সন্দেহ: "প্রাচীনকালের আত্মসমাহিত ভাব ও অপ্রতিহত উৎসাহ-উদ্দীপনা

ছিল তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এই দুটি গুণ একই সঙ্গে আজকাল খুব একটা দেখা যায় না। তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা ও অপরাজেয় মানসিক শক্তি দেশ সেবার কঠিন ব্রতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু এমন কখনও ঘটেনি যখন তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা, সংযমের বেড়া ডিঙ্গিয়ে গেছে, মহত্বপূর্ণ কাজের গণ্ডী পেরিয়ে গেছে। সাহিত্য কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্র হোক অথবা দেশ সেবার কাজেই হোক কখনই এই অপ্রতিহত কর্মশক্তি সংযমের বেড়াজাল ভাঙ্গেনি। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকৃত শক্তির পরিচায়ক।"

এই নবজাগরণের যুগে ভারত বহু মহৎ ব্যক্তির জন্ম দিয়েছিল। সেই মহৎ ব্যক্তিদের তিনি একজন হতে চেয়েছিলেন। রমেশ চন্দ্রের অগাধ দেশপ্রেম, গৌরবময় অতীতের মত ভারতকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার সঙ্কল্পে জনসেবায় অনুপ্রাণিত করেছিলো। তাঁর অবদানের পিছনেও ছিল এ অনুপ্রেরণা। তদানীন্তন সরকারের সিভিল সার্ভিসে ২৫ বছরের বেশী সময় তিনি কাটিয়ে দেন কিন্তু তিনি মাঝে মাঝেই বলতেন, সরকারী পদমর্যাদার প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো মোহ নেই। সার্ভিসে থেকেও তিনি সার্ভিসের নিয়মশৃঙ্খলা পুরোপুরি মেনে চলেছেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর ঊর্ধতন অফিসারদের ইচ্ছা অনিচ্ছার চেয়ে অন্তরের বিবেকের ডাক শুনে চলতেন। এই আপোষবিহীন মনোভাব গ্রহণ করার যা পরিণাম—তিনি সর্বদা তা সানন্দে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতেন। তিনি তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। অবশ্য নিজের থেকে নয়, স্বাধীন মতামত চাইলেই তিনি দিতেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁর মতামত শুনছেন কি না তা নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। অফিসে যতটা স্বাধীনভাবে নিজের বিচারবুদ্ধি করা যায় সে দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি তাঁর নিজের অভিমত প্রয়োগ প্রকাশ করতেন। এতে কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি সুনাম হারাবেন কিনা সে নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা ছিল না। সার্ভিসে বা সার্ভিসের বাইরে নিজের স্বাধীন

মতামতের সঙ্গে যদি প্রচলিত আচার-ব্যবহারের খাপ না খেতো—তিনি কখনই প্রচলিত ধারণাকে মেনে নিতে পারতেন না। এদিক থেকে তাঁকে বিদ্রোহী বলা চলতো। কিন্তু তিনি ছিলেন সংবিধানে আস্থাবান বিদ্রোহী। নিজের প্রতিবাদ জানাতে এবং দেশের স্বার্থ তুলে ধরতে তিনি প্রচলিত আইনের অনুশাসন উপেক্ষা করেননি এবং তখনকার নিয়মপদ্ধতিকে তিনি কখনই লঙ্ঘন করতে চাননি।

খ

ভারতবর্ষেই থাকুন বা বিদেশে, কর্তব্যরত অথবা ছুটিতে কিছু একটা করা চাই, এই আকাঙ্খা তাঁকে সদাসর্বদা যেমন কর্মব্যস্ত রাখতো, তেমনি কর্মতৎপর। তাসত্বেও তিনি তাঁর পরিবারের জন্য প্রচুর সময় দিতেন। তাঁদের সঙ্গে আনন্দ করতেন। তাঁদের সাহচর্যে তাঁর মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠতো। চিঠি লিখতেন চমৎকার। তিনি তাঁর মেয়েদের এবং নাতিদের যেসব চিঠি লিখেছেন তাতে তাঁর চরিত্রের কমনীয় দিকটা ফুটে উঠেছে। পাঁচ কন্যাই তাঁকে খুব ভালবাসতো, তারা পেতো স্নেহশীল পিতার সাহচর্য। একটি ছেলে। এরা সবাই তাঁকে ঘিরে থাকতো, কর্তব্যের তাগিদে নয়, আনন্দে। রমেশ দত্তের ১৬ বছর বয়সে বিবাহ হয়। সেটা ১৮৬৪ সাল। এটা আমরা আগেই জেনেছি। তখন তিনি এনট্রেন্স পরীক্ষাও পাশ করেননি। ১৮৬৮ সালে যখন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে তিনি ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন এই দম্পতির দুই কন্যা জন্মেছে : প্রথম কন্যার জন্ম হয় ১৮৬৬ সালে, নাম কমলা। দ্বিতীয় কন্যার জন্ম ১৮৬৭ সালে, নাম বিমলা।

ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পর বাকি চারজনের জন্ম হয়। তৃতীয় কন্যার ১৮৭২ সালে, নাম অমলা। চতুর্থ কন্যার জন্ম ১৮৭৩ সালে, নাম সরলা। তাঁদের একমাত্র ছেলে অজয়ের জন্ম ১৮৭৯ এবং শেষ সন্তান কন্যা সুশীলার জন্ম ১৮৮২ সালে। বিয়ের পর মেয়েরা অন্যত্র চলে গেল। কিন্তু বাবার সঙ্গে

চিঠির আদান প্রদান বন্ধ হল না। সৌভাগ্যের কথা, রমেশ দত্তকে জীবনে মর্মান্তিক শোক পেতে হয়নি। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা রমেশ দত্তের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

কন্যাদের কাছে লেখা কয়েকটি বাছা বাছা চিঠির উদ্ধৃতি ছাড়া চিঠিগুলি ছাপাবার মত জায়গা নেই। তিনি এইসব চিঠি লিখেছেন মনের আনন্দে আর লিখেছিলেনও অনেক। পড়লে বোঝা যায় কন্যাদের সঙ্গলাভের জন্য তাঁর মন কত উতলা হয়ে উঠতো। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত রাখতেন কারণ তিনি নিজেকে বিশ্বাস করতেন আর মেয়েদের বার বার বলেছেনও যে তাদের একমাত্র কর্তব্য স্বামীদের পাশে দাঁড়িয়ে, সব সময় সাহায্য করা ও তাঁদের ভালবাসা। চতুর্থ কন্যা সরলার বিয়ের পরে তিনি প্রথম যে চিঠি লেখেন—তা এরকম :

"তোমাকে কত ভালবাসি, আমার সব মেয়ে আমার কত প্রিয়, তুমি নিশ্চয় জান। তোমাদের সুখী ও আনন্দিত দেখে আমি যতটা আনন্দিত হই—এমন আর কিছুতে নয়। তোমার স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা, সহৃদয়তা তোমার জীবনের সব দুঃখকষ্টকে ভুলিয়ে দেবে, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, তোমাকে আশীর্বাদ করবে, আর তোমার সযত্ন সেবা ও অম্লান প্রেম তাঁকে শত কর্তব্য ও উদ্বিগ্নতার মধ্যে প্রফুল্ল রাখবে—এটাই তোমাদের স্নেহধন্য পিতা দেখতে চায়। এটাই তার একমাত্র কামনা। সত্যি যতটা যোগ্য তার চেয়েও এ পৃথিবীতে আমি অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছি। মেয়েদের ভালবাসা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং মেয়েদের আনন্দ দেখলে আমার সবচেয়ে আনন্দ হয়।"

প্রায়ই তিনি ইংলণ্ডে যেতেন। কিন্তু পরিবারের জন্য তাঁর মন কেমন করতো। একবার এক মেয়ের জন্মদিনে তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন। মনের কথা লিখে পাঠালেন কবিতায় :

চোখের সামনে ভাসছে মিষ্টি প্রিয় মুখ
আমারই ঘরে সমবেত তারা

খিল খিল হাসি
সমুদ্র পেরিয়ে ভেসে আসে।

প্রেমের বিনম্র লতাগুল্ম
বৃদ্ধ মানুষের হৃদয়ের কোণ জুড়ে থাকে
গভীর এ প্রেম কত সত্য, কত গভীর অনুভূতি
সমুদ্র দেশ-দেশান্তরের ব্যবধানে অম্লান।

কখনও যদি দেখি ক্লান্ত আমি
ভাবনার উদার পাখা মেলে দি আকাশে
কর্মই মানুষের অভীষ্ট
আশীর্বাদ মানুষের ভালবাসা ॥

তাঁর কন্যারা ছেলেমেয়ে নিয়ে, কখনও কখনও তাঁদের স্বামীদের নিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতেন। এঁদের সঙ্গ তাঁকে খুব আনন্দ দিত, তিনি এ সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। তাঁর তৃতীয় কন্যা অমলা ও তাঁর স্বামীর কাছে লেখা চিঠিতে তারই আভাস :

"মানুষের জীবনে যত সফলতা আসে, যত আনন্দ তার জীবনে পাওনা, আমি তার যথেষ্ট পেয়েছি, আমার যারা আপনজন তাদের যখন আনন্দিত দেখি, যখন দেখি তারা ভালবাসতে জানে—তখন আমি যতটা আনন্দ পাই, বিশ্বাস কর, এমন আর কিছুতে নয়। যে জীবন মানে শুধু অবিরাম পরিশ্রম, যে জীবন প্রয়াস-মুখর, ভালবাসার চেয়ে বড় সান্ত্বনা তার আর কিছু নেই। প্রেমের চেয়ে বড় পুরস্কার আর নেই।"

তাঁর কন্যাদের দেখার জন্য তিনি যে কতটা উতলা হতেন, অনেক চিঠিতে তার পরিচয় আছে। মেয়েদের কেউ আসবে জানলে তিনি শিশুর মত

উত্তেজনায় অধীর হতেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ আগ্রহে ভাটা পড়েনি। বরোদা থেকে মৃত্যুর তিন মাস আগে তিনি সরলাকে লিখেছিলেন :

"আসছে বছর তুমি যখন আসবে, আনন্দ ও খুশীতে আমার ঘর ঝলমল করে উঠবে, রাজকীয়ভাবে আমরা থাকবো···বরোদা থেকে নানা জায়গায় যাওয়ার চমৎকার সুযোগ। উত্তরে মাউন্ট আবু, চিতোর, উদয়পুর আর রাজস্থানের অনেক জায়গা, দক্ষিণে যেতে পার বোম্বাই, পুনা, পাহাড়ী জায়গা কোঙ্কন, মহাবালেশ্বর এবং ঐতিহাসিক মারাঠা রাজ্যে। পশ্চিমে চমৎকার জায়গা কাথিয়াওয়াড়ে যেতে পার। সমুদ্রের বুকে দ্বারকার বিখ্যাত মন্দির, পূর্ব দিকে যেতে পার উজ্জয়িনী, ইন্দোর এবং নর্মদার উপত্যকায়। বেড়াবার এ সুযোগ হারালে জীবনে আর কখনও পাবে না, সুতরাং সুযোগ হারিও না। মন স্থির করে ফেলো।"

দুর্ভাগ্যের কথা, এ সফর আর হয়ে ওঠেনি কারণ রমেশ দত্তের এ চিঠির তিন মাসের মধ্যে তিনি মারা যান।

তাঁর চিঠিগুলি পরিবারের জন্য তাঁর গভীর ভালবাসার যে শুধু পরিচয় বহন করে তাই নয়, তাঁর জীবনাদর্শে মানবিক গুণ বলতে আমরা যা বুঝি, তাও। শুধু প্রশাসনের সমস্যা নিয়ে, শুধু ঐতিহাসিক বই লিখেই নয়, ভাইস্রয় ও সেক্রেটারী অফ্ স্টেটের কাছে চিঠিতে বাক্‌বিতণ্ডাই নয়, জীবনের সাধারণ ঘটনা সহজ ভাষায়, ছোটখাট খবরে ভরা চিঠি লিখে যেতে পারতেন। পরিবারের বন্ধন এত ঘনিষ্ঠ ছিল বলেই পরিবারের কোন ঘটনাই তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হতো না। তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে লেখা চিঠিতে দৈনন্দিন জীবনের অনেক ঘটনার প্রতিফলন রয়েছে। একটি পোষা নীলগাই গরুর গাড়ীতে চাপা পড়েছে, টেবিলে সাজানো খাবারের ফিরিস্তি—এই ধরনের নানা কথা, এসব কথা স্মরণ করে তিনি আনন্দ পেতেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যকৌতুকে ছোট-খাট ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আনন্দের হাট বসাতেন।

শুধু স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনীর প্রতিই যে তিনি অনুরক্ত ছিলেন, তাই নয়। তাঁর অগ্রজ যোগেশ দত্তের প্রতি তিনি সারা জীবন অনুরক্ত ছিলেন। রমেশ দত্ত তাঁর কাছে নিজের মনটাকে খুলে ধরতেন। সারা জীবনই দুই ভাই সুখে-দুঃখে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, আনন্দের দিনে আনন্দ, পরস্পরের দুঃখের অংশীদার। বড় ভাইয়ের চেয়ে রমেশ দত্তের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিলো। তাঁর প্রয়োজনে রমেশ দত্ত উদারভাবে সাহায্য করেছেন। অন্যদিকে রমেশ দত্তের চাকরী জীবনের নানা দুশ্চিন্তার অংশীদার হয়েছেন যোগেশ দত্ত, তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন। রমেশ দত্ত যখন বেশী দিনের জন্য বিদেশে যেতেন তখন যোগেশ চন্দ্রই দেখাশোনা করতেন। যোগেশ চন্দ্র রমেশ চন্দ্রের চেয়ে প্রায় এক বছর বেশী বেঁচে ছিলেন। রমেশ দত্তের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দুই ভাই পরস্পরকে চিঠি লিখেছেন। এই চিঠিপত্রে শুধু যে প্রাণ খুলে পরস্পর পরস্পরকে মনের কথা লিখতেন তাই নয়, সেগুলি পারস্পরিক আত্মবিশ্বাস, গভীর বন্ধুত্ব এবং সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ, রমেশ দত্তের ৪৫ বছর পূর্ণ হলে বড় ভাই শুভেচ্ছা জানিয়ে যে চিঠি লেখেন, রমেশ দত্ত তার উত্তর দেন ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তিনি লেখেন :

"তোমার কাছ থেকে শুভকামনা-ভরা চিঠি পেতে খুব ভাল লাগে, কারণ তুমি যা বল, তা অন্তর দিয়ে অনুভব কর এবং যতটা তুমি লেখো, তার চেয়ে অনেক বেশী বল। এক পরম সুহৃদ বন্ধু হিসেবে তোমাকে পেয়েছি, যখনই সাহায্য চেয়েছি তুমি সাহায্য করেছো। আমার যা উদ্দেশ্য, তার প্রতি তুমি সহানুভূতি জানিয়েছো। যা কাজ করেছি, তা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছো। আমার সফলতায় আনন্দ পেয়েছো। আমার সফলতার চেয়েও আমার পরিশ্রম আমার কাছে দ্বিগুণ মূল্যবান। আমি জানি তুমি তার মূল্য দাও। আমার সাফল্য দেখলে তুমি আনন্দ পাও। যতদিন বাঁচবো, পারস্পরিক সহানুভূতি রেখে আমরা যেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারি। তাতে আমরা

দ্বিগুণ আনন্দ পাব। সব মানুষের জীবনেই দুঃখ আসে। তার বোঝা অনেকটা লাঘব করতে পারবো।"

ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে যে ভালবাসা ও সাহায্য পেয়েছেন যোগেশ চন্দ্র তার সমধিক মর্যাদা দিতেন। ১৯০৭ সালে রমেশ চন্দ্রের কাছ থেকে একবার অর্থ সাহায্য পেয়ে যোগেশ চন্দ্র চিঠিতে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন :

"……আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ…কতটা কৃতজ্ঞ ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। যেসব অমূল্য সম্পদ জীবনে আমি পেয়েছি, যা যা নিয়ে আমার আনন্দ, তোমার সাহায্য তার মধ্যে অনন্য হয়ে আছে। আমি আমরণ তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

উত্তরে রমেশ চন্দ্র লেখেন :

"তাই বলি তোমার জন্য অনেক করা তো দূরের কথা, আমার মনে হয়, যাঁরা আমার প্রিয়, তাঁদের প্রতি আমার কর্তব্য ঠিক করতে পারিনি। এটা আমাকে গভীরভাবে পীড়িত করে। এই যেমন তুমি—য়ুরোপে যেতে তুমিই আমাকে প্রথমে সাহায্য করেছিলে, অথচ সারা জীবনে আমি তোমার জন্য প্রায় কিছুই করতে পারিনি…অর্থাভাবে মাঝে মাঝে আমি কষ্ট পাই, ভাবি শুধু অর্থের জন্য অর্থ আমি চাই না, অর্থ থাকলে হয়তো কয়েকজনকে জীবনে একটু সুখ দিতে পারতাম।"

মাঝে মাঝে রমেশ দত্ত তাঁর অগ্রজকে যে কবিতা লিখে পাঠাতেন—তাতে প্রকাশ পেতো গভীর শ্রদ্ধা। জীবনের শেষ দিকে যোগেশ চন্দ্র পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তিনি শয্যশায়ী ছিলেন। রমেশ দত্তের গভীর অনুভূতি একটি কবিতায় প্রকাশ পায় :

ঋষির সাদা পোষাক

শত দুঃখে যদি থাকি ধৈর্যে অবিচল
সাত জ্বালা, নানা পরীক্ষায় যদি নিশ্চুপ, নীরব,

তবে সে জীবন পবিত্র, পূত জেনো,
পরেছো তুমি ঋষির শুভ্র পোষাক :
পবিত্র আত্মা তোমার আত্মসমর্পিত
তোমার জীবনকে করছো তুমি উৎসর্গ॥

সারা জীবনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও একটি কবিতায় মূর্ত। কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন অগ্রজকে :

তোমার দিনের হলো অবসান, ঐ অন্ধকার
নেমে এলো দ্বন্দ্ব-ক্লিষ্ট আবর্তিত জীবনে
সুখে-দুঃখে কাছাকাছি যেন থাকি
জীবনের এ অন্তিম অভিলাষ।
পৃথিবীর এত যে আলো, এত আনন্দ
যদি মেঘ-বৃষ্টির আবরণে ঢাকা পড়ে
কার কি এসে যায় তাতে :
বিষাদ, মুক্তি পেয়েছে জীবনের উজ্জ্বল সান্নিধ্যে
চলে গেছে তারা পৃথিবীর মায়া ছেড়ে
আজ যারা বন্ধু, যদি শত্রু হয় তারা
যদি দেখি হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী, শুধু ভাবনা,
গভীর বিষাদে অভিভূত যদি হই,
বাতাস যদি আনে ঝড়-ঝঞ্ঝা
কার কি এসে যায় তাতে।
ভ্রাতৃত্বের, প্রেমের এ বন্ধনে শান্ত সব
ভাবনা, জ্বালা, অবিরাম শ্রম
ভালবাসারই আশীর্বাদ
এ প্রেম প্রার্থনার অনুদান

এই প্রেমে উন্মোচিত সঙ্গীতের নীরব মাধুর্য
অন্তিম দিনে শুনি সেই প্রেমেরই সঙ্গীত
একদিন, সেই আরববাসীদের মত
নিশ্চিহ্ন, নির্বাক জীবন॥

শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনই নয়, তাঁর উদারতায় উপকৃত হয়েছেন অন্য অনেক মানুষ। তাঁর কাছ থেকে দূর সম্পর্কের আত্মীয়রাও কম সাহায্য পায়নি। রমেশ দত্তের জীবনীকার জে. এন. গুপ্ত এই উদারতার একটা উদাহরণ দিয়েছেন। একবার শুনতে পেলেন তাঁর এক মাসতুতো ভাই টাকা পয়সার অভাবে ইংলণ্ডে আটকা পড়ে আছে। সেই সময় তাঁর নিজেরও টাকা পয়সার খুব অনটন যাচ্ছিল। কিন্তু শোনামাত্র টাকা পাঠিয়ে দিলেন। অথচ কাউকে সাহায্য করছেন বা দয়া করছেন কখনও ভাবতেন না, কারুর জন্যে কিছু করলেও ভুলে যেতেন। এসব ব্যাপার তাঁর কাছে খুব স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে হতো। যাদের আছে, তারা বিত্তহীনদের সাহায্য করবে এটাইতো স্বাভাবিক।

তাঁর বন্ধু ও সঙ্গীদের প্রতি তাঁর সমধিক উদারতা ও আনুগত্য ছিল। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিলেন বিহারী লাল গুপ্ত। ১৮৬৮ সালে প্রথমবার বিহারী লাল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে য়ুরোপে পাড়ি দেন। বিহারী লাল গুপ্ত রমেশ দত্তের সঙ্গেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন থেকেই দু'জনের অখণ্ড বন্ধুত্ব। তাই বরোদায় যখন তিনি মৃত্যু শয্যায়, বিহারী লাল গুপ্তও তাঁর পাশে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই আত্মীয়-স্বজনেরাও মনে করেছিলেন। বিহারী লাল গুপ্ত তাঁর পুরোনো বন্ধুর পাশে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত দাঁড়িয়ে। বিহারী লাল সম্বন্ধে রমেশ দত্ত তাই বলেছিলেন :

আমার সঙ্গী, বিশ্বস্ত বন্ধু, উদার-হৃদয়
পিতা-মাতার কাছ থেকে কত দূরে, তবুও নীরব

আপন করে পেয়েছি তাকে আনন্দে, চোখের জলে।
আমারই পাশে অবিচল চল্লিশ বছর।

জীবন কত মধুর, কত সুন্দর জীবন
প্রকৃত বন্ধুত্ব যদি আপন করে বাঁধে
হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়, হাতের সঙ্গে হাত
যৌবনে যেমন, বয়স্ক এখন, তবু পাশাপাশি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অল্প বয়সের বন্ধু: পরে যখন রমেশ দত্ত রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তাঁর সহকর্মী। সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবন অনেক আগে শুরু হয়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর একটা বিশিষ্ট মর্যাদার আসন। রমেশ দত্ত বিনাদ্বিধায় ও আনন্দে তাঁর এই মর্যাদার স্বীকৃতি দেন এবং বলেন:

"ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ইতিহাসে যেসব দেশপ্রেমিক স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তোমার মত আর কেউ এত মহৎ, সত্যনিষ্ঠ, একনিষ্ঠ ও দেশপ্রেমিক নয়।"

কম বয়সী সহকর্মীদের প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে তিনি সব সময় উদার। দেশের বিরাট নেতা বলে একজনকে তিনি জানতেন এবং জনসমক্ষে তাঁকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করেননি। ১৯০৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে গোপাল কৃষ্ণ গোখলের নাম তিনি প্রস্তাব করেন। গোখলের ভাষণ তিনি ভাইস্‌রয় কাউন্সিলে উল্লেখ করেন এবং বলেন:

"ভদ্রমহোদয়গণ, এই ভাষণটি আপনারা পড়েছেন কিনা জানি না। আমি যখন প্রথম পড়ি, কেন জানি না আমার মনে হলো, ভারতের কল্যাণের জন্যে আর একজন সত্যিকারের মানুষ পেলাম। বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা, জোরাল যুক্তিতর্ক, মধ্যপন্থীর দৃষ্টিভঙ্গী এবং সহজ সরল ভাষায় তথ্যের উপস্থাপনা—ভাইসরয়

কাউন্সিলে তাঁর অপূর্ব ভাষণের ছিল এটাই বৈশিষ্ট্য। এতেই আমরা প্রমাণ পাচ্ছি, এই মানুষ দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ন্যায় বিচার করবেন।

গ

মহৎ যাঁরা রমেশ দত্ত তাঁদের মতই সমসাময়িক কালের মানুষ, তবুও চিন্তাধারায় তিনি অনেক এগিয়ে ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত। আগেই সেকথা বলেছি। ভারতের নবজাগরণ সেই সময় দানা বেঁধে উঠেছে। অনেক দিক থেকেই রমেশ দত্ত এই নবজাগরণের পরিবেশে মানুষ। তাঁর চিন্তাধারায় পশ্চিমের প্রভাব পড়েছিল—যে চিন্তাধারায় জাতায়তাবাদ ও যুক্তিবাদের সমান প্রাধান্য। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর ছিল গর্ব, এ বিষয়ে তিনি তাঁর সমসাময়িক সতীর্থদের সচেতন করে তুলতে নানাভাবে প্রয়াসী হন। অন্যদিকে, দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যেসব যুক্তিহীন ধারণা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল, তাকে তিনি অগ্রাহ্য করে একটা যুক্তি-সম্মত সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এ দিক থেকে বিচার করলে তাঁর চরিত্রে সমকালীন শ্রেষ্ঠ প্রভাব প্রতিফলিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন নানা পরীক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ভবিষ্যতে কোন দিকে হাওয়া বইবে তার পূর্বাভাস দেবার মত তাঁর ক্ষমতা ছিল। অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তাধারা ও অভিমত সমসাময়িক কালের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ছিল। ভারতের অর্থনীতি বিষয়ে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপান্তর অনুমান করতে পেরেছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনটাও সেই পথে এগিয়ে গিয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অল্প যে কজন ভারতীয় ভারতবর্ষের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী হন রমেশ দত্ত তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বেশীর ভাগ লোকের চেয়ে এঁরা চিন্তার জগতে এগিয়ে ছিলেন, কারণ তখন বেশীর ভাগই অন্ধবিশ্বাস ও পুরোনো

মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। নিজেদের ভাগ্য নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। অগ্রগতি সম্বন্ধে বিরূপ হয়তো ছিল না, কিন্তু নির্বিকার নিশ্চয়ই ছিল।

অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে কাজ করতেন বলেই সব সমাজ সংস্কারকের মতই ছিল তাঁর ভাগ্য, কারণ তিনি শুধু বিরোধিতা ও সমালোচনারই সম্মুখীন হয়েছিলেন। সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এ বিরোধিতা ছিল সুতীব্র, সমালোচনা প্রচণ্ড, কারণ সেদিনকার সমাজ জীবনে ছিল পুরোনোপন্থীদের ভিড়, তাছাড়া পুরোনো বিশ্বাস গভীরভাবে বদ্ধমূল ছিল। কোনটা প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় কোনটা—তা বুঝতে পারার ক্ষমতাই ছিল রমেশ দত্তের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি অপ্রয়োজনীয়ের সঙ্গে কিছুতেই আপস করেন নি, কিন্তু আমাদের পক্ষে যা জরুরী, যুক্তিহীন বিরোধীদের মত তাকে বর্জন করেন নি বা বর্জন করতেও বলেন নি। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা প্রথম প্রথম নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে তার হাড়গুলো পুরোনো পন্থীদের বাড়ীতে ছুড়ে ফেলতো। তারা এভাবে প্রমাণ করতো যে তারা গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত। রমেশ দত্ত কিন্তু এ সহজ পন্থায় বিশ্বাস করতেন না। অন্যদিকে, নীতি ও বিশ্বাসের পরিপন্থী না হলে মধ্যপন্থীর আপস রক্ষায় তাঁর আপত্তি ছিল না। রমেশ দত্তের ভাবী জামাই তাঁর পিতার অমতে রমেশ দত্তের এক মেয়েকে বিয়ে করার অনুমতি চান। রমেশ দত্ত তাঁর ভাবী জামাইকে এ দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। ভাবী জামাই বিদেশে যান বলে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হয়েছিল। চিঠিতে সে কথারও উল্লেখ ছিল। রমেশ দত্ত উত্তরে লেখেন :

"প্রায়শ্চিত্ত করলে সৎ ব্যক্তিদের চোখে তোমার মর্যাদা হানি হবে। এতে তোমার বাবা মত না দেন, সেটাই তুমি চাও। এতে তোমার অন্যায় দেখছি না। নিশ্চয় তুমি এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারো। তুমি লিখেছো, নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করার স্বাধীন মতামতকে তুমি মূল্য দিতে চাও। অন্যদিকে তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছো, তাতে তোমার বাবা বিরূপ হলে তাঁর সঙ্গে মিটমাট করে

ফেলতে তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আমি মনে করি এটাও তোমার বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। কারণ পিতা-পুত্রের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অব্যাহত থাকা দরকার। তোমার যে সহধর্মিনী হবে তারও এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা উচিত। তার কর্তব্যে নিষ্ঠাবতী হওয়া উচিত, শ্বশুরকে ভক্তি করা উচিত, প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ঘরের রেওয়াজ অনুসারে মেয়ে যেমন পিতাকে শ্রদ্ধা করে—তেমনি তার শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আমার অন্যান্য মেয়ের যেখানে বিয়ে হয়েছে, তাদেরও শ্বশুর আছেন এবং তারাও এঁদের শ্রদ্ধাভক্তি করে চলে। ঘোমটা দিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ায়। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। হিন্দু সমাজের বিধান অনুযায়ী তারা তাদের নিজের শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলা। আমি এসব খুব পছন্দ করি। ছোটখাট এইসব ব্যাপারে হিন্দু আচার-ব্যবহার বর্জন করে বড়দের মনে আঘাত দেবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। তবে যেখানে নীতির প্রশ্ন—সেখানেই শুধু হিন্দু সমাজের বিধান অমান্য করা চলে। নীতির দিক থেকে দেখলে অসবর্ণ বিবাহ করাই আমাদের কর্তব্য। কারণ অসবর্ণ বিবাহ বিভক্ত ও দুর্বল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই ব্যবস্থা (বিধবা বিবাহ ইত্যাদি তো বটেই) আমাদের মত সঙ্কীর্ণ সমাজে যাতে নির্বিঘ্নে চালু হতে পারে—একটা নীতি হিসেবে সে প্রচেষ্টা আমাদের করা উচিত। যে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ আমরা গড়ে তুলতে চাই তার তো আমরা অংশ মাত্র। এ নীতি গ্রহণ করলে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ এগিয়ে যাবার পথ পাবে। এ ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী—তাঁরা যাতে এই নীতি অনুসরণ করেন—সেটাই আমরা চাই। কত বছর ধরে আমি যে এই সমস্যার কথা কত গভীরভাবে ভেবেছি তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। আমি দুটি উপন্যাস লিখেছি। একটির নাম 'সংসার', বিষয়বস্তু বিধবা বিবাহ—অপরটির নাম 'সাহিত্য', বিষয়বস্তু অসবর্ণ বিবাহ।"

এটা যে চিন্তাশীল সংস্কারবাদীর অভিমত, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। চিরায়ত প্রথার বিরোধিতা করব বলেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিরোধিতা করার মধ্যে

যা প্রতিফলিত তাকে বলে অহংকার। যে সব আচার-ব্যবহার সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর—এভাবে তা দূর করা যায় না বা তার সংশোধন করাও সম্ভব হয় না। অন্যদিকে এতে দৃষ্টিভঙ্গিকে একমুখী করে তোলে, সংস্কারের প্রয়াসে বাধার সৃষ্টি করে। যা প্রয়োজন, যা জরুরী—প্রকৃত সংস্কারকের তার ওপরেই জোর দিতে হবে।

সমসাময়িক ভারতীয় সমাজে রমেশ দত্তের প্রভাব ছিল একজন নেতার মত। যে নেতা, অগণিত মানুষের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন, দূরাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবতেন, শুধু সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। তিনি জনসাধারণের জন্য এক উন্নততর সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে সেই পথে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি চিন্তা জগতের দিগন্তের সন্ধান দেন। এ ব্যাপারে তিনি অনন্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা গবেষণা ও লেখায় বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন। সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় কিছু অবদান যোগাতে পেরে তিনি সন্তুষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার জন্ম হয়েছিলো—তিনি তাঁদেরই পংক্তিভুক্ত হতে চেয়েছিলেন। বিদ্রোহী বা একজন অগ্রদূত যেমন প্রত্যাখ্যাত হয়—সমাজ যেমন তাঁকে মেনে নিতে চায় না, রমেশ দত্তের প্রভাব কিন্তু সেরকম ছিল না। তাঁর ভূমিকা ছিল চিন্তাশীল সমাজ সংস্কারকের—যিনি অনেক দূরের কথা ভাবতে পারতেন, অভীষ্ঠ লক্ষ্যের জন্য কাজ করে যেতে পারতেন এবং বাধাবিঘ্ন ও বিরোধিতা সত্বেও নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যেতে পারতেন। বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি অনেকবারই। তিনি যখন বাংলাতে ঋগ্‌বেদ অনুবাদ করেন তখনকার গোঁড়া সমাজের তা মোটেই মনঃপুত হয়নি। তাঁদের দলবহির্ভূত একজন মানুষের প্রচেষ্টায় তাঁরা মোটেই সন্তুষ্ট হননি। খোলাখুলি বিরোধিতা করে তিনি এইসব প্রতিবাদের মোকাবিলা করেননি বটে তবে কখনও কোন রকম পাল্টা তর্কবিতর্ক না করে,

নীরবে সবকিছু সহ্য করে নিজের কাজ করে গেছেন। বিরুদ্ধ শক্তি এতে হয়তো একেবারে দূর হয়নি কিন্তু তার বিষ দাঁত নিজের থেকেই ভেঙ্গে পড়েছে। নিজের স্বভাবের গুণে ও অনমনীয়ভাবে কাজ করে যাবার ক্ষমতায় তিনি সমাজকে তাঁরই পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেকটা সফলকাম হন। তাঁর মৃত্যুর সময় শিক্ষিত ব্যক্তিদের ওপর সমাজের গোঁড়ামি অতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। তাঁর ব্যবহার ও অভিমতের নিন্দা করার মত সেদিন খুব কম লোকই ছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জাতীয় জীবনে অবদান

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর ভারতের ইতিহাসের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে না হলেও প্রারম্ভে যে বিবর্তনের সূচনা, ১৯৪৭ সালে তারই সফল পরিণতি। ক্ষমতা হস্তান্তর মূলত একটি রাজনৈতিক ঘটনা। কিন্তু সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলন থেকে আলাদাভাবে রাজনীতির স্রোতধারা বইতে পারে না। একটি দেশের পরিস্থিতি যখন সর্ব ক্ষেত্রে, আভ্যন্তরীণ ও বহির্জগতে পাকা ফলের মত পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে—তখনই সেই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। পরাধীনতা অথবা একটি দেশের ওপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন, সেই দেশের অবস্থার অবনতির আভাষ দেয়। অবস্থার অবনতি না ঘটলে অথবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেশের তুলনায় শাসিত দেশের অবস্থার যদি অবনতি না ঘটে তাহলে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন কখনই সম্ভব হয় না। স্বাধীনতা পেতে হলে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আসল কথা, একটি দেশ অন্য দেশকে উপহার হিসেবে স্বাধীনতা দেয় না। পরাধীন দেশকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়।

ভারতের সেই অবস্থা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে য়ুরোপীয় শক্তির জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। সেই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ একাধিপত্য স্থাপিত হবার পথ খুলে যায় আর ভারতীয় ইতিহাসের অধঃপতনের অধ্যায় শুরু হয়। পাঞ্জাবে তখনও শিখ আন্দোলন বেঁচে ছিল আর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে মারাঠী আন্দোলন। এ ছাড়া ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী বা তার পরবর্তী শতাব্দীতে জীবনীশক্তির কোনো স্ফুলিঙ্গ চোখে পড়েনি। কখনও কখনও হায়দার আলী অথবা টিপু সুলতানের মত কোনো বীর ভারতীয় নৃপতি বিদেশীদের বিরুদ্ধে বীরদর্পে যুদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু দেশের বেশীর ভাগ অংশের জনগণ ছিল

নির্বিকার। স্থানীয় নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য লেগেই থাকতো। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিদেশী শক্তির ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জানাতে অসমর্থ ছিলেন। এমন কি ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্ভাবনার কোনো উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির আভাস পাওয়া যায়নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লব য়ুরোপের চেহারা পাল্টে দিলেও ভারত পিছনে পড়ে থাকে। কারণ ভারতে তখনও চিরাচরিত পদ্ধতিতে কৃষি কাজ হতো এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়ত শিল্পে সে নিজের হাতের গুণকেই বিশ্বাস করতো।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে নবজাগরণ আসে। নব জাগ্রত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে তখন প্রযুক্তিবিদ্যার যুগের সূচনা। তার সংস্পর্শে এসে ভারতের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য জীবন ও চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এলেন—তাঁরা আর নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারলেন না, ভেসে গেলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছ থেকে যা শিখবার ছিল—বেশ কিছুদিন পরে তা নিজের করে নেবার পর ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যিকারের নবজাগরণের আন্দোলন শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ও দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে এমন কয়েকজন কৃতী মানুষের জন্ম হয়, যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁরা এমন সব আন্দোলনের সূচনা করেন যা সাময়িক নৈরাশ্য ও হতাশার থেকে দেশকে উত্তরণের পথ দেখাতে পেরেছিলো। তার পূর্বেকার শতাব্দীর চেহারা ছিল হতাশা ও নৈরাশ্যে ভরা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আন্দোলন চললো বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত। যে আন্দোলন নিয়ে এলো ভারতের স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারত আত্মপ্রকাশ করলো।

যে দেশের গর্ব করার মত প্রাচীন ঐতিহ্য আছে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্দোলনে রমেশ দত্ত কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন? রমেশ দত্ত হয়তো পথিকৃৎ

ছিলেন না। কিন্তু তাঁর আগ্রহ বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত ছিলো। আর এতে তাঁর অবদানও ছিল উল্লেখযোগ্য। এইসব ক্ষেত্রে তখন কতটা উন্নতি হয়েছিল? তাতে রমেশ দত্তের অবদান ছিল কতটুকু? ভবিষ্যতের উন্নয়নে সেই অবদান কতটা সহায়ক হয়েছিল—এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি যেসব বিষয়ে চিন্তা ও কাজ করেন, সংক্ষেপে সেসব কথা বলতে হবে।

খ

সরকারী চাকুরে হিসেবে রমেশ দত্ত প্রকৃতই একজন প্রশাসক। অতীতে ভারতে অনেক যোগ্য প্রশাসক জন্ম গ্রহণ করেছেন কিন্তু ব্রিটিশ শক্তির অভ্যুত্থানের পরে নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলি ছাড়া প্রশাসনিক বিভাগের দরজা ভারতীয়দের জন্য বন্ধ ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ইংলণ্ডের রাণী শাসনভার গ্রহণ করে যে ঘোষণাপত্র জারি করেন—তাতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে মহামান্য রাণীর প্রজাদের সমানভাবে দেখা হবে। কিন্তু নীতির সঙ্গে বাস্তবের অনেক তফাৎ। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতের সর্বোচ্চ সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশ করা অত সহজ ব্যাপার ছিল না। সুতরাং দায়িত্বশীল পদের প্রকৃত ক্ষমতা ও আস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা শুধু ইংলণ্ডেই হতো। এটাইতো এক গুরুতর বাধা। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল যাতে বিদেশে যাবার সুযোগ খুব কম ভারতীয় পেতেন। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষাটা হতো এমনভাবে যে, ভারতীয়দের পক্ষে সুবিধে করে ওঠা মুশকিল ছিল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে রমেশ দত্ত ও তাঁর বন্ধুরা কৃতকার্য হবার আগে মাত্র একজন ভারতীয় এই সার্ভিসে যোগ দিতে সক্ষম হ.য়ছিলেন কেন তা সহজেই বোঝা যায়।

সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবার পরেও ভারতীয়দের পক্ষে এগিয়ে যাবার পথটা

খুব নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ ছিলনা, বিশেষ করে রমেশ দত্তের মত কেউ যদি নির্ভীকভাবে নিজের মতামত পেশ করতে চাইতেন। হতে পারে সরকারী বাধা নিষেধের সীমা তিনি লঙ্ঘন করতেন না। তবে তিনি কার্যনির্বাহক দায়িত্ব বেছে নিলেও রাজ্যের তরফ থেকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য ভারতীয়েরা প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ—সে সময় এরকম একটা অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল। অনেকেই এটা সরলভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই রমেশ দত্তকে যখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত করা হয় তখন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহলে তা নিয়ে বিস্ময় ও শোকের ছায়া নেমে আসে। সে ইতিহাস আমরা আগেই জেনেছি। রমেশ দত্ত তাঁর স্বাধীন মতামত ও কর্মনিষ্ঠা দেখিয়ে ভারতীয়দের পক্ষে এত বড় একটা মানসিক বাধা যে কাটাতে পেরেছিলেন এটা তাঁর কম কৃতিত্ব নয়। তিনি ডিভিশনাল কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত হন। এর আগে আর কোনো ভারতীয় এত বড় সম্মানিত পদ পাননি। তাঁর প্রশাসনিক কর্মদক্ষতার জন্য তিনি তদানীন্তন সরকারের প্রশংসা পান। এভাবে তিনি ভারতীয় উত্তর সূরীদের ক্ষমতা ও দায়িত্বশীল পদে উন্নীত হবার পথ করে দেন। এর ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল ভারতীয় প্রশাসক গড়ে উঠেছিলেন যাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারত স্বাধীন হবার পর স্বাধীন ভারতের জন্য প্রচুর কাজ করেছিলেন। এর চেয়ে বড় লাভ রমেশ দত্ত ও তাঁর ভারতীয় উত্তরসূরীরা প্রশাসন বিভাগে সফলতার সঙ্গে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেন। শাসিত দেশের মানুষ বলে ভারতীয়দের মনে যে হীনমন্যতা ও দুর্বলতা জেগেছিল তাঁদের এ যোগ্যতা দেখে সে ধারণা অনেকটা পালটে যায়। তাঁদের মনে এ আত্মবিশ্বাস জাগানো সবচেয়ে বড় লাভ।

পরবর্তীকালে বরোদায় রমেশ দত্ত যে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তা তাঁকে প্রশাসনের উন্নততর ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ

এনে দেয়। এতে সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতীয়দের সুযোগ দিলে, তাঁরা প্রশাসনের উন্নততর দায়-দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে পারেন এবং সে যোগ্যতা বিদেশী শাসকদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরোদায় প্রশাসনিক বিভাগে প্রগতিশীল সংস্কারসাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে রমেশ দত্ত এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনের চেয়ে ভারতীয়রা যদি তাঁদের নিজেদের দেশ শাসন করেন, তাহলে তা জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজনে অনেক বেশী সাড়া দিতে পারবে।

গ

পরিণত বয়স পর্যন্ত প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পালন করতেই তাঁর বেশীর ভাগ সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবু আমরা দেখেছি, তাঁর এই কর্মব্যস্ত জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি কত উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। সবচেয়ে বেশী যে বিষয়ে তিনি পরিশ্রম করেন এবং যে কর্মসাধনাকে তিনি জীবনের 'প্রথম-প্রেম' বলে ভাবতেন—তাহল সাহিত্য। উপন্যাস, ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ, প্রাচীন ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস—এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে হলেও তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির চিরায়ত মূল্য আছে বলে মনে করা হয়। সমকালীন অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর বহুবিধ রচনা তো আছেই। এইসব বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অবদান কত মূল্যবান, তার সম্যক ধারণা যদি আমরা করতে চাই, তবে আমাদের প্রত্যেকটি বিষয় আলাদা আলাদাভাবে বিচার করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে, যে বিষয়ে তিনি অবদান জুগিয়েছেন, সেই সময়ে প্রত্যেকটি বিষয়ে কতটা কাজ হয়েছিল, চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে কতটা উন্নতি হয়েছিল এবং পরবর্তীকালেই বা তার কতটা বিকাশ হয়।

প্রথমে আমরা বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করবো। মনে রাখতে হবে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক অবদানের ফলে বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে মর্যাদা হয়েছে, রমেশ দত্তের সময়ে বাংলা

ভাষার সে গৌরব ছিলনা। আধুনিক বাংলা গদ্য রচনা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্যরচনা থেকেই এ অধ্যায়ের সূচনা। উনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী বছরগুলিতে অবশ্য বাংলাদেশে বহু স্বনামধন্য সাহিত্যিকের জন্ম হয়। তাঁদের অবদান শুধু গদ্যতে নয়, পদ্যতেও স্মরণীয়। এই অবদানের পিছনে অনুপ্রেরণার উৎস ছিল নবজাগরণের চেতনা—লেখার নতুন ভঙ্গি ও প্রকাশ-ক্ষমতার নব সূচনা, বিশেষ করে কবিতার জগতে। নতুন নতুন চিন্তার নির্ভীক প্রকাশ ঘটলো। কবিতার জগতে এরকম একজন নির্ভীক স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি বাংলা কবিতায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূচনা করেন। মধুসূদনের কাব্য চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ। নিঃসন্দেহে মিলটন ও বায়রনের মত মহান ইংরেজ কবির প্রভাব পড়েছিল তাঁর কাব্যরচনায়। সমকালীন অন্য একজন দিকপাল সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বয়সে যদিও তিনি রমেশ দত্তের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস, 'আনন্দমঠ'—সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লেখা—যার বিষয়বস্তুর আবেদন পরবর্তী যুগের মুক্তি-সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিরস্মরণীয় গান 'বন্দে মাতরম' বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক নবজাগরণের প্রতীক। বাংলা সাহিত্যে রমেশ দত্তের প্রথম নিবেদন ইংরেজী ভাষায় লেখা তাঁর বই, 'বাংলার সাহিত্য'। ছাপা হয় ১৮৭৭ সালে। বিংশ শতাব্দী থেকে নিয়ে রমেশ দত্তের সময়কাল পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। বাংলা সাহিত্যের যে একটা ইতিহাস থাকতে পারে এবং সেই ইতিহাস দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাস—এটা জেনে বিদেশীরা যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, তেমনি অনেক ভারতীয়ও। তিনি এই ইতিহাসকে তিনটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায়ে ভাগ করেন—জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতিকাব্য; প্রাচীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যাদির রচনাকাল—যে কালের পুরোধা ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব, কৃত্তিবাস

এবং কাশীরাম দাস এবং আধুনিক কাল—যে যুগের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায় এবং আরও বহু মেধাবী লেখক। রমেশ দত্ত তাঁর বাংলা উপন্যাস রচনা করে তাঁদের সমগোত্রীয় হতে চান। তিনি লিখেছেন চারটি ঐতিহাসিক এবং দুটি সামাজিক উপন্যাস। 'বঙ্গ বিজেতা' এবং 'মাধবী কঙ্কনের' বিষয়বস্তু আকবরের বাংলা বিজয়কে কেন্দ্র করে রচিত। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' এবং 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'—এই দুটির বিষয়বস্তু মারাঠা শক্তির উত্থান ও রাজপুত শক্তির পতন। এইসব ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য ছিল শুধু যে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ তাই নয়, তিনি এর মধ্যে দিয়ে ভারতের অতীত যুগের নর-নারীর বীরত্ব, সাহস ও মহত্ব তাঁর স্বদেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর দুটি সামাজিক উপন্যাস, 'সমাজ' এবং 'সংসার' একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখেন। একটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু পুনর্বিবাহ ও অন্যটির অসবর্ণ বিবাহের তাৎপর্য ও উপযোগিতা।

রমেশ দত্ত, পূর্বসূরী বঙ্কিম চন্দ্রের মত হয়তো অতটা কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি কিংবা তাঁর উত্তরসূরী, ও বিংশ শতাব্দীর নামী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত অতটা সফলতাও হয়তো অর্জন করতে পারেননি। তবুও বাংলা সাহিত্য যখন গড়ে ওঠার পর্যায়ে, তখন সাহিত্য জগতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। এরফলে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথ সুগম হয় এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অত নামী না হলেও উল্লেখযোগ্য অনেক কৃতী সাহিত্যিক তাঁদের অবদান জুগিয়ে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের পর্যায়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সহায়ক হন।

বাংলা সাহিত্য জগতে রমেশ দত্তের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান 'ঋগ্ বেদের' অনুবাদ। এ কাজ শেষ হয় ১৮৮৫ সালে। এটা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অন্য দিক। মহাকাব্যগুলি তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। 'লেজ্ অফ এন্‌সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' এবং তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'হিস্টরি অফ সিভিলিজেশন

অফ এন্‌সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া', বাংলা ভাষায় ঋগ্‌দেবের অনুবাদ—অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি এইসব গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হন। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের গৌরবময় দিকটা তিনি এসব গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে বর্তমান যুগের ভারতীয়দের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এসব বই তারই প্রমাণ। পুরোনো যা কিছু সব ভাল—সেরকম কোনো অন্ধবিশ্বাস রমেশ দত্তের ছিলনা। তিনি পুনরভ্যুদয়ের সমর্থক ছিলেন না তবে ইতিহাসবেত্তার মত ধারাবাহিকতার তাৎপর্য বুঝতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, বর্তমানের শিকড় অঙ্কুরিত রয়েছে অতীতের গর্ভে। মধ্য যুগে হিন্দু ধর্মে ও হিন্দুদের সামাজিক জীবনে যে নানা রকম অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামী দানা বেঁধে উঠেছিল—রমেশ দত্ত তাঁর সামাজিক জীবনে সেসব অনেক গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল ভেঙ্গে ফেলেন। ভারতে নবজাগরণের ঢেউ এসে লাগুক—তাঁর এই আপসহীন মতবাদে তিনি অবিচল ছিলেন, অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন নিজের চিন্তাধারা ও বিচারশক্তি এবং প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও আচার ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ থেকে। ভারতের এই রীতিনীতি, আস্থা ও বিশ্বাস এবং সর্বোপরি ধ্যানধারণার পিছনে রয়েছে সত্য, রয়েছে যুক্তি। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে নানাভাবে মিশলেও তার পরিবর্তন হয়নি। বিনা বিচারে প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি আনুগত্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, সে ইতিহাস যত গৌরবোজ্জ্বল হোক। তিনি জানতেন মানুষের চিন্তাধারার অনবরত বিকাশ ঘটছে। ব্যক্তি জীবনে যেমন, তেমনি একটি দেশ—বিকাশ-ধারার এই নিগুঢ় রহস্য যদি উপেক্ষা করে, তবে নিজেরই বিপদ ডেকে আনে। অন্যদিকে, সভ্যতা কিংবা মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বাইরেকার ব্যাপার নয়; বাইরে থেকে তা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। মানুষের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত গুণাগুণের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিবেশেই মানুষের বৈশিষ্ট্য ও গুণ বেড়ে উঠতে পারে। একটি দেশের

জনগণের ঐতিহ্য তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাবে কিনা, তা না ভেবে যদি নির্বিবাদে আমরা কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা ও মতবাদকে গ্রহণ করি—সেটা অবিবেচনার কাজ। অর্থাৎ ধারণা ও মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে বলেই যে তা গ্রহণ করতে হবে এর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে সহায়ক হবে এমন যুক্তিবাদী মতবাদ ও বিশ্বাস যদি গড়ে তুলতে হয় তাহলে সেই দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। ভারতের মত দেশের পক্ষে এটা আরও প্রযোজ্য কারণ ভারত তার প্রাচীন সভ্যতা ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে পারে। সেই প্রাচীন সভ্যতার যুগে ভারতে এমন সব কৃতী পুরুষের জন্ম হয়েছিল যাঁরা চিন্তাশীল ও সংস্কৃতির জগতে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। তাঁরা ছিলেন সে যুগের অতুলনীয়। প্রাচীন ঐতিহ্যে যদি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থাকে এবং ঐতিহ্যের মূলগত বিষয়ে যদি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠতে পারে তাহলে সে দেশের জনগণের সামনে ভবিষ্যৎ উন্নতির একটা যথার্থ চিত্র তুলে ধরা যায়। কারণ কৃষ্টির ছাপ জনসাধারণের চিন্তাধারার ওপর পড়বেই—তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক।

এই কারণেই রমেশ চন্দ্র জনগণের সামনে অতীত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের চিত্র ফুটিয়ে জনগণের মনে একটা নতুন আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস জাগাতে চান এবং এ-সম্বন্ধে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ একটা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলায় ব্রতী হন।

তিনি যেমন বাংলাতে ঋগ্‌বেদ অনুবাদ করেন, তেমনি ইংরেজী কাব্যছন্দে অনুবাদ করেন রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ সালে। মহাভারত ১৮৯৯তে। এর আগে ১৮৯৪ সালে ইংরেজী কাব্যে তিনি প্রকাশ করেন 'লে্জ অফ্ এন্‌সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া'। উপনিষদের বিখ্যাত শ্লোকগুলি যেমন এই বইটিতে স্থান পেয়েছে তেমনি পেয়েছে অশোকের স্তম্ভে খোদাই করা অনুশাসন এবং ক্ষুদ্র মহাকাব্য 'ভৈরবী'র দু'চার কথা। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর 'হিস্টরি অফ

সিভিলিজেশন ইন এন্‌সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' বইখানি। বইটি লেখেন ১৮৮৯-৯০ সালে। তিনি নিজেই বলেছেন যে, এতে তিনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি অথবা প্রাচ্য গবেষণা ও বিদ্যাচর্চার যে সীমা তাও কি তিনি প্রসারিত করতে সক্ষম হননি। নিজের মুখে একথা বললেও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যে জ্ঞানের ভাণ্ডার একদিন শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদের কাছে সীমাবদ্ধ ছিল, রমেশ দত্তের এই বইটি প্রকাশের পরে ভারতের ঐতিহ্যে আগ্রহশীল ছাত্ররা এর থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

ইংরেজীতে এইসব বই লেখার সময়ে রমেশ দত্ত শুধু নিজের দেশের কথাই ভাবেননি, ভেবেছেন বৃহত্তর দুনিয়ার বিদগ্ধ সমাজের কথা। অতীত ভারত সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের খুবই আগ্রহ ছিল। অধ্যাপক ম্যাক্স মুলারের মত প্রাচ্যবিদ প্রচুর কাজও করেছেন এবং অতীত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আধুনিক ভারতীয়দের কাছে উদঘাটন করেছেন। ভারত সম্পর্কে এই অগাধ জ্ঞান শুধু কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ও সামান্য কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্বের বিরাট জনসমাজের কাছে, বিশেষ করে পশ্চিমী দেশগুলির মানুষের কাছে, ভারত ছিল অদ্ভুত একটি দেশ, উদ্ভট কল্পনার দেশ, বিচিত্র রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার অজ্ঞতায় ভরা অন্ধকারের দেশ। সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ। অথচ পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশ যখন অনুন্নতির অন্ধকারে, তখন ভারতেই গড়ে উঠেছিল এক গৌরবময় সভ্যতা। সেই সভ্যতার যুগে ভারতে জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে যেসব বই রচিত হয় সেগুলি কালজয়ী হয়েছে। আজকের উন্নত দেশগুলির চেয়েও ভারতের সেই উল্লেখযোগ্য ইতিহাস কম স্মরণীয় ছিল না। কিছু কালের জন্য ভারতের অধোগতি হলেও নবজাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। সেটা পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে অজানা ছিল। ভারত সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের, বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের, সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

ভারতের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে এই অজ্ঞতা দূর করবেন এবং বিশ্বের দরবারে ভারতের যোগ্য আসন প্রতিষ্ঠা করবেন এটাই ছিল রমেশ দত্তের উচ্চাশা। কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সাহিত্য রচনা করে যতটুকু উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব—রমেশ দত্ত নিশ্চয়ই ততটুকু করতে সফল হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে তিনি অনুরাগী করে তুলতে সফলকাম হয়েছিলেন ; শুধু তাই নয় তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে বিদেশে ভারত সম্পর্কে একটা অনুকুল ধারণা গড়ে ওঠে।

ঘ

রমেশ চন্দ্রের জীবনের শেষের বছরগুলি, বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে তিনি যখন অবসর নেন, তখন তিনি দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক কর্মসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সরকারী পদে বহাল থাকার সময় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন, 'বেঙ্গল পেজান্ট্রি' অর্থাৎ 'বাংলার কৃষক সম্প্রদায়'। বইটি সকলের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করে কারণ তিনি সরকার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বার্থ তুলে ধরেন। জমিদারদের মধ্যে তিনি একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চান কারণ তাতে কৃষকদের কতটা অধিকার ও দায়-দায়িত্ব তা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হতে পারবে। পরে সরকারী পদে বহাল থাকার সময় তিনি সরকারের কাছে যে সব রিপোর্টসহ মন্তব্য পেশ করতেন, তাতেও তিনি একটা প্রগতিশীল ভূমিস্বত্ব আইনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতেন। অত্যধিক হারে জমির খাজনা আদায় করার ব্যবস্থা তাঁর মনঃপূত ছিলনা। অগ্রক্রয়াধিকারের ভিত্তিতে সরকার যে জমি নিজের হাতে নিয়ে নিতেন তাও তাঁর অপছন্দ ছিল। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদও জানিয়েছেন। সরকারী কাজ থেকে অবসর নেবার পরেই তিনি অর্থনীতিকে আন্তরিকভাবে গবেষণার বিষয়বস্তু করে তোলেন। চাকরী থেকে অবসর নেন ১৮৯৭ সালে। ১৯০৪ সানে দায়িত্ব নেন বরোদা প্রশাসনিক বিভাগের।

সাত বছরের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে রমেশ দত্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর প্রথম বই 'ইংলণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে; দ্বিতীয় বই 'ভারতে দুর্ভিক্ষ', প্রকাশকাল ১৯০০ সাল। লর্ড কার্জনকে লেখা তাঁর পাঁচটি খোলা চিঠি এই বইটিতে স্থান পেয়েছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস'। দুই খণ্ডের বই; প্রথম খণ্ড বের হয় ১৯০২ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯০৪ সালে।

এই তিনটি বই আর বিভিন্ন জায়গায় তিনি যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন, নানা সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর যেসব প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, সেগুলি, ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় বহন করছে। পরবর্তীকালের চিন্তাধারার বিবর্তনেও তাঁর অবদান নেহাৎ কম ছিল না। এইসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমরা আগেই পরিচয় পেয়েছি। এখানে একটি বিষয়ে আবার জোর দিয়ে বলা যায় যে, ভারতের অর্থনীতির চিন্তা জগতে তাঁর প্রধান অবদান ছিল এই যে, তিনি ভারতের সমস্যাবলীকে শাসকের চোখে দেখেননি, দেখেছেন একজন ভারতীয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে। এইটাই একমাত্র সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গী। এই সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে যেসব প্রবন্ধ ও লেখাপত্র চোখে পড়তো, সেগুলিতে প্রতিফলিত হতো শাসকদের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থনৈতিক নিবন্ধ ও লেখাপত্রে এইটাই দাবী করা হতো যে, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ফলে ভারতের অগ্রগতি হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ দেখানো হতো যে, রেলপথ স্থাপিত হওয়ায় দেশের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, সমগ্র দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির পথ খুলে যাচ্ছে। এই সুবিধাজনক আপেক্ষিক মতবাদের সত্যতার বিরুদ্ধে রমেশ দত্ত প্রতিবাদ জানান। তিনি অবশ্য একথা মেনে নেন যে, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ফলে ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রেলব্যবস্থা চালু হওয়ায় দেশের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, রেল ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে ব্রিটিশ মূলধন দিয়ে। সেই মূলধনের প্রাপ্ত লাভ সম্পর্কে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। তিনি এই যুক্তি দেখান যে দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না রেখেই রেল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ব্রিটিশ মূলধনকে কাজে লাগানোই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। রমেশ দত্তের প্রতিবাদের প্রধান বিষয় ছিল এই যে, বিশ্বের সভ্য দেশগুলির মধ্যে ভারতই হলো একমাত্র দেশ যেখানে বারবার দুর্ভিক্ষ হয়। এর একমাত্র কারণ অত্যধিক হারে জমির খাজনা নেওয়া হয়। তার ফলে স্বাভাবিক অবস্থাতেই কৃষকদের হাতে সহায়সম্পদ থাকে না। বন্যা বা খরার সঙ্কটের দিনে কৃষকরা প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে না। সরকারী খরচপত্র, বিশেষ করে ব্রিটিশ আগ্রাসী নীতির ফলে ভারতের সীমান্তে মোতায়েন সৈন্যদলের জন্য সরকারী খরচপত্রের বিরুদ্ধে, তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন রাখার জন্য ভারত সরকারের ব্যয়ভারের তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল থেকে শুরু করে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রশাসন সম্বন্ধে রমেশ দত্ত যে সমীক্ষা করেছেন, তাঁর সে অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'অর্থনৈতিক ইতিহাস' এই নামে লেখা দুই খণ্ড বইয়ে তিনি ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রারম্ভে ভারতীয় শিল্পকে নিরুৎসাহিত করার নীতির ফলে ভারতীয় শিল্পের কিভাবে অবনতি ঘটলো—সেই ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে ব্রিটিশ দ্রব্যের যাতে কোন রকম প্রতিযোগিতায় নামতে না হয় সেটাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। রমেশ দত্ত আরও বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পিছনে ব্রিটিশ শাসকদের এই অভিপ্রায় ছিল যে ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করার কেন্দ্র হিসেবে ভারতকে গড়ে তুলতে হবে।

ব্রিটেনে ষ্টিম ইঞ্জিন চালু হবার পর থেকে এই নীতি প্রচলন করা খুব সহজ হয়ে যায় এবং কিছুটা সম্মানের সঙ্গেই তা করা সম্ভব হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের নীতি হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে অবাধ বাণিজ্যের নীতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। এই অবাধ বাণিজ্যের নামে ভারতের অবস্থার সঙ্গে এ নীতি ঠিক খাপ খাবে কিনা তা না ভেবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসকরা এ দেশের হাতেগড়া শিল্পকে অযৌক্তিক প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিলেন এবং ভারতীয় শিল্পকে প্রতিযোগিতা করতে বলা হলো ইংলণ্ডের এমন সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেগুলি যন্ত্রচালিত। ইংলণ্ডের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ নিঃসন্দেহে বেড়ে যাচ্ছিল কিন্তু রমেশ দত্ত সেখানেও একটা কথা বলেছেন। সেই সময় যে ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য চলছিল তা যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে ভারতের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির কোনরকম প্রতিফলন তাতে ঘটেনি।

যাকে 'হোম-চার্জ' বলা হতো, সেই খাতে প্রতি বছরে ভারতের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছিল। রমেশ দত্ত সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটাই তাঁর অন্য অবদান। তিনি 'ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাস'-এ এরকম একটা হিসাব তুলে ধরে বলেছেন যে, ১৯০০-০১ সালে ভারতের ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল সাড়ে সতেরো মিলিয়ন অথচ সেই বছরেই হোম চার্জের পরিমাণ দাঁড়ায় সতেরো মিলিয়ন। তিনি ন্যায্যত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, "ভারতের সব কটি প্রদেশের ভূমি থেকে যে পরিমাণ খাজনা তোলা হয় তা বছরে বছরে 'হোম চার্জ' হিসেবে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। য়ুরোপীয় অফিসাররা ভারতীয় রাজস্ব থেকে তাঁদের মাইনেপত্র সংগ্রহ করার পরও ব্যক্তিগত ভাবে অতিরিক্ত কয়েক লক্ষ টাকা স্বদেশে পাঠিয়ে দেন। ভারতে যত বেশী সংখ্যক য়ুরোপীয় অফিসারকে নিয়োগ করা হবে তত বেশী বাড়বে বিদেশে অর্থ পাঠাবার তাগিদ।"

ভারতের ঋণের পরিমাণ সম্পর্কেও রমেশ দত্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রমেশ দত্ত বলেছেন, "১৮৫৮ সালে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর ভারতের শাসক রইল না, তখন ভারতের ঋণ জমে জমে ৭০ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে অন্যায় বলে বিবেচিত হলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেড়শো মিলিয়নেরও বেশী বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর ভারত থেকে আদায় করে নিয়েছিল এবং সুদ ছাড়াই এত অর্থ। ভারতের বাইরে যেসব যুদ্ধ হয়েছে, যেমন আফগান যুদ্ধ, চীনের যুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধ, সে সবের জন্য যা খরচপত্র হয়েছে তারা সে অর্থ বশ্যতা স্বরূপ কর রূপে সংগ্রহ করেছে। সুতরাং কোম্পানীর শাসনকাল শেষ হবার পরেও ন্যায্য দৃষ্টিতে ভারতের তরফ থেকে কোনরকম কর্জ ছিল না। ভারতের জনসাধারণ ঋণগ্রস্ত একথা বলা খুবই অর্থপূর্ণ। কারণ যে অর্থ ভারতের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তার উদ্বৃত্ত হিসেবে জমা ছিল একশো মিলিয়নেরও বেশী।" তিনি একথাও জানতে চেয়েছিলেন, ১৮৫৮ সালে ঋণের পরিমান ছিল ৭০ মিলিয়ন এবং ১৮৭৭ সালে তা দ্বিগুণ এবং ১৯০০ সালে তা ২২৪ মিলিয়নে বেড়ে গিয়েছিল কী করে? তিনি পরিসমাপ্তিতে বলেন যে, ভারতের ঋণের ইতিহাস সত্যিই "আর্থিক অবিবেচনা ও অবিচক্ষণতার দুর্ভাগ্যজনক নিদর্শন এবং যেকোনো নিঃস্বার্থ পাঠক নিজেই হিসেব করে নিতে পারেন যে, নৈতিক দিক থেকে ভারতের কতটা ঋণের বোঝা আছে।"

জোরদার অভিযোগ। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের "ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির" স্বপক্ষে এত তর্কবিতর্কের জালে পড়ে ভারতের জনগণ আসল সত্যটাই জানতো না। এই সত্য তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। ভারতকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই রমেশ দত্তের সবচেয়ে বড় অবদান। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আর্থিক দিক সম্বন্ধে তিনি প্রকৃত চিত্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। ভারতের কৃষকদের দেয় খাজনার অতিরিক্ত হার থেকে শুরু করে,

ভারতের শিল্প কিভাবে ও কি কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ভারতের জনসাধারণের অর্থ বাইরে কেন চলে যায় এবং ভারতের স্বার্থে ভারতের ঋণের বোঝা বাড়ে কেন আবার সেই অর্থ দিয়ে বিদেশে যুদ্ধের খরচ মেটানো হয়—এসব নানা বিষয়ে রমেশ দত্ত আসল সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। বিদেশী শক্তির শাসনব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ কী সে সম্বন্ধে ভারতকে সজাগ করে তুলতে রমেশ দত্ত বিশেষ অবদান যোগান। নিজে বুঝে তিনি জনসাধারণকে বুঝেয়েছিলেন যে, আর্থিক সূত্র ও নিয়ম অন্য দেশে যেভাবে কার্যকর হয়—ভারতেও ঠিক তেমনি। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী যে আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছেন, তাতে ভারত যে দুর্ভিক্ষের ও আপ্রাচুর্যের দেশ হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

রমেশ দত্ত অর্থশাস্ত্রের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে মাথা ঘামাননি ; তাই তিনি নতুন নতুন অর্থনৈতিক সূত্র বার করতে আগ্রহী ছিলেন না। ভারতের ফলিত অর্থ-নীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল বেশী। তিনি ভারতের চলতি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারেই মন দিয়েছেন বেশী। ব্রিটিশ শাসনের অর্থনীতি তিনি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করে ভারতের দারিদ্র্যের সঠিক কারণ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাপারে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রেই এ অবদান যে সার্থক হয়েছে তাই নয়, অধ্যাপক গ্যাডগিল যা বলেছেন, তাও উল্লেখ্য।

উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ মূলত এক ও অভিন্ন তা সে উপনিবেশবাদ যেখানেই প্রচলিত হোক। অধ্যাপক গ্যাডগিলের এ অভিমত পরবর্তীকালে উপনিবেশবাদের অর্থনীতি নামে পরিচিত হয়। রমেশ দত্ত প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ভারতে যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা মূলতঃ উপনিবেশ-বাদের অর্থনীতির রূপান্তর। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি বা তার পুনর্গঠন সম্পর্কে রমেশ দত্ত কোন রূপরেখা রচনা করেননি। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতির রূপরেখা রচনা করার সময়ও তখন আসেনি। রমেশ দত্তের কর্মসাধনার

যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। পরিকল্পনা ও সমাজবাদের যুগ তখনও আসেনি। তাই তিনি যা চেয়েছিলেন তা হলো অর্থনৈতিক সমতা ও ন্যায় বিচার। ভূমির খাজনা ন্যায্য ভিত্তিতে নির্ধারণ, ভারতীয় শিল্পের উৎসাহদান এবং এরজন্যে শুল্ক ব্যবস্থার সমীক্ষা, সরকারী খরচপত্রের ব্যয়সঙ্কোচ, বিশেষ করে ভারতের স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করে যা অপ্রয়োজনীয় খরচ তা হ্রাস করা এবং ভারত ও ইংলণ্ডের সঙ্গে একটা নতুন আর্থিক সম্পর্ক স্থাপন—এই ছিল তাঁর দাবী। উপনিবেশ-বাদের তখন জোয়ার বইছে। ওরকম একটা সময়ে তিনি নির্ভীকভাবে বিশ্লেষণ করে যে তথ্য সরবরাহ করেন তা যদি আমরা বিচার করে দেখি তবে বুঝবো তাঁর অবদান কত গভীর, কত ব্যাপক। প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যে ঘৃণ্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে—তার জন্য যদি সত্যি কারুর কৃতিত্ব থেকে থাকে তবে তা রমেশ দত্তের মত সেইসব মানুষের, যাঁরা উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও অনুশীলন করে উপনিবেশ-শাসিত অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে সক্ষম হন।

৬

আধুনিক বিশ্বে রাজনীতির হাতে অর্থনীতির জন্ম। আর্থিক ব্যবস্থাই একমাত্র না হলেও ইতিহাসের প্রধান প্রেরণা—কার্ল মার্কসের এই অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি, আবার নাও পারি। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা যে ঘটনার বিবর্তন নিয়ে আসে এবং অপরদিকে রাজনীতির প্রভাব এসে পড়ে তার ওপর—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগ এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার আর্থিক প্রশাসনে তাঁর আগ্রহ তাঁকে যে রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতিতে তাঁর আগ্রহ তাঁকে রাজনীতির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো, উল্টোটা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত ঘটনা বলে গৃহীত হয়েছিল। এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি কারণ একে তিনি অন্যায় বলে মনে করতেন না। বরঞ্চ তাঁর মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল একটা চমৎকার প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা ভারতের ওপরে যে অর্থনৈতিক অবিচার করছিল, সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কিন্তু ভারতের প্রশাসন বিভাগে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার অভাবে এই অবিচার ঘটেছে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে এমন সব প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার প্রয়োজন ছিল যাঁরা সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারবেন। তাই প্রশাসনের সর্ব স্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপরে তিনি জোর দিয়েছেন। তারজন্য কাজও করেছেন। যেসব সিদ্ধান্ত দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য খুবই জরুরী সে সব বিষয়ে যাতে ভারতের বক্তব্য শোনা হয় তার জন্যই তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না।

সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নেবার পরই রমেশ দত্ত সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ নেন। অবশ্য অবসর নেবার আগেও তিনি সরকারের কাছে যেসব রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গড়ে তোলার তাৎপর্য সম্পর্কে বিনা দ্বিধায় নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশের সরকারের এক রিপোর্টে রমেশ দত্তকে, "স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার একজন বড় সমর্থক" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কয়েকটি গ্রামকে একত্র করে তাতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চালু করা হোক—এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য, কারণ এটা করা হলে, প্রশাসনের সাধারণ দায়-দায়িত্ব তাদের ওপর যেমন ছেড়ে দেওয়া যাবে, তেমনি আবার ন্যায্য প্রশাসনের দায়িত্বও দেওয়া চলবে। বেসরকারী চেয়ারম্যানের অধিনায়কতায় তিনি বিভিন্ন জেলা পর্ষদ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব করেন। জেলা অফিসররা বিভিন্ন জেলায় যে এক নায়কের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন এতে তাঁর খুব আপত্তি

ছিল। তিনি বলেছেন, একজন জেলা অফিসার একই সঙ্গে অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন আবার তিনি একই মামলার বিচার করেন। বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে আলাদা করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, জেলা প্রশাসন বিভাগের অভিপ্রায় যত শুভ হোক—কল্যাণ করার চেষ্টা সে যতই করুক—যদি সেই প্রশাসনের দায় দায়িত্ব পালনে লোকেদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাবার চেষ্টা না করে তাহলে সে প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের সমর্থন সহানুভূতি থাকতে পারে না।

১৮৯৭ সালে চাকরী থেকে অবসর নিয়ে রমেশ দত্ত প্রাদেশিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। সময়টা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। তখন দেশের সর্বত্র আমূল সংস্কারবাদের হাওয়া বইছে··· যা পরে "চরম পন্থীদের" মতামত বলে পরিচিত হয়। বঙ্গভঙ্গ তখনও হয়নি, যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা তরুণ ছিলেন তাঁরা তখন নিজেদের মতামত জোর দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন। জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় তখন তাঁরা উদ্বুদ্ধ। ভারতের পরাধীনতায় তাঁরা তখন অশান্ত, অধৈর্য। যে কোন উপায়ে ভারতকে স্বাধীন করতে হবে—এই তাঁদের পণ। চরমপন্থীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন বাল গঙ্গাধর টিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল এবং শ্রীঅরবিন্দ। "আবেদন, প্রার্থনা ও বিনম্র প্রতিবাদে" কোন ফল হয়না—সেটাই তখন তাঁরা ভাবছেন। প্রতিবাদ জানাবার এই বিনম্র পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা সন্দিহান ও অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তাঁরা চাইলেন জাতীয় আন্দোলনের গতি আরও ত্বরান্বিত হোক। রমেশ দত্ত এই দলে ছিলেন না। সেদিন যাঁদের আমরা "মধ্যপন্থী" বলতাম, তিনি ছিলেন সেই দলের মানুষ। তাঁরা তখনও বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ভারতের সত্যিই কল্যাণ হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতকে যদি স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা দেওয়া

হয় তাহলে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তাঁদের তখনও এই অভিমত—ব্রিটেনের শ্বেতকায় উপনিবেশ, যেমন ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড—তাদের মত ভারতের যদি স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা থাকে—তাহলে ভারত এগিয়ে যেতে পারবে। ভারতকে স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা দেবার তিনিও পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় পর্যায়ক্রমে এ স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা আসুক—এটাই তাঁর বক্তব্য ছিলো। সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা বা তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার যৌক্তিকতায় তাঁর আস্থা ছিলনা। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটেনের জনসাধারণের সামনে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে এবং ভারতে জনমত গড়ে তুলে সরকারের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এবং এটা শাসকগোষ্ঠী একেবারে উপেক্ষা করতে পারবেন না।

ভারতের রাজনৈতিক জীবনে রমেশ দত্তের অবদান কতটুকু—তা যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত কি ছিলো তা আমাদের জানতে হবে। বুঝতে হবে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতের প্রেরণায় তিনি তাঁর কর্মসাধনায় অটুট ছিলেন। আমাদের এও দেখতে হবে কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত গড়ে তুলেছেন। এ দেশের পরাধীনতা তাঁর মনে যে কতখানি বাজতো সে বিষয়ে সন্দেহ জাগবার কোন অবকাশ নেই। রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করার অনেক আগে, ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে নর্থ কেপের ওপরে দাঁড়িয়ে তিনি যে কথাগুলি ভেবেছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি লিখেছেন, "সত্যি সেটা স্মরণীয় রাত। পৃথিবীর স্বাধীন ও সমৃদ্ধ দেশের প্রতিনিধিরা সব সমবেত। নিজের নিজের জাতীয় কৃতিত্বে তাঁরা মুখর। সেদিন তাঁদের মধ্যে থেকে আমার অন্তরে যে বেদনা ও অপমানের কাঁটা বিঁধলো তা আমি গোপন করব না। পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়ে সবাই স্যাম্পেন পান করছেন। জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ ও মার্কিন প্রতিনিধিরা আতিথেয়তায় অংশ নিতে আমাদের পীড়াপীড়ি করছেন। আমিও

ধন্যবাদ দিয়ে হাতে তুলে নিলাম স্যাম্‌প্যেনের গ্লাস। ঠোঁটে ছোঁয়ালাম। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হতে লাগলো এঁদের একজন হয়েও আমার কোনো মর্যাদা নেই। আমি ভাবলাম, ভবিষ্যতে আগামী দিনগুলিতে সভ্যতার স্তরে স্তরে আমরাও কি উঠতে পারবো, আমরা কি পাব স্বায়ত্বশাসনের অধিকার, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমরাও কি এগোতে পারবো? প্রতিনিধিত্ব সংস্থা গড়ে তোলায় আমরা কি কৃতিত্ব দেখাতে পারবো—যেমন অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজ কলোনিতেও তরুণ সমাজ বছরের পর বছর এই পথে এগিয়ে যাচ্ছে? আর আমাদের পৌত্রের দল যখন ভবিষ্যতে য়ুরোপে আসবে, তারা যেন ভাবতে পারে যে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মধ্যে ভারতও তার যোগ্য আসন করে নিতে পারে……।"

স্বায়ত্বশাসনের কল্যাণকামী ক্ষমতা সম্পর্কেও রমেশ দত্তের মনে কোনো সন্দেহ ছিলনা। অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের অনুমতি নিয়ে তাঁর কথার যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—তা আমরা আগের পরিচ্ছেদে পেয়েছি। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, "একটি দেশের জনগণের সরকার অন্য দেশের জনগণকে শাসন করবে—এটা হয়না, হতে পারেনা। একটি দেশের জনগণ, অন্য দেশের জনগণকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে—অর্থ রোজগারের মাধ্যম করতে পারে এবং তাদের নিজেদের জনসাধারণের লাভের জন্য গরুর গোয়ালের মত মানুষের গোয়াল তৈরী করতে পারে।"

ভারতের জনসাধারণের যেসব দাবী তা পূরণ করার জন্য শাসকদের ওপর চাপ দিতে হবে—এটা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তখন একটা অভিযোগের কথা খুব শোনা যেত। তাঁর "আন্দোলন" ও সমালোচনার ফলে সরকারী চাকরীতে বহাল ভারতীয়রা খুব সঙ্কোচে পড়েছিলেন এবং তাঁরা সরকারের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করেন, রমেশ দত্তের মতামতের জন্য তাঁদের অসুবিধার

মধ্যে পড়তে হচ্ছে সে কথার উল্লেখ করে তিনি তাঁর বন্ধু বিহারী লাল গুপ্তকে লেখেন।

"আমি ইণ্ডিয়া অফিসকে চিনি। জাত্যাভিমান সেখানে অত্যন্ত বেশী; তাঁরা আমাদের আলাদা করে রাখতে চান। এর কারণ এই নয় যে, আমরা সমালোচক, এর কারণ এই যে, আমরা এ দেশের মানুষ। তাঁদের নীতি অনুসারে ইংরেজদের দিয়ে তাঁরা এদেশ শাসন করবেন। কুড়ি বছরে তাঁরা এই ব্যবস্থার অনেক উন্নতি করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের সংগ্রহালয়ে নানা গোপনীয় তথ্য ও কার্যবিবরণ জমা হয়েছে। তাঁদের কালো জুতোর ধুলো যদি আমরা চাটতে শুরু করি তাহলে তাঁরা এ নীতিকে বিসর্জন দেবেন না, নির্বিচারে যদি সমালোচনা করে যাই এবং ক্রমাগত যদি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি তবেই এ কাজে সফল হওয়া যাবে। ইংরেজরা জানেন সংগ্রাম কি জিনিস। তাঁরা ভিক্ষে করলে কিছু দেন না; হার মানেন নিরন্তর সংগ্রামে।"

সুতরাং বৈদেশিক শাসনের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর কোনো মোহ ছিলনা। "নির্বিচার সমালোচনা এবং নিরলস সংগ্রাম" করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তিনি কখনই আপোষ করেননি। তবে তাঁর সমালোচনা আর্থিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিলো। সেখানে কাউকে তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। পরবর্তী যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এর চেয়ে জোরাল কথা বলতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা উত্তরসূরী তাঁদের জন্য তিনি অমূল্য তথ্য রেখে যান। তাঁরা তাঁর তথ্যের ওপর নির্ভর করতে পেরেছিলেন। নিরলস সংগ্রাম চালানোর ব্যাপারে তাঁর দু'রকম কার্যপদ্ধতি ছিল। অবসর নেবার পর ইংলণ্ডে ও ভারতে—দু'জায়গাতেই প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা গড়ে তুলতে এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন এবং ইংলণ্ডে তিনি ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটেনের জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করে তুলতে প্রয়াসী হন। তাঁর এই বিশ্বাস ছিলো

যে, সরকারের "ভুল নীতির" কারণ হলো এই যে, যোগ্য ও ক্ষমতাসম্পন্ন, ব্যক্তিরা তাঁদের বক্তব্য ভারত সরকারের ওপর চাপাতে পারেন না বলেই সরকারের এই "ভুল নীতি" চলে আসছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিলো। তিনি জানতেন যে, ভারত সম্পর্কে প্রকৃত ও সত্য ঘটনা যদি ব্রিটেনের প্রগতিশীল ভোটদাতাদের সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে তাঁরাই ভারতে একটা প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করার জন্য নিজেরাই চাপ দেবেন। 'ইংলণ্ড ও ভারত'—এই বইতে তিনি বলেছেন যে, ভারতের ভাগ্য ব্রিটেনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এবং ব্রিটিশ রাজনৈতিক জীবনে যেমন উদারপন্থী শক্তি বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—তেমনি তার অনুরূপ প্রতিক্রিয়াও ভারতে দেখা দেয়। উদারপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ইংলণ্ডে কতটা কি প্রভুত্ব করতে পারছে না পারছে তার ওপরে অনেকটা নির্ভর করে। ভারতে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে। তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন ভারতের প্রশাসন ও তার জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা তিনি ব্রিটিশ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সে দেশের উদারপন্থী শক্তির কাছে এ দেশের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরাই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

রমেশ দত্ত মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ। সেই সময় দেশের যে অবস্থা ছিল—সেটাই স্বাভাবিক কারণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতকে গড়ে তুলেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা হয়। পশ্চিমী শক্তির প্রভাবে নব-জাগরণের সূচনা হয় বটে কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ছিল সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে চেতনা, তাকে যদি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অধৈর্যের প্রকাশ বলে মনে করা হয় তবে সেই অধৈর্যের মনোভাব এই শতাব্দীর শেষার্ধের আগে অতটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে তখনও পর্যন্ত

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনাটা অতটা তীব্র হয়ে ওঠেনি; বিদেশী শাসনের ফলে যে অবস্থা প্রকট হয়ে উঠেছিলো—সমালোচনা সীমাবদ্ধ ছিল মুখ্যত তারই বিরুদ্ধে। ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে তখন যে বৃদ্ধ মানুষটি সবচেয়ে বেশী মাথা ঘামাতেন তিনি ছিলেন দাদাভাই নওরোজি। তিনি ছিলেন সবার প্রিয় মানুষ। তাঁর পরে এলেন অন্যসব বিশিষ্ট নেতা যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডবলিউ. সি. ব্যানার্জী, বিচারপতি রাণাডে এবং বয়সে সবার চেয়ে ছোট, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। গান্ধীজী তাঁকে রাজনীতির "গুরু" বলে ডাকতেন। রমেশ দত্তও এইসব নেতার একজন। কিন্তু এঁরা সবাই ক্ষমতাসীন সরকারের "সংস্কারসাধনের" পক্ষপাতী ছিলেন। সরকার কি ভুল করছেন, যেসব অন্যায় ও অবিচারের জন্য সরকার দায়ী, এবং এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে কোন্ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার—এসব নিয়েই তাঁরা বেশী ভাবতেন। সরকারের ভুলভ্রান্তি ও অন্যায়-অবিচার যাতে নির্বিচারে চলতে না পারে সেইজন্য তাঁরা সংগঠনগত পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তদানীন্তন সরকারী ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য এই যে প্রচেষ্টা তার মধ্যে গভীর আন্তরিকতা নিহিত ছিল। এই একই কারণে তাঁরা কিছু কাজ করতে সফল হয়েছিলেন। এভাবে তাঁরা আগামী দিনের নেতাদের এগিয়ে যাবার পথ করে দেন। পরবর্তী যুগের নেতারা এই আন্দোলনকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নিয়ে গেলেন, যাকে আমরা বলতে পারি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা। আগের যুগের নেতাদের সঙ্গে পরবর্তী যুগের নেতাদের কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই যে পার্থক্য ছিল এবং পূর্বসূরীরা, উত্তরসূরীদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির যে তীব্র সমালোচনা করতেন—তা বিচার করে দেখলে মনে হতে পারে দুই যুগের নেতাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ ছিল। আসলে কিন্তু একে সংঘর্ষ বলা যায় না। আগের যুগের যেসব নেতা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন সে অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তরুণ নেতারা উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা

যেতে পারে যে, রমেশ দত্ত ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচারের প্রশ্নটি তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে যেভাবে সবার সামনে তুলে ধরেন—পরবর্তী যুগের নেতারা তার ওপর ভিত্তি করে নতুন ভাবে ভাবতে পেরেছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল, তাঁদের সে চিন্তাধারার মূল ভিত্তি ছিল রমেশ দত্তের তথ্য বহুল অনুশীলন। এমন কি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা যে অধৈর্য 'হয়ে উঠেছিলেন তার জন্য যে সম্যক তত্ত্বগত অনুশীলনের প্রয়োজন হয় সেটাও তাঁরা পেয়েছিলেন রমেশ দত্তের ভাণ্ডার থেকে।

সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রমেশ দত্তের কতটুকু অবদান তা একটু অন্যভাবে বিচার করতে হবে। তাঁদের যুগের মানুষের সঙ্গে পরবর্তী যুগের নেতাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কতটা কি পার্থক্য ছিল এটা বড় করে দেখলে চলবে না। তাঁরা কি কাজ করেছিলেন—সেটা বিচার করতে হবে। তাঁদের কোন্ কাজের ফসল কুড়িয়ে পরবর্তী যুগের নেতারা স্বাধীনতা আন্দোলনকে তার সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পেরেছেন—যার ফলে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত স্বাধীন হতে পেরেছিলো—সেই দৃষ্টিতে রমেশ দত্তের মত মানুষের কীর্তি বিচার করতে হবে। এই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি বিচার করি, দেখবো, রমেশ দত্তের অবদান প্রবর্তকের নতুন দিশা হয়তো নয় কিন্তু তাঁর কীর্তি স্মরণীয় হয়ে থাকার মত। এই কারণেই তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যোগ্য মর্যাদা পান।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আধুনিক ভারতের একজন স্রষ্টা

ভারতের পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল প্রস্তুতি ও গঠনমূলক কর্মসাধনার সময়। যে দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে ভুলে যায়নি, সে দেশের পক্ষে যে কোন কালই প্রস্তুতি ও গঠনমূলক কাজের সময় কারণ এক কালের শুভ ও ভাল কাজ অন্য যুগের মানুষকে, তাদের নিজের নিজের দেশকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অবশ্য ভারতের কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ তাৎপর্য আছে কারণ এ ছিল নব জাগরণের শতাব্দী। একই ধারায় দেশের পরবর্তী ইতিহাসের সূচনা। সেই শতাব্দী নিয়ে এলো গঠনমূলক কর্মসাধনার অফুরন্ত সুযোগ। এ দেশের ছিল অতীত ইতিহাস, সমৃদ্ধ ইতিহাস; দর্শন, সাহিত্য, এমন কি রাজনৈতিক ও সামাজিক গঠনব্যবস্থায় ভারত একদিন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। প্রাচীন ভারতের এই গৌরবময় অধ্যায় থেকে ভারত এগিয়ে চললো মধ্যযুগে, নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে কখনও সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের পরিবর্তে এসেছে দারিদ্র্য ও দুর্দশা। তবু ভারত এগিয়ে চলল। এলো সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর রাজনৈতিক সংঘাত, বিভেদ ও বিচ্ছেদ আর সাংস্কৃতিক জীবনে ফুটে উঠলো অধোগতির চিহ্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির অধঃপতনের পথ প্রায় সুগম হয়ে গেল। এদিক সেদিকে নানা অঞ্চলে প্রাচীন যুগের প্রতিভার উজ্জল স্বাক্ষর চোখে পড়লো। কিন্তু দেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক গঠন-ব্যবস্থায় এলো অবক্ষয়ের অধ্যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রভুত্ব স্থির নির্দিষ্ট হলো। এরপর বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ একের পর এক নিভে গেলো বিজয়ীর জয় উল্লাসে। পুরোনো আমলের সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—যা এদেশে শতাব্দী ধরে চলে আসছিল—তা

আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়লো। তার পরিবর্তে এলো উপনিবেশবাদ। নিঃসন্দেহে এটা প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনা। কিন্তু ভারতে ও বিদেশে তখন যে অবস্থা ছিল, তা বিচার করলে একে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলে মনে হবে। এ গভীর প্রতিক্রিয়া সর্ব পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পরে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজনৈতিক চেতনা আবার জাগ্রত হবার আগে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্খার একেবারে অবলুপ্তি ঘটে। স্বীকৃত বিবর্তনের পথে সব সময় ইতিহাস চলে না। কখনও সে এক পা পিছিয়ে যায়, আবার হয়তো এক পা এগোয়। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে উপনিবেশবাদের প্রচলন হলো। কিন্তু উপনিবেশবাদ গঠন-ব্যবস্থার মধ্যেই এমন কতকগুলি দুর্বলতা ছিল যার আবর্তে সে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনলো। এ পর্যন্ত পশ্চিমী দেশ থেকে ভারত ছিল বিচ্ছিন্ন, এখন তার সঙ্গে যোগাযোগের পথ খুলে গেল। দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটলো ভারতের। এই যোগাযোগের ফলে নতুন চিন্তার ঢেউ এলো, এলো নতুন সংস্কৃতি। ভারত বুঝতে পারলো উন্নত পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তার ব্যবধান কত ব্যাপক, কত গভীর। ভারত বুঝতে পারলো সে কত পিছনে পড়ে আছে। পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে যাবার আকাঙ্খা জাগলো ভারতবাসীর মনে।

অষ্টাদশ এবং এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির ব্যবধান সত্যিই খুব ব্যাপক ছিল, এর ফলে ভারত পিছনে পড়ে রইলো অথচ পশ্চিমের দেশগুলি এ সময়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো। মধ্যযুগের শেষভাগে য়ুরোপীয় নবজাগরণ এসেছে, কিন্তু নবজাগরণের সূচনা হয়েছে তারও আগে। কিন্তু পুনরুত্থানের যে নতুন চিন্তাধারা--যা নিয়ে এলো যুক্তি-তর্কের যুগ—সে যুগের প্রভাব চললো অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী পুনরুজ্জীবনের নবচেতনা এ আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ

করলো। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব পুরোনো রীতিনীতি, জীর্ণ বিশ্বাস ও অবক্ষয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে য়ুরোপে নিয়ে এলো এক নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা য়ুরোপের শিল্প বিপ্লবের অধ্যায়। প্রযুক্তি-বিদ্যার যুগের উদয় য়ুরোপে। এ যুগের সঙ্গে এলো আর্থিক সমৃদ্ধির যুগ। এ সমৃদ্ধির সাফল্য সত্ত্বেও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর জীবন পরিবর্তিত হতে বহু বছর সময় লেগেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শ্রমিকদের দুর্দশা আতঙ্কজনক ছিল। এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জীবন নির্বাহ করতে করতে যতদিন না সামাজিক চেতনা জাগলো এবং সমাজবাদের আন্দোলনের শক্তি যতদিন না ছড়িয়ে পড়লো ততদিন সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করতে পারেনি। তবুও শিল্প বিপ্লব পশ্চিমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বুনিয়াদ তৈরী করে দিয়েছিল। পশ্চিমের দেশগুলি ও ভারতের মত পূর্ব দেশের মধ্যে ব্যবধানটা আরও ব্যাপক করে তুলেছিল। কারণ ভারতের মত দেশ প্রযুক্তি-বিদ্যার অগ্রগতির অভাবে তখনও কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনে পুরোনো পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই অবস্থায় পশ্চিমী শক্তিবর্গ অপেক্ষাকৃত উন্নতধরনের প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে এশিয়ার দেশগুলিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহজেই পরাভূত করতে পারবে—এটাতো খুবই স্বাভাবিক। রমেশ চন্দ্র ঠিকই বলেছেন যে, পরে এরাই বিজিত দেশের হাতেগড়া শিল্পকে অন্যায্য প্রতিযোগিতায় নামিয়ে তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়ার রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে অন্য অনেক জিনিসের মতই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছিল। তখন সবে জাতীয়তাবাদের উপলব্ধি হয়েছে। পরবর্তী ঘটনায় এও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে জাতীয়তাবাদের ধারণাটা একটু অতিরঞ্জিত আকার ধারণ করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয়তাবাদের অতিরঞ্জিত রূপের সবচেয়ে বীভৎস

প্রকাশ ঘটেছিল য়ুরোপে যার থেকে উদ্ভব হয়েছিল নাৎসীবাদ। জার্মানীর জাতীয় স্বার্থের তাগিদে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। কিন্তু জার্মানীর নির্মম পরাজয়ের পরে বিজয়ীরা তাকে এমন চুক্তি করতে বাধ্য করে যার ফলে সেখানে উচ্চাশার যুক্তিহীন শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বর্তমান শতাব্দীর তিন দশকে নাৎসীবাদের জন্ম হয়। হিটলারের নাৎসীবাদের সুতীব্র অত্যাচারে মানুষকে দারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। পৃথিবীতে আবার সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনতে দ্বিতীয় একটি মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধ প্রথম যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ ছিল। রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ নিশ্চয়ই শেষ কথা নয়। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল পৃথিবী সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আজকের জগতে জাতীয়তাবাদের মূলত কোন সার্থকতা নেই। অন্যদিকে কারিগরী উন্নয়নের ফলে উগ্র জাতীয়তাবাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে অথবা উৎকট স্বাদেশিকতা প্রাধান্য লাভ করতে পারে। এই মনোভাব মানব জাতির অস্তিত্বের পক্ষে বিপদসূচক। তবুও এর মূল্য আছে, অন্ততপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও এর মূল্য ছিল। এই জাতীয়তাবাদের চেতনা অবিচারকে দূর করতে সাহায্য করেছিল। যে অবিচার একটি দেশ অন্য দেশের উপর চাপিয়ে যাচ্ছিল তার থেকে জাতীয়তাবাদই মুক্তির পথ দেখিয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক দিকে থেকে যারা তখনো দুর্বল, এই জাতীয়তাবাদের শক্তি সেসব দেশের মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা জাগিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে এই চেতনার তখনো উন্মেষ হয়নি। প্রাচীন সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্যে সেদিন ভারতের অতটা বিশ্বাস ছিলনা। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে সে তাকাতে পারেনি। পশ্চিমের দিকে চোখ ফিরিয়ে সে নতুন চিন্তার সন্ধান পায়নি। প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নয়নের কৌশল সম্বন্ধে সে তখনো অন্ধ ছিল। এটাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রূপ। সেদিন ভারত শুধু তার ভৌগোলিক

সীমাকেই জানতো এবং এখানে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম এমন যেকোন দুর্ধর্ষ শক্তির হাতে নিজের ভাগ্যকে সমর্পণ করে ভারত আত্মসন্তুষ্ট ছিল।

আধুনিক ভারত গড়ে তোলার জন্য সেদিন দুটো বড় কাজ করার দরকার ছিল। একদিকে, অতীত ভারতের কৃতিত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে ভারত-বাসীদের সচেতন করে তোলা, তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মবল ফিরিয়ে আনা এবং পূর্বপুরুষদের মননশীল শাস্ত্রচর্চার পথ অনুসরণ করে জ্ঞানার্জন ও কর্মসাধনার আদর্শে সাধারণ লোককে অনুপ্রাণিত করে তোলা। অন্যদিকে, পশ্চিমের দেশগুলি তখন অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছিল। চিন্তা জগতের নতুন নতুন ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছিল। জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলার প্রয়াসের অন্ত ছিল না। এই উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে ভারতের এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন ভারতের মত একটি দেশ তার নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ও আস্থা না রেখে কখনও উন্নতি করতে পারে না। প্রাচীন ভারতের মত দেশের লোকেদের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত, তার সংস্কৃতি কৃষ্টির ছাপ পড়ে। তাতে ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এই রীতিনীতি, আচারব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে বা সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ও উপলব্ধি ছাড়া কোনো আন্দোলন—তা সে যত প্রগতিশীলই হোক না কেন—সফল হতে পারে না। অন্যদিকে কোনো দেশ শুধুমাত্র অতীতকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে তাকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। পুনর্জাগরণের অর্থ যদি এই হয় যে বর্তমানের পথকে আমরা রুদ্ধ করে অতীত জীবনধারায় নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বিকিয়ে দেবো—তাহলে সে পুনরভ্যুত্থানের ফলাফল দেশের পক্ষে শুভ হয়না, তার প্রতিক্রিয়াশীল প্রকাশ ঘটে।

অতীত ঐতিহ্যে শিকড় থাকবে অথচ তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে উদার, বর্তমান

ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, এই পটভূমিকায় আধুনিক ভারত গড়ে তোলার দরকার ছিল। এই প্রয়োজনের কথা বিচার করে দেখলে রমেশ দত্তের মত কৃতী মানুষের অবদান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে নবজাগরণ আসে। এই নবঅভ্যুত্থানের পথনির্দেশ ছিল খুবই সুস্পষ্ট। যে সময়ে যুক্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবের ফলে পুরোনো আচার-ব্যবহার ও যুক্তিহীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনও জোরদার হয়ে ওঠে। এইসব যুক্তিহীন কুসংস্কার সমাজের প্রসারকে রুদ্ধ করছিল। সাহিত্য জগতেও নতুন চিন্তাধারার স্রোত এসেছিলো। নতুনভাবে প্রকাশ করার তাগিদ এসেছিল। রাজনৈতিক চেতনা এসেছে এর আরও অনেক পরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও একটা বিশিষ্ট আন্দোলন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবজাগরণের ক্ষেত্রে রমেশ দত্তের অবদান বহুমুখী। তাঁর বিভিন্ন কর্মধারার পিছনে একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, একটা সামঞ্জস্য ছিলো। নবজাগরণের আন্দোলন ও তার প্রকৃতির সঙ্গে রমেশ দত্তের উদ্দেশ্যের একটা মিল ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

পুরোনো ও নতুনের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন রমেশ দত্তের সবচেয়ে বড় অবদান। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর সমকালীন মানুষ এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে যাতে গ্রহণযোগ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের রত্নভাণ্ডার খুঁজে বার করেন। ঋগ্‌বেদ বাংলায় অনুবাদ করা, 'লেইস অফ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' নামে ইংরেজীতে তাঁর কাব্যগ্রন্থ, রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ, ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস—এগুলি তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এইসব রচনার মধ্যে তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি জীবনের লক্ষ্য। যেকোন মাপকাঠিতেই বিচার করা হোক না কেন, শুধু এই গ্রন্থগুলিই তাঁকে আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে মর্যাদার

আসন দিতো। অতীত ভারতের গৌরব সম্বন্ধে দেশকে সচেতন করে আধুনিক ভারত গড়ে তোলায় এই গ্রন্থগুলি সার্থক হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সম্পর্কে রমেশ দত্তের আগ্রহ, দেশ ও বিদেশের সামনে এ সভ্যতার আসল প্রতিমূর্তি তুলে ধরার প্রচেষ্টা তাঁর সারা জীবনব্যাপী প্রয়াসের একটা দিক মাত্র। সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অন্য একটা আনুষঙ্গিক দিক—বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান। তাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ সেই সময়ে বাংলা ভাষার বিষয়বস্তু নিয়ে নানারকম বিপ্লবাত্মক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। তাঁর চারটি ঐতিহাসিক এবং দুটি সামাজিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐ সময়টাতে বঙ্কিম চন্দ্রের মত দিকপাল সাহিত্যিকদের আবির্ভাব না ঘটলে রমেশ দত্তের কীর্তি সমসাময়িক-কালকে অনেক বেশী প্রভাবিত করতো। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি অনেক বেশী স্বীকৃতি পেতেন। এই উপন্যাস লিখবার উদ্দেশ্য শুধু মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করা নয়, তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি যে উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা ঠিক একই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও গবেষণা করেছেন। প্রাচীন ইতিহাসের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী এবং মধ্যযুগীয় ভারতের নারী ও পুরুষ যে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন সেসব বীরত্বের নিদর্শন রমেশ দত্ত দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে তিনি এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মাধ্যমে মধ্যযুগীয় ভারতকে সমসাময়িককালের চোখে নতুন দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তথ্যাদির মাধ্যমে তিনি প্রাচীনকালকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিধৃত করতে প্রয়াসী হন। অন্যদিকে তাঁর দুটি সামাজিক উপন্যাসের অন্য উদ্দেশ্য ছিলো। এতে লেখককে আমরা পেলাম সমাজ সংস্কারক হিসেবে—যিনি চাইছেন বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণবিবাহ।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দুটি উপন্যাস—'সংসার' এবং 'সমাজ'

ছাড়া রমেশ দত্তের আর কোনো সার্থক কীর্তি নেই। তবে যে জীবন তিনি অতিবাহিত করেন, মাঝে মাঝে তিনি যেসব বক্তৃতা দেন তাতে সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ পায়—শুধু প্রকাশই পায়না, যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, তাঁর এই চিন্তাধারা সমসাময়িককালের সামাজিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিলো। রমেশ দত্তের জীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কাছ থেকে যা কিছু শিক্ষনীয় তার সমন্বয় ঘটেছিলো। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "প্রকাশটা আধুনিক হতে পারে কিন্তু তাঁর মধ্যে যে মহত্বের প্রকাশ ঘটেছে, তা সেই প্রাচীন যুগের (ভারতের) মহত্ব।" ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্বন্ধে এত গভীর শ্রদ্ধা দেশের খুব কম মানুষের মধ্যে দেখা গেছে। শুধু যে প্রাচীন কাল সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল তাই নয়, পরবর্তী যুগ সম্পর্কেও তাঁর অনুরাগ ছিল অসীম। কিন্তু ভারতের ইতিহাস ও কৃষ্টি সম্বন্ধে এ শ্রদ্ধা ছিলো বলে তিনি অন্ধভাবে সব কিছু গ্রহণ করতে পারেননি। পরে দেশে যেসব আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রচলিত হয় তা তিনি কোনদিন মেনে নিতে পারেননি। যুক্তিহীন সংস্কারের সঙ্গে তিনি কোনকালেই আপোষ করেননি অথবা যেসব সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি অযৌক্তিক ছিল এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক তার কাছে তিনি কোনদিন মাথা নত করতে পারেননি। এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম যখন রুখে দাঁড়ান সেটা ছিল তাঁর জীবনযুদ্ধের প্রথম সূচনা। গোঁড়া আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি বিদেশে পাড়ি দেন। এ নিয়ে কখনই তিনি অনুশোচনা করেননি। বিদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি তরুণ ভারতীয়দের আরও বেশী সংখ্যায় বিদেশে যেতে পরামর্শ দেন কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিলো, বিদেশে থাকলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার হবে। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর গোঁড়া ও রক্ষণশীল সমাজ কোনদিনই তাঁকে সমাজ জীবনে সম্পূর্ণ আপন মানুষ বলে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু এতে তাঁর ব্যবহারের

কোনো তারতম্য ঘটেনি। অন্যদিকে, সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন বলে প্রতিপন্ন করার জন্য যাঁরা যুক্তিহীনভাবে শুধু বিরোধিতা করারই পক্ষপাতী ছিলেন—রমেশ দত্ত তাঁদের দলে ছিলেন না। তিনি সমাজের সেইসব আচার-ব্যবহার মানতে রাজী ছিলেন যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

অর্থনৈতিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মসাধনা নতুন ভারত গড়ে তোলায় সবচেয়ে বড় অবদান জুগিয়েছে। তিনি ছিলেন মূলতঃ ইতিহাসের ছাত্র, যদিও সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিলো। তিনি তাঁর কর্মজীবনের প্রারম্ভে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। 'য়ুরোপে তিন বছর' নামে তাঁর ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ হবার পর অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর যে প্রথম বই প্রকাশিত হয়, তার নাম 'বাংলাদেশের কৃষকসমাজ'। তাঁর কর্মজীবনের চার বছর পরে ১৮৭৫ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি কৃষকসমাজে বেশ সাড়া জাগিয়ে তোলে। খাজনা আদায় ব্যবস্থা সম্বন্ধে এতে যে সমালোচনা ছিল তাতে ব্রিটিশ প্রশাসক বেশ অসন্তুষ্ট হন। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলো তাঁরাও বইটিকে ভাল চোখে দেখেননি। এ উদাহরণ আমরা আগেই পেয়েছি। কলকাতার সাময়িক পত্রিকা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' রমেশ দত্তের "আমূল সংস্কারসাধনের" দৃষ্টিভঙ্গি এবং "বিষাক্ত এই নতুন চিন্তাধারাকে" উপহাস করেছিলেন। কৃষকসমাজ সম্বন্ধে রমেশ দত্তের সারা জীবনই কৌতূহল ও আগ্রহ ছিলো। বাংলাদেশে একটা প্রগতিশীল প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং প্রাদেশিক সরকারের তদানীন্তন রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারীর সঙ্গে তাঁর যে পত্রবিনিময় হয় সেসব কথা আমরা আগের পরিচ্ছেদে জেনেছি। কৃষকদের স্বার্থরক্ষা এবং প্রজাদের বাসভবন সংলগ্ন জমি জায়গার ব্যাপারে উপযুক্ত নিরাপত্তার অভাব সম্বন্ধে তিনি পরেও তাঁর সরকারী রিপোর্টে অভিযোগ করেছেন। তার ফলে সরকারের প্রশাসন সম্পর্কিত রিপোর্টে

অনিচ্ছাসত্বে হলেও এই ক্ষতিকর সমস্যার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। চাকরী থেকে অবসর নেবার পরে তিনি অবশ্য অনেক বেশী খোলাখুলিভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পেরেছেন। ভূমির খাজনা আদায় ব্যবস্থা এবং ভারতীয় কৃষকদের ওপর অত্যধিক খাজনার বোঝা চাপানোর ফলে তাদের যে দুরবস্থা হচ্ছে—বেশীর ভাগ এটাই ছিল তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। তাঁর আর্থিক রচনার মাধ্যমে তিনি পরে যে যুক্তিপূর্ণ ও গবেষণামূলক মতবাদ প্রমাণ করতে চান, তা সহজ কথায় এরকম দাঁড়াচ্ছে। ভারত এই যে বার বার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে—যা যেকোন সভ্য প্রশাসন বিভাগের যোগ্যতার লজ্জাকর নিদর্শন—তার কারণ কিন্তু মূলত আবহাওয়ার দুর্যোগ নয়, কিংবা ভারতীয় কৃষকদের ব্যয়সঙ্কোচের অভাব নয়। তখনকার দিনের প্রশাসকরা অবশ্য সেই কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। দুর্ভিক্ষের আসল কারণ কৃষকদের ওপর অত্যধিক খাজনার বোঝা, যে বছর ভাল চাষ আবাদ হতো তখনও তারা দুর্যোগের দিনের জন্য সঞ্চয় করতে পারতো না। আর অনাবাদী বছরগুলিতে তো অভাব-অনটন মেটানো অসম্ভব ছিলো। ভূমি রাজস্ব-আদায় ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলি তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন লর্ড কার্জনকে লেখা তাঁর পাঁচটি বিখ্যাত খোলা চিঠিতে। এইসব চিঠিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থার দোষত্রুটি বিশ্লেষণ করেন। এটাই তিনি দেখাতে চান যে, যেসব জায়গায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ আছে, সেসব জায়গা ছাড়া, অন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেশী পরিমাণে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজন মেটাতে তদানীন্তন সরকার ইচ্ছেমত রাজস্বের হার বাড়িয়ে যাচ্ছেন। দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে জমির খাজনা বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি জোর দেন। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সময়ে খাজনার পরিমাণ বাড়ানো উচিত নয়। যেখানে মূল্যমান বৃদ্ধি পেয়েছে শুধু সেই পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কোনো অবস্থাতেই ভূমির রাজস্ব হার বাড়ানো উচিত নয়। রাজস্ব আদায়ের এই নীতি গ্রহণ

করার জন্য তিনি তদানীন্তন সরকারকে নানাভাবে বুঝিয়েছিলেন। লর্ড কার্জনের সরকার অত্যধিক হারে খাজনা আদায়ের অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেন। এরচেয়ে বেশী কিছু আশাও করা যেতো না। রমেশ দত্তের বক্তব্য না বুঝে সরকার তাঁর মতবাদের যে সমালোচনা করেন তাকে মোটেই ন্যায্য বলা যায় না। সরকারের বক্তব্য ছিল এই যে, রমেশ দত্ত খাজনা আদায়ের অত্যাচারী পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন বটে কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেসব জায়গায় চালু সেখানে জমিদাররা খাজনা আদায়ের সময় প্রজাদের ওপর যে অত্যাচার করেন সে সম্বন্ধে তিনি একেবারে নীরব। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের সমালোচনার কোনো যুক্তি নেই কারণ প্রজাস্বত্বভোগীদের প্রতি জমিদার ও নানা মধ্যস্বত্বভোগীদের দুনীর্তিমূলক আচরণ ও অত্যাচার বন্ধ করতে একটা প্রগতিশীল ও ন্যায্য ভূমিস্বত্ব আইন প্রণয়নের জন্য রমেশ দত্ত সারাজীবন ধরে সংগ্রাম করেন।

'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস'-এ এই অভিমতকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে এবং বহুবার বহু ভাষণে তিনি এইসব কথাই বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে জমির খাজনা আদায়ের প্রশ্ন নিয়ে তিনি যতটা মাথা ঘামিয়েছেন, অর্থনৈতিক প্রশাসনের অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে অতটা নয়। এটাই তাঁর মূল বক্তব্য ছিলো যে, দেশের কৃষকদের এমনভাবে রক্ষা করতে হবে যাতে বন্যা খরার ফলে সাময়িক দুর্যোগের দিনগুলির দুঃখকষ্ট তারা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে। তাদের পরিশ্রম ও উদ্যমের সুফল যাতে তারা পায় সে বিষয়ে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াবার জন্য তাদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হবে। কৃষকসমাজের কল্যাণের জন্য রমেশ দত্ত সারাজীবন ধরে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন—তা তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মসাধনার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর সমসাময়িককালের চিন্তাধারার তুলনায় অতুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় আন্দোলনকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার

আগে পর্যন্ত কৃষকসমাজ রমেশ দত্তের কাছ থেকে যে অনুপ্রেরণা পান—এমন আর কারুর কাছ থেকে নয়। গান্ধীজী গ্রামগুলির উন্নয়নের ওপরে জোর দিয়ে এবং অনুন্নত শ্রেণীর লোকেদের কল্যাণের জন্য প্রয়াস চালাবার আহ্বান জানিয়ে জাতীয় আন্দোলনকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তার আগে রমেশ দত্তের কাছ থেকেই তাঁরা উৎসাহ পেয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক আন্দোলন জনসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। এ আন্দোলন তখনও পর্যন্ত কিছু শিক্ষিত সমাজ ও কয়েকটি শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এই আন্দোলনের মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তাধারা এবং তাদের স্বার্থ প্রতিফলিত হবে—এটাতো খুবই স্বাভাবিক। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, রমেশ দত্ত জমিদারদের স্বার্থকে তুলে ধরেননি, কৃষকদের স্বার্থ তুলে ধরেছেন। তিনি কৃষকদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ও তাদের ওপর আর্থিক বোঝার ভার লাঘব করতে চেয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তিনি জাতীয় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পেরেছিলেন। দেশের কৃষকসমাজের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করে নতুন ভারত গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি প্রকৃতই সাহায্য করেন।

ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক প্রশাসনের অন্য দিক সম্পর্কে রমেশ দত্তের কী অভিমত ছিল—তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তিনি বলেছেন, পশ্চিমের বাষ্পশক্তি-চালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অযৌক্তিক প্রতিযোগিতার ফলে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যম করে তোলা হচ্ছে। তিনি একথাও বলেছেন যে, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এই পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে তাঁরা অত্যধিক হারে জমির খাজনা আদায় করে চলেছেন। কারণ

সরকারের ক্রমবর্ধমান খরচপত্র মেটাবার প্রয়োজনে খাজনার হারও বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। এই ব্যয়ভার স্বার্থের অনুকূল ছিলনা। এভাবে কৃষকদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যায় ও তাদের দুর্দশা বেড়ে চলে। রমেশ দত্ত আরও বলেছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতির ফলে ভারতের সীমান্তের বাইরে ব্যয়বহুল যুদ্ধ চালাবার উদ্দেশ্যে ভারতের রাজস্ব থেকে খরচপত্র মেটানো হয়। অন্যদিকে সুদের হার সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়ে ব্রিটিশ মূলধন ভারতে নিয়োগ করা হয়। তখনকার দিনে "আভ্যন্তরীণ খরচ" যাকে বলা হতো—তার নামে ভারত থেকে নিয়মিতভাবে সহায়সম্পদ ব্রিটেনে চলে যেতো। রমেশ দত্ত জানতেন কোনো পরাধীন দেশের এ ছাড়া অন্য পথ নেই। অথচ অবিরত এই অর্থ ভারত থেকে চলে যাবার ফলে ভারত দিন দিন দরিদ্র হয়ে যাচ্ছিল। রমেশ দত্ত উপসংহারে এই কথা বলেছেন, যে, এই যেখানে অর্থনৈতিক নীতি, সেখানে ভারতের আর্থিক অবস্থা দিন দিন যে খারাপের দিকে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক। বার বার এখানে দুর্ভিক্ষ কেন হয় তাও অজানা নয়।

এইসব সমালোচনা তদানীন্তন ঔপনিবেশিক সরকারের নীতিকে মোটেই প্রভাবিত করতে পারেনি। এর ফলে অমানুষিক শোষণ দূর হতে পারতো। কিন্তু সমালোচনার ফলে একটি ঔপনিবেশিক শক্তিধর দেশের ওপর নির্ভরশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে সেদিন এতটা আশা করা যেতো না। রমেশ দত্ত শোষণের নানাদিক নিয়ে যেসব কথা বলেছিলেন তা যদি সত্যিই শোনা হতো তবে ঔপনিবেশিকতার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতো। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি যে কাজ করেছেন, যে অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছেন সেটা তখনকার দিনের প্রশাসন ব্যবস্থাকে কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলো তা নিয়ে রমেশ দত্তের মূল্যবিচার হবে না। তাঁর এই অভিমত দেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে যদি সজাগ করতে পেরে থাকে সেখানেই তাঁর কর্মসাধনা সার্থক

হয়েছে। এই যে সচেতনতা—এটাই জাতীয় আন্দোলনের গতিকে তরান্বিত করেছিলো এবং ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিলো।

রমেশ দত্তের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অন্য একটা বড় দিক উল্লেখ করার মত। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে হলে আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসনিক বিভাগে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি কৃষকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাদের সমস্যার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার ফলে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের প্রকৃত রূপ কী তা তিনি জানতে পেরেছিলেন। তাই এইসব বিষয় তাঁর চিন্তাধারাকে জুড়ে থাকবে এটাতো খুবই স্বাভাবিক। শুধুমাত্র কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে এ দেশের সমৃদ্ধি আসবে না—রমেশ দত্তের এ অভিমত অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। প্রথম শিল্প সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ* দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর এ চিন্তাধারার প্রতিফলন রয়েছে। এই ভাষণে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত কোন্ কোন্ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। দেশটা অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পা ফেলে তাকে চলতে হবে। এটা করতে হলে বিশেষ প্রয়াস দরকার। কিন্তু এ প্রয়াস চালাবার অনুকূল অবস্থা নেই। সরকার এ দেশের শিল্পোন্নয়নে উৎসাহ দেবেন না কারণ সেটা ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার পরিপন্থী নীতি। প্রকৃতপক্ষে নানারকম নিরুৎসাহজনক নীতি ও কার্যধারার সম্মুখীন হতে হবে। তবুও নিরাশ হলে সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি ভারতবাসীকে নিরন্তর প্রয়াস চালাতে আহ্বান জানান। এদেশের আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে প্রতিনিয়ত উদ্যম ও কর্মসাধনায় ব্যাপৃত হতে হবে। রমেশ দত্ত এ ব্যাপারে দূরাগত ভবিষ্যতের কিছুটা পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন। আজকে যা ভাবা সহজ সেদিন তা ছিল না। সেদিন অতটা কেউ ভাবতেও

* দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৪।

পারতো না যে কৃষি ব্যবস্থার এত গুরুত্ব সত্ত্বেও, তা যদি শিল্পোন্নয়নের সহায়ক না হয় তাহলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির পর্যায়ে কোনো দেশই এগিয়ে যেতে পারে না। সুতরাং ভারত যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে না থাকতে চায় তাহলে তার শিল্পকে বাড়াতেই হবে—কৃষি ব্যবস্থাকে অবহেলা করার জন্য নয়—তাকে সাহায্য করতে, তার পরিপূরক হয়ে উঠতে।

পরিশেষে তাঁর কর্মসাধনার আর একটা বড় দিক, রাজনীতি। প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গড়ে তোলার সুবিধে এবং যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রেখে ধীরে ধীরে এই প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি তাঁর চাকরী জীবনের শুরু থেকেই সচেতন হয়ে ওঠেন। অবশ্য সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেবার আগে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেননি। আগেই আমরা দেখেছি, তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্য কাজ করেছেন, ১৮৯৯ সালে তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর রাজনীতি ছিল মধ্যপন্থীর রাজনীতি, তখনকার দিনে এই নীতির এই নামই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যাকে আমরা "উগ্রপন্থী" বলি তাদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে "মধ্যপন্থী" ও "উগ্রপন্থী"রা দু'দলে ভাগ হয়ে যায়। রমেশ দত্তের জীবদ্দশায় এটা ঘটেছিলো। অবশ্য তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মধ্যপন্থী ছিলেন।

মধ্যপন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে যে বিভেদ দেখা দেয় সে মতবিরোধ চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকে নিয়ে অতটা নয়, যতটা লক্ষ্যে পৌঁছবার মাধ্যম নিয়ে। লক্ষ্যে কত তাড়াতাড়ি পৌছনো যায় বা তা সম্ভব—এবং তারজন্য কি পথ অবলম্বন করা উচিত—দু'দলের মধ্যে এটাই মতভেদের কারণ ছিল। আগেই আমরা দেখেছি, রমেশ দত্ত চেয়েছিলেন ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক অঞ্চল যেমন ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া অথবা নিউজিল্যাণ্ডের মত ভারতও স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পাক্। যদিও তিনি এর সংজ্ঞা দেননি, তবুও পরে যাকে আমরা অধীন রাষ্ট্রের পূর্ণ

স্বায়ত্তশাসনাধিকার বলতাম, ভারতের জন্যেও তিনি সেটাই চেয়েছিলেন। অন্ততঃপক্ষে তিনি যা ভেবেছিলেন—তার থেকে এ অবস্থার অন্য কোনো চিত্র ফুটে ওঠেনা। অন্যদিকে উগ্রপন্থীরা চেয়েছিলেন স্বরাজ অথবা মহাত্মা গান্ধী যাকে পরে বলেছিলেন, পূর্ণ স্বরাজ। অধীন রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—এর মধ্যে কোনটা চাই তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শেষের দুই দশকে। তার আগে পর্যন্ত এই স্বরাজ্যের পূর্ণ অর্থ ও ধারণা অতটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। জওহরলাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং কংগ্রেসের তরুণ নেতারাই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানান। তাঁরাই এর স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। এসব রমেশ দত্তের জীবদ্দশার দুই দশক পরের ঘটনা। তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত লক্ষ্য ছিল, স্বরাজ অথবা স্বায়ত্বশাসনাধিকার। সেদিন পর্যন্ত "মধ্যপন্থী" ও "উগ্রপন্থী"—উভয় দলের এই একই লক্ষ্য ছিল।

এই লক্ষ্যে পৌঁছতে কি পথ অবলম্বন করতে হবে—সে সম্পর্কে দুই দলের মধ্যে মৌলিক মতভেদ ছিল। রমেশ দত্ত ও তাঁর সমসাময়িককালের চিন্তাশীল রাজনীতিবিদরা বিশ্বাস করতেন, ভারতে যা দরকার তা হলো এক সুসংহত, সুসম্বদ্ধ, সজাগ জনমত। এদেশে যদি এক প্রগতিশীল স্বায়ত্বশাসন গড়ে তুলতে চাই এবং অন্যায্য প্রশাসন ও অযৌক্তিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ জানাতে হয়—তাহলে তার একমাত্র উপায় এক সচেতন জনমত গড়ে তোলা। এই জনমত যদি গড়ে ওঠে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি ভারতের দাবী ও তার প্রয়োজনকে তুলে ধরে ভারতের একটা সঠিক চিত্র ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা যায় তাহলে যা ন্যায্য ও যুক্তি সঙ্গত, তা অগ্রাহ্য করা ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে অসম্ভব হবে। রমেশ দত্ত এটাই বিশ্বাস করতেন। ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক অবাঞ্ছিত ও মূলত অন্যায়—এ কথা রমেশ দত্ত মনে করতেন না। অবশ্য তরুণ

রাজনীতিকদের সঙ্গে এখানে রমেশ দত্তের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। অন্যদিকে রমেশ দত্ত মনে করতেন, ভারত লাভবান হবে বলেই ঈশ্বরের কৃপায় ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়িত। ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন যে অন্যায় ও অবিচার করে যাচ্ছিল, সেদিনকার দিনে খুব কম লোকই তা জানতো। কিন্তু রমেশ দত্ত বিভিন্ন উপলক্ষে এইসব বিষয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আগেই আমরা দেখেছি, অর্থনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, পৃথিবীর যে কোনো ভোটদাতার মত ব্রিটিশ ভোটদাতা নিরপেক্ষ ও যুক্তিনির্ভরশীল। কিন্তু সে যদি তার নিজের স্বার্থ না বোঝে তাহলে সে ব্রিটিশ ভোটারের মর্যাদা রাখতে পারবে না। সুতরাং রমেশ দত্ত একটা কথা খুব ভালভাবেই জানতেন যে, ব্রিটিশ নাগরিককে দোষ দিয়ে লাভ নেই—দোষ দিতে হয় এই পদ্ধতিকে, এই অবস্থাকে—যা একটি দেশকে অন্য দেশের শাসক করে রেখেছে এবং যে দেশ সম্বন্ধে সে সত্যিসত্যি আগ্রহশীল নয়। তবুও রমেশ দত্ত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইন্দো-ব্রিটিশ সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়েও পদ্ধতিগত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার দোষত্রুটি দূর করা সম্ভব। তিনি তাই বার বার বলেছেন যে, প্রশাসনের উচ্চতর পদে বেশীর ভাগ বিদেশীরা রয়েছেন এবং তার ফলে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি যার দ্বারা নীতি নির্ধারণের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতীয় বক্তব্যকে পেশ করা সম্ভব হতো। তাঁর মত, এটাই ভুল সিদ্ধান্তের মূল কারণ। রমেশ দত্তের এই অভিমত কিছুটা নিশ্চয় সত্য। কারণ প্রশাসন বিভাগের উচ্চ পর্যায়ে যদি প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা অথবা ব্যক্তি থাকতো তাহলে ভারতীয় বক্তব্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া প্রশাসক কর্তৃপক্ষের পক্ষে অতটা সহজ হতো না। তবে যতদিন পর্যন্ত ক্ষমতা অব্যাহত রয়েছে, ততদিন এক ঔপনিবেশিক শক্তি তার মূলগত স্বভাব পালটে ফেলবে—এটাও দুরাশা। সুতরাং রমেশ দত্ত গঠনব্যবস্থার পরিবর্তনের যেসব

কথা বলেছেন—সেটা যদি গ্রহণও করা হতো—তাহলেও এটা স্থায়ী সমাধান হতো কিনা সন্দেহ, তবে ব্যাধির সাময়িক প্রশমন নিশ্চয় হতো।

ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে তিনি যেমন মূল্য দিতেন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বোঝাপড়া ও আলোচনার পথে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। চাকরী থেকে অবসর নিয়ে তিনি বহু দিন ইংলণ্ডে কাটিয়েছেন। সমগ্র ইংলণ্ডে ব্রিটেনের জনগণের সামনে তিনি নানা বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। কখনও বা সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়ে, যেমন কলকাতা পৌর বিল অথবা প্রস্তাবিত কোন সংস্কার সম্পর্কে তিনি পদমর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁর প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়েছিল। কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কোনো প্রশাসন বিভাগের চেহারা বা প্রকৃতিগত কাঠামোর রূপান্তর ঘটানো যায়না। "উগ্রপন্থীরা" এইসব পদ্ধতিকে বলতেন, "আবেদন ও প্রার্থনা।" তাঁদের বক্তব্য ছিলো যে, যে পদ্ধতিকে জোর করে ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যার দ্বারা কিছুসংখ্যক লোকের স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে—তার পরিবর্তন আবেদন বা প্রার্থনা দ্বারা আনা সম্ভব নয়। এটাও জোরাল বক্তব্য। কিন্তু রমেশ দত্ত ও সাধারণভাবে "মধ্যপন্থীদের" স্বপক্ষে একটা কথা বলা নিশ্চয় উচিত যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও সুনির্দিষ্ট কোনো পরিপূরক কার্যসূচীর রূপরেখার উদ্ভব হয়নি। তখন, বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছরে, সন্ত্রাসবাদ খুবই জোরাল হয়ে ওঠে। এটা ঠিক যে, তখন হিংসার পথকে অনুসরণ করে বহু তরুণ ও বীর সন্তান দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগ করেছেন। কিন্তু তবুও তখনকার চলতি যে রাজনৈতিক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিলো তা যত নিরর্থক প্রতিপন্ন হোক—সন্ত্রাসবাদ এই কার্যসূচীর পরিপূরক পন্থা হয়ে উঠতে পারেনি। তবে বৈপ্লবিক আন্দোলন জনমতকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছিলো। উপনিবেশবাদবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতেও

বিপ্লবের আন্দোলন সহায়ক হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর সশস্ত্র ও শক্তিশালী ক্ষমতার বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের সাফল্যের সুযোগ ছিল কম কারণ এ আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল বিচ্ছিন্ন, অসম্বদ্ধ। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যেদিন গণ আন্দোলন শুরু হলো, যেদিন অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের মত কার্যসূচী সার্থক হয়ে ওঠে সেদিন আমরা এমন একটা কর্মপদ্ধতি বার করতে পেরেছিলাম যা প্রশাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। যতদিন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন এ আন্দোলনের গুরুত্ব শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করেননি। যখন আন্দোলন জনসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, যেদিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যাপকতর হলো—সেদিন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন যে দেশের আপামর জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে ভারতকে আর দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধির ফলেই ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাতে দেশ শাসনের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক আন্দোলন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। সুতরাং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই সেদিন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যে গণ-আন্দোলনের সূচনা করেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা সম্ভব বলে ভাবা যেতো না। প্রকৃতপক্ষে গণ-আন্দোলনের সময় তখনও আসেনি কারণ অন্যায় ও অবিচার করা হচ্ছে—এ ধারণা ও বোধ যখন বদ্ধমূল হয় তখনই কেবল গণ-আন্দোলনের সূচনা করা সম্ভব। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নীতি মূলতঃ যে একটা অন্যায় নীতি, এ ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে অত ব্যাপক হয়ে ওঠেনি, যতটা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অন্যায় কার্যের জন্য শাসকগোষ্ঠী দায়ী—সেদিন তা অনুভব করার মত অত বেশী লোক ছিল না। রমেশ দত্তের এইখানেই কৃতিত্ব যে তিনি ব্রিটিশ শাসনের আর্থিক ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। দেশবাসীর ওপর যে অন্যায় করা হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের সজাগ করে তোলেন। তাই রমেশ দত্ত এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করতে সক্ষম

হয়েছিলেন যার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। শুধু তাকে কার্যে রূপায়িত করতে মহাত্মা গান্ধীর মত জননেতার প্রয়োজন ছিল। যে আন্দোলনের উপযুক্ত সময় এসেছে এক দশক বা দুই দশক পরে—সেই আন্দোলনকে তাঁর আগে সূচনা করতে বা তার জন্য প্রচারকার্য চালাতে সক্ষম হননি বলে রমেশ দত্ত ও তাঁর যুগের নেতাদের দোষী করে লাভ নেই।

সেদিন রাজনৈতিক আন্দোলন কিভাবে এগোচ্ছে বা এগোবে—সে সম্পর্কে রমেশ দত্ত ও মধ্যপন্থীদের অভিমত উল্লেখ করার মতো। রমেশ দত্ত মিণ্টো-মরলে সংস্কার সাধনের প্রস্তাবে সেদিন সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হবে সেইসব প্রস্তাব রূপায়ণ করলেও একটা গণতান্ত্রিক সরকারের সূচনা করা যেতো না। তিনি ধীরে ধীরে এগোতে চেয়েছিলেন কারণ নিঃসন্দেহে এর পিছনে ছিল তাঁর সাবধানতা আর তাঁর বিশ্বাস যে, গণতান্ত্রিক পন্থা-পদ্ধতিতে লোকেদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে। তাঁর অভিমতের সমর্থনে একথা বলা যায় যে, ইংলণ্ডের মত দেশেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে বহু বছর লেগেছে। এটা সত্য কথা। কিন্তু ধীরে ধীরে বিবর্তন আনার কার্যসূচীকে যদি সফল করতে হয়—তাহলে শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতার প্রয়োজন। ধরে নিতে হয় যে শাসকগোষ্ঠীরা ধীরে ধীরে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত। কিন্তু এটা অনুমান করার মত কখনই কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই সহযোগিতার অভাবে, কোনো সময়ে যদি কোনো সংস্কার সাধন করাও হয় তার সার্থকতা নির্ভর করে অবস্থার প্রয়োজন বা গুরুত্বের ওপরে ততটা নয়, যতটা দুই পক্ষের পারস্পরিক শক্তির ওপরে। অবশ্য রমেশ দত্তের ব্রিটিশ সরকারের শুভবুদ্ধির প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ছিল বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন, এ দেশের স্বার্থেই ধীরে ধীরে তাঁর হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শুভ হতে বাধ্য এই বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর অন্য অভিমতের একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। শুভ ফল

তখনই হবে যখন শাসকগোষ্ঠীর সামনে প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয়দের বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব হবে।

রমেশ দত্তের জীবন ও তাঁর লেখা বই পত্রের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আভাস দেয় যে তাঁর প্রতিভা কত বহুমুখী ছিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার কতটা বিকাশ ঘটেছিল। অনেক বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল এবং অনেক ব্যাপারে তিনি তাঁর সমসাময়িককাল থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। এই অবদান সঠিকভাবে নির্ণয় করা মুশকিল, এমন কি, তুলনামূলক বিচারও শক্ত। তবে তুলনামূলক বিচার যদি করতেই হয়, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি বোধ হয় দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পক্ষে উল্লেখযোগ্য অবদান বলে বিবেচিত হবে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান এড়িয়ে যাবার উপায় নেই; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কিন্তু 'অর্থনৈতিক ইতিহাস' এবং 'ভারতের দুর্ভিক্ষ'—দুটি গ্রন্থ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যতটা পাথেয় জুগিয়েছে এমনটা আর কিছুতে নয়। এইসব তথ্য এমনভাবে বিবৃত যে, এসব বিষয়ে আগ্রহ বাড়ে বই কমে না, এতে এমন সব অভিমত স্থান পেয়েছে—সময়ের ব্যবধানে যার মূল্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। তর্ক তুলে অবশ্য বলা যায় যে, অর্থনৈতিক ইতিহাসে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে কোনো অর্থনৈতিক কার্যসূচীর রূপরেখা তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হননি। কিন্তু এ তর্ক তুলে লাভ নেই। কারণ অর্থনৈতিক প্রশাসনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণই তিনি দিতে চেয়েছিলেন, অর্থনৈতিক কার্যসূচীর রূপরেখা রচনা করতে চাননি। কোন্ কোন্ আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার ও কোন্ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, দেশের আর্থিক অবস্থার যাতে আর অবনতি না ঘটে—তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবিলম্বে নেওয়া দরকার—সেসব নিয়েই তিনি ভেবেছেন। তখন ছিল ঔপনিবেশিক শাসন, উপনিবেশবাদের আর্থিক নীতি নিয়ে অনুশীলন করার প্রশ্নটাই সেদিন ছিল

বড়। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী যে আত্মসন্তুষ্টি ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলো যে এ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হচ্ছে—সেদিন তার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। দেশের জনসাধারণের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার দরকার ছিল। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যে অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করছিলেন দেশের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল কিনা—দেশবাসীর সে বিচারক্ষমতা থাকা প্রয়োজন ছিল। অর্থনৈতিক বিষয়ে রমেশ দত্তের নিবন্ধ ও গ্রন্থগুলি চমৎকারভাবে এ প্রয়োজন মিটিয়েছে।

ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর অনুশীলন বিচার করে দেখলে মনে হয়, রাজনৈতিক চিন্তাধারার চেয়েও এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনেক বেশী প্রগতিবাদী। নিঃসন্দেহে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আমূল সংস্কারে বিশ্বাসী লোকদের আবির্ভাব ঘটলো, তখন রমেশ দত্তের চিন্তাধারায় তাঁরা উপকৃত হয়েছিলেন, যদিও রমেশ দত্ত নিজে পুরোপুরি এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর বই 'অর্থনৈতিক ইতিহাস'-এ তিনি দেখিয়েছেন যে, সেই পুরোনো আমলে, ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে তাঁর নিজের জীবদ্দশা পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে যখন ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত লেগেছে—তখন উপনিবেশবাদের প্রয়োজনে অর্থৈনতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা এমনভাবে নিয়োজিত করা হচ্ছিল যাতে ভারত ব্রিটেনের আর্থিক প্রয়োজন সর্বতোভাবে মেটাতে পারে এবং সেভাবেই সে গড়ে ওঠে। এর থেকে দুটি বিষয়ে চূড়ান্ত ধারণা করা যায়। এক, উপনিবেশবাদের যে পদ্ধতি অনুসারে একটি দেশ অন্য দেশকে শাসন করে, তা অন্যায়। এ মতবাদ কিন্তু রমেশ দত্ত খোলাখুলি ও সুস্পষ্টভাবে কখনও প্রচার করেননি। কিন্তু তিনি এ মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। জন

স্টুয়ার্ট মিলের অনুমতি নিয়ে তাঁর মতবাদ নিজের বইতে উদ্ধৃত করেছিলেন যে, একটি দেশ অন্য দেশকে শাসন করবে—এটা কখনও হতে পারে না। তাই তখনকার দিনের উপনিবেশ অঞ্চলের মত ভারত কবে স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা পাবে—তার জন্যেই তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সাবধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি একথাই ভাবতেন যে, পর্যায়ক্রমে ভারত তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছবে। তবে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা তিনি কখনও, কোন পর্যায়ে ভাবতে পারতেন না।

তাঁর অর্থনৈতিক অনুশীলন থেকে দ্বিতীয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তা হলো এই। উপনিবেশবাদ ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শক্তির সহায়ক। সেই শক্তিরই স্বার্থে তাকে বাঁচিয়ে রাখা। সেই সময় যে অর্থনৈতিক আস্থা ছিল তাতে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা চালু রাখা সবচেয়ে সুবিধাজনক ছিল। সুতরাং যতদিন না স্বদেশে ঔপনিবেশিক শক্তির আর্থিক ব্যবস্থা ও গঠনাকৃতির একটা আমূল পরিবর্তন ঘটছে অথবা উপনিবেশবাদ প্রচলন রাখা অসুবিধাজনক প্রতিপন্ন হচ্ছে—ততদিন এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবার কোনো আশা নেই। অথবা সেই ঔপনিবেশিক অঞ্চলে এমন অবস্থার যদি সৃষ্টি হয় যখন সেই ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষে আর শাসন করে যাওয়া সম্ভব নয় তখন এ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। রমেশ দত্ত এই মতবাদকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন না। তিনি মনে করতেন, এই প্রচলিত ব্যবস্থার যে অবনতি ঘটেছে তা ব্রিটেনে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করলে দূর করা সম্ভব হবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন ভারতে একটা জনমত গড়ে উঠুক। ব্রিটেনের জনগণের সামনে ভারতের এ অভিমত তিনি জোরালভাবে পেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কখনই চাননি যে ভারতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হোক যেখানে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো সার্থকতা থাকবে না অথবা তা প্রচলিত রাখা ঔপনিবেশিক শক্তির পক্ষে আর সুবিধাজনক বলে গণ্য হবে না।

সাধারণ মানুষ যেমন, তেমনি মহৎ ব্যক্তিদেরও যে পরিবেশে জন্ম, যে পরিবেশে তাঁরা বাস করেন, কর্মসাধনায় মগ্ন হন সেই পরিবেশেরই তাঁরা হাতে-গড়া মানুষ। এইসব বিচিত্র প্রভাব, সাংস্কৃতিক পরিবেশকে অন্যের চেয়ে যে মানুষ নিজের করে নিতে পারেন, এর মূল বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমাজের কল্যাণের জন্য এই বিশিষ্ট ধারাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারেন—তিনি মহৎ। নিউটন বিরাট বিজ্ঞানী ছিলেন কারণ তাঁর সমসাময়িককালের বিজ্ঞানকে তিনি যে শুধু নিজের করে নিয়েছিলেন তাই নয়, বিজ্ঞান জগতে তাঁর অবদান এমন একটা পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলো যা ভবিষ্যৎ বংশধরদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী হিসেবে নিউটনের যে মর্যাদা ছিল, তিনি আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত পূর্বাহ্নে কল্পনা করতে পারেননি বলে তাঁর সে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। নিউটনের কালে আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানী জন্মাবার সময় আসেনি। এই একই মাপকাঠিতে যদি আমরা বিচার করি তবে দেখবো, যে মানুষটির অবদানের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে যেতে পেরেছে তাঁর মহত্ব ও কীর্তি স্মরণীয় হয়ে থাকবার মত। ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যাবে তিনি পুরোপুরি তা অনুমান করতে পারেননি কিন্তু তার ফলে তাঁর মর্যাদা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি অথবা আধুনিক ভারতের স্রষ্টা হিসেবে তাঁর মূল্য কমে যায়নি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে যেসব মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রমেশ দত্তের কথা কৃতজ্ঞ ভারতবাসী চিরকাল মনে রাখবে, তারা জানবে, রমেশ দত্ত ছিলেন তাঁদেরই একজন যাঁরা স্বাধীন ও মুক্ত ভারত গড়তে সহায়ক হয়েছিলেন—আজকের এই ভারতবর্ষ।

পরিশিষ্ট-১

রমেশ চন্দ্র দত্তের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী

জন্ম … … …	১৩ই আগস্ট, ১৮৪৮
মাতঙ্গিনী (মোহিনী) বসুর সঙ্গে বিবাহ …	১৮৬৪
ইংলণ্ড যাত্রা … … …	৩রা মার্চ, ১৮৬৮
ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ …	১৮৬৯
আলিপুরের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে প্রথম সরকারী পদে যোগদান …	সেপ্টেম্বর, ১৮৭১
ছুটিতে ইউরোপ ভ্রমণ … … …	এপ্রিল, ১৮৮৬ থেকে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭
ছুটিতে দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ … …	১৮৯৩
ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে ছুটি নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ …	জানুয়ারী, ১৮৯৭
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (লক্ষ্ণৌ অধিবেশন) সভাপতি …	ডিসেম্বর, ১৮৯৯
বরোদার রাজস্ব মন্ত্রী রূপে কার্যভার গ্রহণ …	আগস্ট, ১৯০৪
বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সদস্য পদ গ্রহণ …	১৯০৭
বরোদার দেওয়ান পদে নিযুক্ত … …	১লা জুন, ১৮০৯
মৃত্যু … … …	৩০শে নভেম্বর, ১৯০৯

পরিশিষ্ট-২

রমেশ চন্দ্র দত্ত রচিত কয়েকটি বিখ্যাত পুস্তক

			প্রকাশের তারিখ
১	থ্রী ইয়ার্স ইন ইয়োরোপ		১৮৭২
২	পেজান্ট্রি অফ বেঙ্গল		১৮৭৫
৩	লিটারেচার অফ বেঙ্গল		১৮৭৭
৪	বঙ্গবিজেতা	বাংলায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস	১৮৭৯
৫	মাধবী কঙ্কণ		
৬	মহারাষ্ট্র জা বন প্রভাত		
৭	রাজপুত জীবন সন্ধ্যা		
৮	বাংলা ভাষায় ঋগ্‌বেদের অনুবাদ		১৮৮৫
৯	সংসার—বাংলায় রচিত সামাজিক উপন্যাস		১৮৮৫
১০	হিস্টরি অফ সিভিলাইজেশন অফ এন্‌সেন্ট ইণ্ডিয়া		১৮৯০
১১	সমাজ—বাংলায় রচিত সামাজিক উপন্যাস		১৮৯৩
১২	লেজ্‌ অফ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া (ইংরেজী কাব্য)		১৮৯৪
১৩	ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া		১৮৯৭
১৪	মহাভারত (ইংরেজীতে—কবিতা)		১৮৯৮
১৫	রামায়ণ (ইংরেজীতে—কবিতা)		১৮৯৯
১৬	ফেমিনস্‌ ইন ইণ্ডিয়া		১৯০০
১৭	ইকনমিক হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া		
	প্রথম খণ্ড		১৯০২
	দ্বিতীয় খণ্ড		১৯০৪

পরিশিষ্ট—৩

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ

গত অক্টোবর মাসে আমার বন্ধু মিঃ ব্যানার্জীর মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভায় সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ যখন পেলাম, আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, একটু বিস্মিত যেমন হয়েছিলাম, তেমনি আশঙ্কাও হয়েছিল কিছুটা। গত পনের বছর ধরে আমার অবসর সময়ের বেশীর ভাগ আমি খুশী মনে একটা সার্থক কাজে ব্যয় করছি—আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের পিছনে যে সাহিত্যিক চিন্তাধারা ও কর্মসাধনার ঐশ্বর্য রেখে গেছেন তাকে আমার দেশবাসীর ও আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছি। টেবিলে বসে কাজ করতেই অভ্যস্ত। সেখান থেকে সোজা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াবার সম্ভাবনায় আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ঘাবড়াবার যুক্তিসঙ্গত কারণ যে নেই তাও নয়, কারণ গত কয়েক বছর ধরে দেশ যাঁদের নিয়ে গর্ব করতে পারে এ যুগের এমন সব সুযোগ্য ও মেধাবী বক্তা এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে যেসব ভাষণ দিয়েছেন সেসব ভাষণ আমি পড়েছি। পড়ে একথাই ভেবেছি, এ বছর আমাকে পৌরোহিত্য করতে বলে আপনারা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন কিনা। আমার ওপরে এ কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন তা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারছি। এ কাজের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে সমাধা করার মত সুযোগ্য মানুষ এখানে উপস্থিত। তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি সত্যিই নিজেকে একজন সম্মানিত ব্যক্তি বলে গণ্য করতে পারছি। ভাল বা মন্দ হোক, আপনাদের প্রস্তাব আমি গ্রহণ করেছি। আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। একজন সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা শোনার ধৈর্য যদি

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয় লক্ষ্ণৌতে, ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে

আপনাদের থাকে তাহলে আজকের দিনের প্রশাসন সম্বন্ধীয় প্রশ্নের কতকগুলি বাস্তব প্রস্তাব আমি সহজ কথায় বলতে চাই।

বলা বাহুল্য যে, গত কয়েক বছর ধরে এইসব প্রশ্ন আমার মনকে ছায়ার মত ঘিরে রেখেছে। এ নিয়েই আমি ভেবেছি, গত দু'বছর যাবৎ এসব বিষয়েই বলছি। লিখছিও, গত ২৬ বছর ধরে সরকারী চিঠিপত্রে এসব বিষয়েই অনবরত মাথা ঘামাতে হয়েছে। আপনারা হয়তো জানেন যে, প্রশাসনিক প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা উঠলে, ভারত সরকার ও স্থানীয় সরকার সরকারী চিঠিপত্রে পদস্থ কর্মচারীদের নির্দ্বিধায় তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আলোচনার সময় সিভিল সার্ভিসের লোকেরা অনেক কিছু জানতে পারেন, পরস্পরের মতামতকে সম্মান করতে শেখেন এবং পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে আমরা এবারে কংগ্রেসের অধিবেশনে মিলিত হয়েছি। বাংলাদেশের প্রজাস্বত্ব বিল পাশ হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। এই বিল নিয়ে আলোচনার সময়ই এই প্রদেশগুলির বর্তমান লেফটন্যাণ্ট গভর্নরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সে কথা স্মরণ করতেও আমার গর্ব হয়। এই সহানুভূতিশীল ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে নিয়ে আপনাদের মত বাংলাদেশের তরফ থেকে আমরা গর্বিত কারণ তিনি আসলে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের লোক।

ভদ্রমহোদয়গণ, সরকারীভাবে আলোচনার সময় আমি অনেক সময় অনুভব করেছি দেশের প্রশাসনে ভারতের জনসাধারণের আরও বেশী সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া দরকার। মনে করেছি প্রশাসন বিভাগের সংস্কার সাধনের জন্য আমার সুপারিশ পেশ করা কর্তব্য। এখন আমি সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়েছি। তবু জনগণের সহায়তায় প্রশাসন বিভাগকে শুভ ও সাফল্য-জনক করে তোলার মহান ব্রতে বর্তমান সরকারকে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া এখনও আমি কর্তব্য মনে করি যদিও আমার ক্ষমতা এখন সীমিত। ভারতীয়

জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যও তাই, জনগণের সহযোগিতায় প্রশাসন বিভাগকে সুদক্ষ করে তুলে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে সাহায্য করতে ও বাঁচিয়ে রাখতে আপনারাও চান। এই কারণেই আজকে আমি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের অভিমত ও আশাআকাঙ্খার সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণভাবে একাত্ম।

কংগ্রেসের ধর্মবিশ্বাস

ভদ্রমহোদয়গণ, উৎসাহী প্রকাশক মিঃ নটেসন্ কংগ্রেস সম্পর্কে যেসব পুস্তিকা ও বই ছেপেছেন তার বেশীর ভাগ আমি পড়েছি। যাঁরা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশাআকাঙ্খা, অভিলাষ ও উদ্দেশ্য সত্যি সত্যি জানতে চান, তাঁদের আমি এসব বই ও পুস্তিকা পড়তে বলি। এই বই-এর সৎ সমালোচক যদি কেউ থাকেন তাহলে তিনি এর প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত একটা জিনিস দেখতে পাবেন। জনগণের সহায়তার ভিত্তিতে এ সরকারকে বাঁচিয়ে রাখা ও তাকে সমর্থন করার আন্তরিক প্রয়াস, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের হাতকে মজবুত করা এবং জনগণের আশাআকাঙ্খা ও অভিমত সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকিবহাল করার প্রচেষ্টা—এই বইতে সেসব কথাই রয়েছে। এসব কাজ পৃথিবীর যে কোন দেশের প্রশাসকদের পক্ষে খুবই জরুরী এবং মূল্যবান বলে গণ্য। ভারতের পক্ষে এসব কাজের গুরুত্ব দ্বিগুণ কারণ কার্যনির্বাহক পরিষদ ও সেক্রেটারিয়েটে ভারতীয়দের কোনো প্রতিনিধি নেই অথচ কার্যনির্বাহক ও আইনগত ব্যবস্থা এখানেই প্রথম কার্যে রূপায়িত হয়। ভদ্রমহোদয়গণ, মনে রাখবেন আলোচনার জন্য যে প্রশ্নই আসুক তার দু'টো দিক আছে। যে কোন প্রশ্নের সমাধান করার আগে দু'পক্ষেরই প্রতিনিধি থাকা দরকার এবং দু'পক্ষের অভিমত শোনা শুধু জরুরীই নয়, বাঞ্ছনীয়ও বটে। তাই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অমর্যাদা না করেও বলতে পারি ওখানে শুধু ভারতীয় সমস্যার সরকারী অভিমতই সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। ভারতীয় সিভিল

সার্ভিসে আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বছরগুলি আমি কাটিয়েছি। যেসব. সুযোগ্য ও কর্মঠ ব্যক্তিদের নিয়ে এই সার্ভিস গড়ে উঠেছে তাঁদের সৎ উদ্দেশ্য বা তাঁদের দক্ষতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এই সার্ভিসে আমার সহকর্মীদের বন্ধুত্বের কথা আমি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি, তাঁদের সঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করে ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ নিয়ে আমার চাকরী জীবন কেটেছে। আমার সিনিয়র অফিসরের কাছ থেকে যে ন্যায্য ও চমৎকার ব্যবহার পেয়েছি এবং জুনিয়র সহকর্মীদের কাছ থেকে আনুগত্য ও সহযোগিতা—তা আমি ভুলতে পারি না। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের দোষ ও ত্রুটি নিশ্চয় রয়েছে। কিন্তু সৎ উদ্দেশ্য ও কঠোর পরিশ্রমের দিক থেকে বিচার করে আমি একথাও বলতে চাই যে, এমন চমৎকার প্রশাসকগোষ্ঠী পৃথিবীতে খুব একটা দেখা যায়না। তবুও কোন অমর্যাদা না করে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতের সমস্যার সরকারী অভিমত প্রতিফলিত, তা জনগণের অভিমত নয় এবং তা হতেও পারে না। প্রত্যেকটি প্রশ্নের দু'টো দিক আছে। ভালভাবে ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে যদি সরকার ও প্রশাসন বিভাগ চালাতে হয় তাহলে প্রত্যেকটি প্রশ্ন সম্পর্কে সরকারী অভিমতের সঙ্গে জনগণের অভিমতও জানা ও শোনা খুবই দরকার। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা। স্থানীয় প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁরা জনগণের অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু এই জাতীয় কংগ্রেস ভারতের একটি মাত্র সংস্থা যার মাধ্যমে সমস্ত বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এবং একটা কথা ব্যবহার করার যদি অনুমতি পাই, তবে বলবো—সাম্রাজ্য সংক্রান্ত প্রশাসনিক প্রশ্ন সম্পর্কে সারা ভারতের জনগণের আশাআকাঙ্খা তুলে ধরা হয়। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস সরকারের যে কতটা উপকার করছেন তা বলাই বাহুল্য। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সরকার এর মূল্য বোঝেন, স্বীকার করেন। আমরা কি ভাবি, কি চাই, কি অনুভব করি—প্রশাসন বিভাগের তা জানলে লাভই হবে। আমাদের যা

দাবী তা সব সময় পূরণ করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের কি দাবী তা জানা লাভদায়ক। আমাদের সঙ্গে সব সময় একমত হতে না পারলেও, আমরা কি চাই, আমাদের আশাআকাঙ্খা কোন দিকে ধাবিত, দায়িত্বশীল প্রশাসকরা যদি তা জানতে পারেন—সেটা তাঁদেরই লাভ। বছরে বছরে আপনারা এখানে মিলিত হয়ে যেসব বিষয়ে চিন্তা করছেন, আলোচনা করছেন, তাতে আপনারা ভারতে উপযুক্ত সরকার ও যোগ্য প্রশাসন গড়ে তোলায় সাহায্য করছেন বলে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। আমি আশা করি ভবিষ্যতেও এই আলোচনা আপনারা চালিয়ে যাবেন। আমার বিশ্বাস আগেও যেমন করেছেন, ভবিষ্যতেও আপনারা প্রশাসকদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে, শুভবুদ্ধি ও আত্মসংযমের পরিচয় দিয়ে এবং জনগণের প্রকৃত স্বার্থের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে সরকারকে সাহায্য করে যাবেন। এ প্রয়াসে আমরা কখনও ব্যর্থ হব না; ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আমাদের হাতে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে—যেখানে রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—সেখানকার অগ্রগতির হিসাব নিয়েই আমি দৃঢ় বিশ্বাসে বলতে পারি সেই বৃহৎ সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে আমরাও এগিয়ে যেতে বাধ্য। ইংলণ্ডের এই সাম্রাজ্য-বাদের শাসনাধীন আমরাও যে কিছুটা এগিয়ে যাব এবং স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা পাব—এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার মতে এই হলো কংগ্রেসের আদর্শ ও বিশ্বাস। ভদ্রমহোদয়গণ, আজকে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে আমি গর্ব অনুভব করছি। এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজকে আমি ভাষণ দেবো। সমালোচনা করার জন্য নয়, গঠনমূলক সমালোচনা করতে। আমার আশা, সরকার এই প্রস্তাবগুলির যথাযোগ্য মূল্য দেবেন।

১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ

ভদ্রমহোদয়গণ, দু'বছর আগে আনুগত্য ও শুভেচ্ছার মনোভাব নিয়ে আপনারা মহারানীর শাসনের ষষ্ঠতম বার্ষিকী ভারতে সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপন করেছেন। সেদিন আমি ইংলণ্ডে ছিলাম, লণ্ডনে আনন্দের সঙ্গে আমি এই

জাঁকজমকপূর্ণ সমারোহ নিজের চোখে দেখেছি। মাননীয় রানী রাজকীয় সম্মানে ছ'মাইলের এই পথে এগিয়ে চলেছেন, তাঁর আগে ও পিছনে চলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। ছ'মাইল পথে সমবেত পাঁচ লক্ষ ইংরেজ হর্ষধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছেন। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিদল যখন রানীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন—লোকেরা হর্ষধ্বনি করে উঠছেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে দেখে সমবেত জনতা যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, যেভাবে হর্ষধ্বনি করে উঠেছিলেন—এমনটা আর কোনো দেশের ব্যাপারে চোখে পড়েনি—ভারতীয় নৃপতি ও রাজাদের যেমন রাজকীয় ব্যবহার তেমনি শ্রীমণ্ডিত পোষাক-পরিচ্ছদ, যেমন পুরুষোচিত ভঙ্গি তেমনি যোদ্ধার মত চেহারা। সত্যি দেখবার মত দৃশ্য—দেখলে মনটা খুশীতে ভরে যায়। কিন্তু তার ওপর একটি বিষণ্ণ ছায়া পড়েছিল। ব্রিটেনের জনগণ অনুভব করেছেন, ব্রিটিশ সংবাদপত্র লিখেছে, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা বলেছেন যে, ঐ শোভাযাত্রায় ভারত ছাড়া আর যেসব স্বায়ত্বশাসিত উপনিবেশ যোগ দিয়েছে তাদের প্রত্যেকটি দেশ সমৃদ্ধ ও খুশী। একমাত্র ভারত তার বিরাট জনসংখ্যা নিয়ে তখনো দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে ; ভারতের বিস্তৃত এলাকায় দুর্ভিক্ষের করাল-ছায়া! আর কোনো বছর দুর্ভিক্ষ এত ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। পৃথিবীর অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত দেশে দুর্ভিক্ষের নাম পর্যন্ত শোনা যায় না। অথচ ভারতে এরকম দুর্ভিক্ষ হয় কেন—সে প্রশ্ন উঠলো। ভারতের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষে ব্রিটিশ শাসন আশীর্বাদ কিনা সন্দেহ প্রকাশ করা হলো।

সুধীগণ, ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষতে দুর্দশার শেষ হয়নি, আমাদের সীমান্তের বাইরে তখন যুদ্ধ চলছিল। তারজন্য আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়। আমাদের অনেক বীর সন্তান প্রাণ দেয়। সেই সঙ্গে প্লেগের মহামারী। যে নির্মম ধ্বংসলীলা শুরু হয়েছিল—তার ধাক্কা এখনও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এসব দুর্যোগের মধ্যে সরকার কতকগুলি নির্মম ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন অনুভব

করলেন। ৬০ বছর ধরে ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমরা ভোগ করে আসছিলাম। তার ওপরে বাধানিষেধ আরোপ করা সরকার যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। ১৮৯৭ সালের মর্মান্তিক ঘটনাবলী আবার চর্বিতচর্বন করার অভিপ্রায় আমার নেই; যদিও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডের রানীর হাতে চলে যাবার পরে যত দুর্যোগের বছর গেছে, ১৮৯৭ সাল তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক বছর। যখন কুখ্যাত রাজদ্রোহ সংক্রান্ত বিলটি পাশ হয়ে গেল ভারতে ও ইংলণ্ডে তখন যে সব আলোচনা হয়—তা পুনরাবৃত্তি করাও আজকে আমার অভিপ্রায় নয়।

১৮৯৮ সালের রাজদ্রোহ আইন

১৮৯৮ সালে রাজদ্রোহ আইন সংক্রান্ত এই বিলগুলি ভাইসরয় কাউন্সিল এবং কমন্স সভায় পাশ করার সময় যে বিতর্কের ঝড় ওঠে তা স্মরণ করতেও আমি আঘাত পাই। কমন্স সভায় বিতর্ক শোনার সৌভাগ্য আমার হয়, যাঁরা ভাইসরয় হাউস এবং কমন্স সভায় আমাদের জন্য এভাবে সংগ্রাম করেছেন, আমাদের পক্ষ নিয়ে জোরালো তর্ক করেছেন, তাঁরা সফল হননি বটে কিন্তু তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। শুধু আমি নই, এ দেশের সব শিক্ষিত মানুষেরই এই মনোভাব। এইসব আলোচনা আমি আবার তুলতে চাইনা, কিন্তু যখন এই বিলগুলি পাশ হয়ে গেছে, যখন সংগ্রাম থেমে গেছে, আমি মাঝে মাঝে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি এ দেশে কি এমন একজনও ইংরেজ আছেন যিনি ভারত ও তার জনগণকে গভীরভাবে জানেন এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল? আমার জানতে ইচ্ছে করে তিনি কি ভাবেন, এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কোন্ প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল হবে? এতে সরকারের হাত আরও মজবুত হয়েছে কিনা অথবা য়ুরোপের কাছে এ সরকারের মর্যাদা বেড়েছে কিনা। সুধীবৃন্দ, একটা সাংঘাতিক ভুলের ওপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল—শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে রাজদ্রোহকে এক করে

দেখাটাই মস্ত বড় ভুল। সত্য কিন্তু এর ঠিক উল্টো। ইংরেজী শিক্ষার ফলে এ দেশে কোন রাজদ্রোহীর জন্ম হয়নি, বরং ইংরেজী শিক্ষা সরকারের হাতে সব-চেয়ে বড় অস্ত্র—যাকে ব্যবহার করে সরকার গত পঞ্চাশ বছরে এ দেশ থেকে সত্যিকারের রাজদ্রোহিতা নির্মূলকরতে পেরেছেন। ১৮৫৭ সালের সেই তমসাচ্ছন্ন দিনগুলিতে কিংবা তার আগেই বরং এ দেশে সত্যিকারের রাজদ্রোহ ছিল—এই বিরাট সাম্রাজ্যকে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন ও সুপ্ত অভিপ্রায় তখনও স্তিমিত হয়নি। অজ্ঞতায় এ বাসনার জন্ম! এ অসন্তোষের বীজ ছিল অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে সরকার সে অসন্তোষকে সফলতার সঙ্গে নির্মূল করেছেন। ভারতের গভর্ণর জেনারেলদের মধ্যে লর্ড ডালহৌসির মত এত বড় সাম্রাজ্যবাদী আর কেউ ছিলেন না, ১৮৫৪ সালের বিখ্যাত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে স্কুলগুলিতে শিক্ষা বিস্তার করে ডালহৌসি এ সাম্রাজ্যকে শুধু যে সুরক্ষিত করেছেন তাই নয়, একে শক্তিশালীও করেছেন। সেই তমসাচ্ছন্ন দিনগুলিতে লর্ড ক্যানিংএর মত সাম্রাজ্য বিস্তারের এত বড় সমর্থক আর কেউ ছিলেন না। তিনি কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে যাঁরা ভাইসরয় হয়ে আসেন, প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ তাঁরাও ঠিক একই নীতি অনুসরণ করেন। তার একই উদ্দেশ্য ছিল এবং সুফল হয়েছে। ভারতে যেখানেই শিক্ষার প্রসার হয়েছে, সেখানেই রাজদ্রোহের প্রবণতা বিনষ্ট হয়েছে। ভারতের কোনো অংশে রাজদ্রোহের প্রকাশ যদি এখনো থেকে থাকে —সে আছে অজ্ঞতার অন্ধকারে, শিক্ষার মুক্ত আলোয় ও বাধামুক্ত আলোচনার মধ্যে নেই। ভারতে রাজদ্রোহের শক্তিকে আমি যদি বাড়িয়ে তুলতে চাই, প্রথমে আমি চাইবো, বাধামুক্ত আলোচনা বন্ধ করতে। সব সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করবো। জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেবো। কারণ সিঁদেল চোর, চুরি করার আগে ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। সুধীবৃন্দ, আমি সাহস করেই একথা বলছি, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আপনাদের মনে যদি কেউ

বৈরী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারতো—আপনারা হয়তো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কাজ করতেন, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে বছরে বছরে এখানে সমবেত হতেন না, শাসকগোষ্ঠীর সামনে খোলাখুলি এবং আন্তরিকভাবে আপনাদের অভিমত পেশ করতে এগিয়ে আসতেন না। শিক্ষিত ভারত ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছে। ব্রিটিশ শাসনকে তাঁরা অব্যাহত রাখতে চান। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাঁরা অনুরক্ত। লর্ড ডাফরিণ ঠিকই বলেছেন, কোনো অনুভূতির তাগিতে তাঁরা এটা চাননা, চান নিজের স্বার্থের খাতিরে। তাঁরা ভাবেন, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে পারলেই শিক্ষিত ভারত স্বায়ত্ত-শাসনের বৃহত্তর সুযোগ পাবেন এবং বিশ্বের আধুনিক দেশগুলির মধ্যে নিজের যোগ্য আসন করে নিতে পারবেন। এটাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই তাঁদের প্রয়াস। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, ভাইসরয় কার্যনির্বাহক পরিষদে যদি আপনাদের একজন প্রতিনিধি থাকতেন, কার্যনির্বাহক পরিষদে রাজদ্রোহ আইনকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে যদি কোনো ভারতীয় সদস্য অংশ নিতে পারতেন—তাহলে তিনি এইসব দিক নিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। ভারতের কার্যনির্বাহক পরিষদের ধাঁচে যে সরকার পরিচালিত হয় তাকে এক তরফের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অন্য পক্ষের মতামত শোনার সুযোগ থাকে না। এরকম সরকার চালানোর এটাই বড় শাস্তি। কারণ, এক পক্ষের বক্তব্য তাঁদের সামনে জোরালভাবে পেশ করা হয়, অন্য পক্ষের কথা কেউ শুনতেও পারে না। এক পক্ষেরই সাক্ষী প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এবং অন্য পক্ষের কথা না জেনে যদি সর্বাপেক্ষা দক্ষ ন্যায়নিষ্ঠ ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন বিচারকও রায় দেন তবে ভুল করে বসবেন।

আর একটা কথা বলে এ বিষয়টি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমার দেখে দুঃখ হয় যে এ দেশের সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে তিক্ততা প্রকাশ পায়। আমার মত আন্তরিকভাবে ভাবেন ভারতের অনেক মানুষ। পাঁচ

বছর আগে আমি যখন বর্ধমানের কমিশনার ছিলাম, তখন এ বিষয়ে লিখবার সুযোগ হয়েছিলো। আমি যদি এখন সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে উল্লেখ করি, তাহলে এইজন্যে করবো যে রিপোর্টটিকে কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এখন এটা আর গোপনীয় সরকারী দলিল নয়। আমি সেই সময়ে এবং পরে আরও অনেক উপলক্ষে বলেছি যে, এ দেশের ইংরেজী সংবাদপত্র ও ভারতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে মতপার্থক্য সব সময় আছে ও থাকবে। ইংরেজী সংবাদপত্রের অভিমত, সার্বভৌম সরকার ভারতের পক্ষে একমাত্র যোগ্য ও সম্ভাব্য সরকারী ব্যবস্থা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক বা স্বশাসিত সরকার এদেশে চলবেনা। অন্য দিকে ভারতীয় সংবাদপত্রের এই বক্তব্য যে, জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর যদি কোনরকম নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে ভারতের মত এক বিরাট ও সুসভ্য দেশে কোনো ভাল সরকার গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দুর্ভিক্ষ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের এ নিদারুণ দারিদ্র্যের মত বড় সমস্যার কোনদিন সন্তোষজনক সমাধান হবে না। আমি তখন বলেছিলাম, এক পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব না দেখায়, কথাবার্তায় তিক্ত ভাষা ব্যবহার না করে, তবে এই পরস্পরবিরোধী অভিমত পোষণ করা সম্ভব। যে সব পত্রিকা প্রশাসনিক প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছেন—তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সামনে অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন এবং ভারতে অমঙ্গলের বীজ বপন করছেন। কিছুটা সহানুভূতি, কিছুটা শুভেচ্ছার মনোভাব, এবং প্রতিবেশী-সুলভ শিষ্টতা দেখিয়ে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি করা সম্ভব—রাজদ্রোহ আইন পাশ করে নয়। আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি প্রশাসনের কাজে ব্যয় করেছি, সেই হিসাবে বলতে পারি, আমি লক্ষ্য করেছি যে, ইংরেজী সংবাদপত্রে ভাষার সুর যখন নরম হয়েছে তখনই ভারতীয় সংবাদপত্র তাতে উৎসাহজনক সাড়া দিয়েছে। আমি এও লক্ষ্য

করেছি যে, সদ্ভাব ও সহৃদয়তার অভাব দেখা দিলে প্রশাসন বিভাগের অসুবিধা বেড়েই যায় এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়।

কলকাতা পৌরসভা

আমি অন্য বিষয়ে এখন কথা বলবো কারণ রাজদ্রোহ আইন অথবা অন্য কোনো আইন যা পাশ হয়ে গেছে তার সমালোচনায় এ ভাষণ ভরিয়ে তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়। সাম্প্রতিক পৌর আইন এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করে যে বাক্‌বিতণ্ডার ঝড় উঠেছে সে বিষয়েও দু'চারটি মাত্র মন্তব্য করে আমি প্রসঙ্গান্তরে যাবো। এইসব বাক্‌বিতণ্ডা আপনাদের মনে এখনও সজীব। আমাদের সভার কাজকর্ম বন্ধ হবার আগে অন্য বক্তারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেবেন। এ দুর্ভাগ্যজনক বিধানের পিছনে যে ইতিহাস আছে তাতে আমার একটা বড় সান্ত্বনা যে মাননীয় সার হেনরী ফাউলারের মত একজন অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কত না চেষ্টা করেছেন। কমন্স সভায় যে স্মরণীয় রাতে ভারতের প্রাক্তন সেক্রেটারী অফ্ স্টেট লিবারেল ফ্রন্ট বেঞ্চ থেকে ভাষণ দিচ্ছিলেন সে ভাষণ শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি মিঃ হারবার্ট রবার্টকে সমর্থন করেন। ইংলণ্ড গর্ব করে ভারতের এক মহানগরীতে স্বায়ত্বশাসনের শুভ-ব্যবস্থা প্রচলিত করেছে। তা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য তিনি জোরদার ভাষণ দেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, সেই স্যর হেনরী ফাউলারের কথাও কোন কাজে এলোনা অন্তত: এবার তা বৃথাই হোল। কিন্তু আমাদের যা ন্যায্য দাবী, ন্যায্য পথ—ভারতে স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা—তার সমর্থনে তিনি যে জোরাল যুক্তি পেশ করেন তারজন্য আমরা তাঁর কাছে কম ঋণী নই। যাঁরা এদেশে এই একই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং যাঁদের মধ্যে রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব হলেন অগ্রগণ্য—তাঁদের প্রতিও আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। ক্লাইভ ও হেস্টিংসের যুগ থেকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি যে পরিবারটি আনুগত্য ও বন্ধুত্ব দেখিয়েছে সেই

পরিবারের যোগ্য বংশধর রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব। যেসব বন্ধু আইন পরিষদে আমাদের স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, যাঁরা আন্তরিকভাবে আমাদের অগ্রগতি চান, তাঁদের আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতি জানাচ্ছি। সুধীবৃন্দ, এঁদের উদাহরণ, এঁদের প্রয়াস, এঁদের নিরলস সংগ্রাম আমাদের দেশবাসীর স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এ দেশের ইতিহাসে তাঁদের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। এ সাংবিধানিক সংগ্রাম বৃথা যাবেনা। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী ও প্রগতিশীল শাসনের আওতায়, স্বায়ত্বশাসনের জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের ঐতিহ্য, আমরা আমাদের সন্তান, কিংবা তাদের বংশধরদের হাতে তুলে দিয়ে যাব—যারা ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ অধ্যায়কে এ দেশের ইতিহাসের এক স্মরণীয় যুগ বলে মনে করবে।

এই শতাব্দীতে যেসব কৃতী মানুষ জন্মেছেন, কাজ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন—তাঁদের সে সংগ্রাম একেবারে বৃথা যাবেনা—তাঁদের উদাহরণ থেকে আমাদের উত্তরসূরীরা নতুন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাবেন। পরাজয় অনেক সময় জয়ের চেয়ে গৌরবের, আমরা যে পরাজয় স্বীকার করলাম—সেটাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে, বলভরসা দেবে আশাকে উদ্দীপ্ত করবে এবং নতুন নতুন প্রয়াস চালাতে আমাদের শক্তি জোগাবে।

এই সংগ্রামের সত্যিকারের ফলাফল দেখে কলকাতার কোনো কোনো শ্রেণীর লোক আন্তরিক খুশী হয়েছেন কিনা জানিনা। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে প্রশাসনের উন্নতি হবে, পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্ষমতা বাড়বে এবং সকল শ্রেণীর নাগরিকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা পাওয়া যাবে—কলকাতার পৌর ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এমন কোনো ইংরেজ আছেন কিনা যিনি আন্তরিকভাবে একথা বিশ্বাস করেন? নিজেকে আমি এ প্রশ্ন করেছি। কলকাতার পদস্থ কর্মচারীরা—পৌর স্বায়ত্বশাসনকে বাড়িয়ে তুলতে অতীতে যাঁরা অনেক কিছু করেছেন—পঁচিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাঁরা

এই মহান আদর্শ গড়ে তুলেছেন তা ভেঙ্গে পড়তে দেখে তাঁরা সত্যিই খুশী হয়েছেন কিনা আমি জানিনা। কলকাতার য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা ব্যস্ত মানুষ, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তাঁরা ভারতীয় জনগণের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও মৈত্রীর সম্পর্ক রেখে বাস করছেন। কিন্তু এমন একটা ধারণা যদি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে যে যেখানে ইংরেজ শিল্প প্রসারলাভ করছে সেখানে শুধু ভারতীয় উৎপাদনকারীর অধিকারই নয় ভারতের রাজনৈতিক ও পৌর অধিকার পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে হবে, আমার খুব সন্দেহ হয়, কলকাতার কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ীরা সেরকম একটা অবস্থা চান কিনা। কলকাতার নতুন পৌর পিতাদের সামনে পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশনের এত সমস্যা, আর রাজস্ব অপর্যাপ্ত, মুষ্টিভিক্ষার মতই কম। এ অবস্থায় তাঁরা সম্ভাব্য সাফল্যের আনন্দ বা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মাথাঘামাতে পারছেন কিনা আমি জানিনা। নির্বাচিত কমিশনাররা এই অল্প আয় নিয়ে পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশনের জন্য যা কাজ করেছেন—তা এখন ইতিহাস। সমবেত সুধীবৃন্দ, সরকারী কর্মচারীদের হাতে যখন কলকাতার প্রশাসন ভার ছিলো, সেই চল্লিশ বছর আগেকার কথা, তখন আমি স্কুলের ছাত্র—আমার এখনও মনে পড়ে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় খোলা নর্দমা দেখতাম আর সে কি বিকট গন্ধ। ত্রিশ বছর আগে কলকাতা যখন জাসটিস অফ্ পিসের অধীন ছিল, তখনকার কলকাতাকেও আমি স্মরণ করতে পারি—সরকারী প্রয়োজনের নামে ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন ও জঘন্য অপচয়ের সেই ইতিহাসের কথা আমার মনে আছে। গত পঁচিশ বছর ধরে যে সব উন্নতি হয়েছে নির্বাচিত কমিশনাররা যেভাবে এ অফিসের প্রত্যেক বিভাগের কাজ-কর্মে শৃঙ্খলা এনেছেন, পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করেছেন, অপব্যয় কমিয়েছেন—যেভাবে তাঁরা এ দেশের কাজে নিজেদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি ব্যয় করেছেন—তা আমি বছরের পর বছর দেখেছি। এসব কমিশনাররা আমাদের দেশেরই কৃতী পুরুষ। এদেশের শাসনভার

নিয়ে যাঁরা এসেছেন এঁদের কাজকর্ম দেখে তাঁরা সবাই প্রশংসা করেছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু কুকুরের গলায় দড়ি দিতে হলে তার বদনাম তো করতেই হবে। স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির ওপরে এ কাজের দায়িত্ব পড়েছিল। মিঃ গ্ল্যাডস্টোন এবং লর্ড রিপনের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রশাসন বিভাগে স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি কাজ করেছেন। তাঁদের সম্পর্ক বন্ধুর মত। সেই স্যর ম্যাকেঞ্জি, ভারতে তাঁর কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়ে কলকাতার স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার বদনাম দিয়ে পরে তার গলা টিপে মেরে ফেললেন। সুধীবৃন্দ, এসব কথা যখন ভাবি মনে খুব কষ্ট পাই। লর্ড কার্জন প্রশাসনভার নেবার প্রথম বছরেই এসব ঘটনা ঘটেছে ভেবে বিষণ্ণ হয়ে উঠি। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, এ দেশের জনগণের কল্যাণসাধন করতে ও সহযোগিতা লাভ করার জন্য লর্ড কার্জনের মত আর কোনো ভাইসরয়ের এত আগ্রহ ও আন্তরিকতা ছিল না। আমি এও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি মাননীয় ভাইসরয় পরিষদে তাঁর নিজস্ব প্রস্তাব দেবার আগে এ বিষয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে বিচার করেছেন। যদি সেই সময়ে পরিষদে কোনো ভারতীয় সদস্য থাকতেন, যিনি এ বিষয়ে ভারতের বক্তব্য পেশ করতে পারতেন এবং গত চল্লিশ বছরের পৌর ইতিহাস শোনাতে পারতেন, তাহলে লর্ড কার্জন, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, ঠিক স্যর হেনরী ফাউলারের মত একই অভিমত পোষণ করতেন এবং কলকাতা পৌর সভার যেসব সংস্কার সাধনের প্রয়োজন ছিল—তা তিনি করতেন। তিনি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে জলাঞ্জলি না দিয়ে পৌর কার্যনির্বাহক পরিষদকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করতেন। কিন্তু কার্যনির্বাহক পরিষদে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে আমাদের কেউ প্রতিনিধি নেই। আর আমাদের কথা শোনাও হয়না। এইখানে আমাদের বিপদ, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা। সরকারী অভিমত সব সময়ই ভুল আর আমাদের

বক্তব্য সবসময় নির্ভুল—এমন কথা বলছি না। কিন্তু নিশ্চয়ই বলতে চাই যে, ট্রাইব্যুনাল আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেবার আগে দু'পক্ষের অভিমত শুনুন—আমাদের অভিমতকে পেশ করার জন্য যোগ্য প্রতিনিধির ব্যবস্থা করুন। এসব বিষয়ে যেসব সরকারী পদস্থ কর্মচারী অভিমত দেন—তাঁদের চেয়ে আমরা বেশী জানি, আমাদের অনেক বেশী অভিজ্ঞতা, অথবা আমরা দক্ষতা বেশী রাখি—এ কথাও বলছি। কিন্তু আমি বলতে চাই, আমরা এসব প্রশ্নকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি। এ সাম্রাজ্যের কার্যনির্বাহক পরিষদে আমাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য কোনো একটা সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ কার্যনির্বাহক পরিষদে কোনো বিষয়ে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—সেটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা এবং আইন পরিষদ তার সামান্য কিছু রদবদল করে সরকারী আদেশপত্রকেই মেনে নেন। বাংলা পরিষদ, তাঁদের পৌর বিলের ব্যাপারে এটাই করেছিলেন।

১৮৯৯ সালের দুর্ভিক্ষ

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এ বিষয় ছেড়ে আমি এখন অন্য জরুরী বিষয়ে দু'চার কথা বলবো। আমরা এক চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছি। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী চরম দুর্দশায় ভুগছেন। আপনাদের অনুমতি পেলে আমার বাকী সময়টা এ বিষয়ে ব্যয় করবো—এ প্রশ্নটা আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী। আমাদের দেশের দরিদ্র শ্রেণীর কি অবস্থা। ভদ্রমহোদয়গণ, ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলে জনসাধারণের দুর্দশা মেটাতে এবং নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলিতে জনগণের দুর্ভোগ দূর করতে এরই মধ্যে লর্ড কার্জনের সরকার ত্রাণ ও সাহায্যের যে দ্রুত ব্যবস্থা করেছেন—তা আপনারা জানেন। আগের দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্য পরিচালনা দেখবার অভিজ্ঞতা আপনাদের মধ্যে যাঁদের আছে, তাঁদের নিশ্চয় দৃঢ় বিশ্বাস, ইংরেজরা একবার যাতে হাত দেবে—তা কখনও অর্ধসমাপ্ত রাখবে না। ১৮৭৪, ১৮৭৬ এবং ১৮৯৬ সালে দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্যে অথবা আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার সময় আমি আমার ইংরেজ সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ

করেছি। সেসব দিনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করলে আমার গর্ব হয়। অতীতে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং এ বছর যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা দেখে বিচার করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমাদের যেসব দেশবাসী চরম দুর্দশা ভোগ করছেন—তাঁদের দুঃখদুর্দশা মেটাতে যাকিছু প্রচেষ্টা সম্ভব, যত খরচ করা সম্ভব এবং মানুষের পক্ষে যা করণীয় তা এ উদার সরকার করবেন। লক্ষ লক্ষ লোকের এ দুর্দশা দূর করতে জাতীয় কংগ্রেসের এবং আমাদের প্রত্যেকের যা করা সম্ভব তা করে সরকারের হাত আরও মজবুত করা উচিত! আমাদের ক্ষমতা ও শক্তি অনুসারে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হবে। সমালোচনার মনোভাব নিয়ে নয়, আনুগত্য ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সরকারের কাছে আমাদের সুপারিশ পেশ করতে হবে। আমাদের প্রস্তাব শুধু বর্তমানের এই দুর্দশা মেটাতেই নয়, ভবিষ্যতে যাতে আর এ দুর্ভোগ পোহাতে না হয় তার জন্যও বটে।

অভিযোগে বর্ণিত দুর্ভিক্ষের কারণগুলি

এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেই আমি সুপারিশ করছি যে, ভারতের কৃষক সমাজের অবস্থার উন্নতির জন্যে কতকগুলি সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসেছে। তাদের দারিদ্র্য, তাদের দুর্দশা, তাদের ঋণের বোঝা—এ সবের জন্য তারা কিন্তু দায়ী নয়। অনেক সময় বলা হয় যে, পৃথিবীর যে কোনো সুশাসিত দেশের তুলনায় ভারতের জনগণের এত যে দারিদ্র্য ও এখানে যে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয়—তার একটা বড় কারণ ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা—এটা সত্য নয়। আপনারা যদি পরিসংখ্যান বিচার করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন, জার্মানী ও ইংলণ্ডের মত য়ুরোপের দেশের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা অতটা বাড়ছে না। ভারত সরকারের প্রাক্তন সেনসাস্ কমিশনারের লিখিত বই যদি আপনারা পড়েন তাহলে দেখবেন যে সেনসাস্ কমিশনার নিজে স্বীকার করেছেন, জার্মাণী বা ইংলণ্ডের মত অত বেশী হারে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড সম্প্রতি লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক

সময় একথাও বলা হয় যে, ভারতের কৃষকদের দারিদ্র্যের কারণ তাদের অবিবেচনা, বাজে খরচ করার প্রবণতা ও তাদের দুর্বুদ্ধি। ভদ্রমহোদয়গণ, এ অভিযোগও সত্য নয়। ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি কাটিয়েছি। আমি আপনাদের বলতে পারি যে, বিশ্বের যত কৃষক আছে তাদের তুলনায় ভারতের কৃষক সবচেয়ে বিচক্ষণ মিতব্যয়ী এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধানী। এ দেশের কৃষক যখন কুসীদজীবীর কাছে যায়, তার অর্থ এই নয় যে, সে কুসীদজাবীর প্রেমে পড়েছে, তার কারণ না গেলে তার খাওয়া জুটবে না। সে ঋণের জন্য ২৫ অথবা ৩৭ শতাংশ সুদ দিতে রাজী হয় তার কারণ, জামানত হিসেবে সে যা দিতে পারে তা দিয়ে কম সুদে সে ঋণ পায় না।

পাঞ্জাব এবং অন্য জায়গায় কৃষকদের কুসীদজীবীদের কাছ থেকে জমি ও স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ভারত সরকার বর্তমানে যে প্রচেষ্টা করছেন, তা আমরা সবাই জানি। এই বিলের দোষগুণ নিয়ে আমি কিছু বলতে চাইনা কারণ যে বিষয়ে আমি যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করতে পারিনি সে বিষয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাইনা বা মতামত দিতে চাই না। পাঞ্জাবের প্রজাদের সম্পর্কে আমি যতটা তথ্য যোগাড় করেছি তা এখনও সম্পূর্ণ নয়—অন্ততঃপক্ষে আমি যতটা তথ্য সংগ্রহ করতে চাই তা হয়ে ওঠেনি। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, কৃষকদের জমি বাঁধা দেওয়া বা তা বিক্রি করার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করে তাদের অবস্থার উন্নতি করার প্রয়াস খুবই পুরোনো নীতি এবং তা বাংলাদেশে খুব একটা কার্যকর হয়নি। বরঞ্চ কৃষকরা যাতে সঞ্চয় করতে পারে—তার জন্য তাদের সাহায্য করাই নীতি হওয়া উচিত। পনেরো বছর আগে যখন বাংলা প্রজাস্বত্ব বিল নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল তখন এই নীতির সমর্থনে অনেক কথা বলা হয়। এই নীতির বিরোধিতা করার জন্য আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এবং আমি যদি ঠিক স্মরণ করতে পেরে থাকি, বাংলাদেশের তদানীন্তন সুদক্ষ রাজস্ব সেক্রেটারী, যিনি এখন এইসব প্রদেশের লেফ্‌টনেণ্ট গভর্নর—তিনি

আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। আমি এইসব কথা উল্লেখ করছি কারণ এসব তথ্য আর গোপনীয় নয়, এবং ঐ বছরের ক্যালকাটা গেজেটে একথা ছাপানো হয়েছে। কৃষকদের হাতে আছে তাদের নিজেদের জমি। সে জমির বাজার দর থেকে তাদের বঞ্চিত করা এবং জমি বাঁধা দেওয়া ও তা বিক্রি করার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করে কৃষকদের সাহায্য করার চেষ্টা কতটা অর্থহীন—তা খুব জোরালভাবে তুলে ধরা হয়েছিল বলে এ নীতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

আশ্চর্যের কথা এই যে, তিন বছর আগে আবার এ প্রশ্ন ওঠে। কাউন্সিল চেম্বারের রুদ্ধ ঘরে যে সরকারী অভিমত বা ধারণা পেশ করা হয় তার প্রতি কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে—এতে সেটারও প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই ভয় প্রকাশ করা হয় যে কৃষক সমাজের হাত থেকে কুসীদজীবীদের কাছে জমি চলে যাচ্ছে এবং এ সমস্যার একমাত্র সমাধান জমি বিক্রি করা বা তা বন্ধক রাখার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারী। সেই সময় ওড়িষ্যা ছিল বাংলারই অংশ। বাংলাদেশের অনেক জায়গার তুলনায় ওড়িষ্যার কৃষকদের অবস্থা দুর্বিষহ ছিল। সেই সময় আমি ওড়িষ্যার অস্থায়ী কমিশনার ছিলাম। বিনা বাধায় জমি বিক্রি করার ও তা বন্ধক রাখার অধিকার বাংলাদেশের কোনো অংশে যদি ক্ষতিকর বলে দেখা যায় তাহলে ওড়িষ্যাতেও নিশ্চয় তাই হবে। পঞ্চাশ বছরের রেকর্ড ঘেঁটে আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে, জমি বিক্রি ও বন্ধক দেওয়ার অধিকার পুরোপুরি থাকা সত্ত্বেও, কৃষকদের হাত থেকে জমির স্বত্বাধিকার অন্যের হাতে যায়নি। সুতরাং জমির বাজার দর থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করলেই যে তাদের সবচেয়ে বেশী সাহায্য করা হবে—এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। সৌভাগ্যবশত বাংলার রাজস্ব সম্পর্কিত সবচেয়ে নামী বিশেষজ্ঞ মিঃ ষ্টিভেনসের একই মত ছিল। তাই জমির বাজার দর কমিয়ে কৃষকদের সাহায্য করার নীতি আবার বর্জন করা হলো। মিঃ ষ্টিভেনস পরে বাংলার লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর হয়েছিলেন।

সুধীবৃন্দ, আমি এইসব ঘটনা সবার ব্যাপারে প্রযোজ্য তা বলছি না। বাংলা ও ওড়িষ্যার জন্য যা প্রয়োজনীয় নয়, যা অমঙ্গলকর, তা ভারতের অন্যান্য অংশে সাময়িক কালের জন্য লাভজনক হবে না—এমন কথা আমি বলতে চাই না, কারণ ভারতের অন্য অংশে অবস্থাটা হয়তো আরও জটিল। তবে আমি যেটা জোর দিয়ে বলতে চাই তা হলো, এই ধরনের সমাধানে কৃষকদের অবস্থার স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়, তাদের অবস্থার যদি সত্যিই উন্নতি করতে চাই তাহলে বাংলাদেশে যা করা সম্ভব হয়েছে তাই করতে হবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে কৃষকরা বেশী ফলনের মরশুমে সঞ্চয় করে দুঃসময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে।

দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ ও তার সমাধান

সুধীবৃন্দ, আমাদের কৃষক সমাজের মধ্যে এত যে দারিদ্র্য তার কারণ কিন্তু খুব সহজ, এমন কি স্পষ্ট। তবে যদি আমাদের সাহস থাকে, আন্তরিকতা থাকে, তবেই এই দারিদ্র্যের কারণ খুঁজে পাব এবং সমস্যাটা বুঝতে পারবো। জনসংখ্যাবৃদ্ধি এর কারণ নয়, অনেক য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা অতটা বাড়ছে না। তাছাড়া জনসংখ্যা কৃষি এলাকার চেয়ে দ্রুত বাড়ছে না। কৃষকরা সাধারণতঃ অদূরদর্শী এবং তার জন্যই তাদের এ অবস্থা—এটাও সত্য নয়। কারণ যাঁরা ভারতীয় কৃষককে চেনেন, তাঁরা নিশ্চয় বলবেন, সে তার সব অজ্ঞতা ও কুসংস্কার নিয়েও বিশ্বের যে কোন জায়গার কৃষকের মত বিচক্ষণ, মিতব্যয়ী এবং নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন। তার এই দুর্দশা ও আকণ্ঠ ঋণের বোঝা বাড়বার প্রকৃত কারণ এই যে, বাংলাদেশ ও আরও কয়েকটি জায়গা ছাড়া ভূমির খাজনা খুব বেশী ধার্য করা হয়। ফলে কৃষকরা ভাল ফলনের দিনে যথেষ্ট সঞ্চয় করতে পারে না। আর পারে না বলেই অনাবাদের সময়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ। ইংলণ্ডের বাষ্পশক্তি ও যান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের তাঁত ও সুতো কাটা শিল্পের মত

সব গ্রামীণ শিল্প নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের কৃষকরা এবং এমন কি গ্রামীণ শিল্পের কারিগররা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য শুধুমাত্র জমির ওপরেই নির্ভর করে। জমিটুকুই তাদের সম্বল। তাই বেশ উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভূমির খাজনা ধার্য করা উচিত। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে এ ব্যাপারে উদারতা দেখা যায় কিন্তু জমির খাজনা ধার্য করার বিষয়ে লোকেদের মতামত দেবার কোনো স্বাধীনতা নেই বলে তারা কাজের বেলায় এদের প্রতি অনুদার ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। কর্মচারীরা কৃষকদের যথেষ্ট সঞ্চয় করার মত সুযোগ দেয় না, সুতরাং যখনই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন কৃষকদের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না।

বাংলাদেশ

হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে পুরোনো হিন্দু আইন এই অনুমতি দিয়েছে যে, ভূমিতে উৎপন্ন মোট উৎপাদনের ৬ ভাগের এক ভাগ সর্বোচ্চ খাজনার হার হতে পারে—তার বেশী নয়। প্রাচীন কালের এই বিধি ব্যবস্থা কত যে উপযোগী ছিল বর্তমান কালের অভিজ্ঞতা সেটাই প্রতিপন্ন করে। বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—১৮৫৯, ১৮৬৮ এবং ১৮৮৫ সালের আইন-বিধির ফলে কৃষকদের দেয় খাজনার হার অত্যধিক বাড়ানো চলে না। যে কোন জেলায় কৃষকদের খাজনা বাবদ যা দিতে হয়, মোট উৎপাদনের ৬ ভাগের এক ভাগের তা বেশী নয়। পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে খাজনা দেবার হার আরও কম। গত শতকে বাংলাদেশ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে দুর্ভোগ ভুগেছে। অথচ বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পর থেকে সাম্প্রতিককালে দুর্ভিক্ষের করাল তাণ্ডব থেকে এ এলাকা সাধারণভাবে মুক্ত। ১৮৭৪ এবং ১৮৯৭ সালে বিহারে যে দুাভক্ষ হয়েছিলো—তুলনামূলক বিচারে তার বিভীষিকা অনেক কম এবং দুর্ভিক্ষে কেউ প্রাণ হারায়নি। বাংলাদেশের আইনকে ভারতের অন্যান্য অংশে চালু করুন, মোট উৎপাদনের ৬ ভাগের বেশী খাজনা হিসেবে

কৃষকদের দিতে হবে না এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করুন, দেখবেন ভারতে দুর্ভিক্ষের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলি

উত্তর পশ্চিমের প্রদেশগুলি ও অযোধ্যাতে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা কৃষকদের রক্ষা করা হয়নি। প্রত্যেকবার নতুন করে খাজনা ধার্য করা হয় এবং সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বাড়ে। এই ধরনের ব্যবস্থার ফলে ওখানকার কৃষকদের সত্যিই কি অবস্থা হয় —আসুন তার একটা অনুশীলন করা যাক। উত্তর পশ্চিমের প্রদেশ-গুলিতে জমির খাজনা নির্ধারণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক কথাই শোনা যায় কিন্তু লণ্ডনে যখন মুদ্রা কমিটির অধিবেশন বসেছিলো তখন স্যর এণ্টনী ম্যাক্‌ডোনেল কমিটির সামনে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, অল্প পরিসরে অত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বিবরণ আমি আর কোথাও দেখিনি। ৫৭৩৭ থেকে ৫৭৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর যদি পড়ে দেখেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলির ভূমির খাজনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে যাবে। এই বিবরণ থেকে আমি দুটি মোদ্দা কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। প্রথমে বলি, ওখানে জমিদাররা ও কৃষকরা নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে নিতে পারেনি এবং সরকার তাতে অনুমতি দেন। জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে বাদসাদ দিয়ে যা পান, সরকার তার থেকে অর্ধেক দাবী করেন। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থা অনুসারে জমিদাররা, মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ নগদ টাকায় পান এবং তার মধ্য থেকে সরকারকে অর্ধেক বা মোট উৎপাদনের শতকরা দশ ভাগ দিতে হয়। সুধীবৃন্দ, ভারতের অন্যান্য অংশে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার চেয়ে এ ব্যবস্থা অনেক ভাল। নিয়মবিধি সহানুভূতির সঙ্গে, এমন কি উদারভাবে রচনা করা হয় বলে আপনি অনেকটা নিশ্চিন্ত

থাকতে পারেন। কারণ সেখানকার শাসকরা, জমিতে যে চাষ করে তার প্রতি প্রকৃতই সহানুভূতিশীল এবং এ ব্যাপারে ভারতের কারুর সঙ্গে তাঁরা আপোষ করেন না। তবে শতকরা ২০ ভাগ জমির সর্বোচ্চ খাজনা গড়পড়তা খাজনা নয়—এটা জানতে পারলে আমি আরও নিশ্চিন্ত হতাম। খাজনার সর্বোচ্চ মাত্রা নির্দিষ্ট না থাকলে, খাজনার হার অন্যায়ভাবে বাড়ানো হবে না—সে বিষয়ে কৃষকরা সুনিশ্চিত হতে পারে না। সরকার যদি জমিদারের কাছ থেকে বর্ধিত হারে নিজের পাওনা দাবী করে এবং জমিদার যদি তা মেনে নেন তাহলে তিনি খাজনার হার বাড়িয়ে তা পূরণ করে নেন। অনেকটা ঠিক যেন স্পঞ্জের মত, নিংড়ে আবার জলে ছেড়ে দিন, জলে ভরে যাবে। তেমনি ত্রিশ বছর পরে হোক, কৃষকদের সঙ্গে আবার ফয়সালা হবার সময় জমিদার তাঁর লোকসান ঠিক পূরণ করে নেবেন। তাই আমি বলবো, প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল—যা বাংলাদেশে আজকাল মোটামুটি প্রচলিত —তাই গ্রহণ করুন। যে কোন অবস্থায় মোট উৎপাদনের ৬ ভাগের এক ভাগ অথবা ৫ ভাগের এক ভাগ খাজনা ধার্য করার ব্যবস্থা করুন এবং আপনি দেখবেন যে, বাংলাদেশের মত এইসব প্রদেশের কৃষকরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজের অবস্থা আরও খারাপ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কয়েকটি এলাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়েছে কিন্তু প্রদেশের বেশীর ভাগ অংশে খাজনা ধার্য করার স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নেই। জমিদারী প্রথাও নেই। সরকার জমির থেকে উৎপন্ন নীট শস্যের অর্ধেক দাবী করেন—অর্থাৎ চাষ-আবাদের খরচ বাদ দিয়ে যা থাকে তা হলো নীট উৎপাদন। বব্বিলির রাজা মহামান্য সুব্বা রাও এবং বিরাট জমিদার ও গোদাবরী

জেলা সমিতির সভাপতি মিঃ ভেঙ্কটরত্নম্ সম্প্রতি যে ভাষণ দিয়েছেন, তার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাদ্রাজে খাজনা ধার্যের ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হয় তার জ্ঞানগর্ভ ও চমৎকার বিবরণ এঁদের ভাষণে রয়েছে। তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে অর্ধ শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে অনবরত আইন প্রণয়নের ফলে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু মাদ্রাজে সরকার পর পর ব্যবস্থা নিয়ে কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেছেন ১৮৫৭ সালে জমির খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা ও কৃষকদের মালিকানা স্বত্বের অধিকার দেওয়ার দাবী সরকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের প্রশাসন বিভাগ কৃষকদের এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, মূল্য বৃদ্ধিজনিত অবস্থা ছাড়া খাজনা কখনই বাড়ানো হবে না। কিন্তু বর্তমানে এইসব অঙ্গীকার অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। এইসব রক্ষাকবচের ব্যবস্থা নাকচ করে মূল্য বৃদ্ধি ও জমির উর্বরতা অনুযায়ী জমির পুনর্বিন্যাসের কারণ দেখিয়ে খাজনার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এছাড়া ১৮৭৯ সালে মাদ্রাজ তথ্য সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট থেকে কিছু অংশ আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। এতে বলা হয়েছে, যেখানে সরকার জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেন সেখানে নীট উৎপাদনের অর্ধেক খাজনার পরিমাণ মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়। যেখানে সরকার সেচের ব্যবস্থা করেন না, সেখানে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগের বেশী খাজনা হওয়া উচিত নয়। আমি এরকম একটা নিয়মবিধির কথা যখন ভাবি তখন আমার খুবই দুঃখ হয়। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের একটা কথা না বলে পারছি না। ১৮৮৪ সালে যখন বাংলাদেশের প্রজাস্বত্ব বিল নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল, তখন আমার সুপারিশ করার সৌভাগ্য হয়েছিল যে, মোট উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগের বেশী খাজনার হার হওয়া উচিত নয়—যদিও এই হার হিন্দুদের

প্রচলিত হারের চেয়ে একটু বেশী ছিল। তদানীন্তন বাংলার রাজস্ব সেক্রেটারী আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। ইনি এখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-গুলি ও অযোধ্যার শাসক হয়েছেন। বাংলাদেশের সরকার যে প্রজাস্বত্ব বিলটি রচনা করেন তাতে আমার প্রস্তাব স্থান পেয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিল পাশ হয়নি কারণ বাংলাদেশের অনেক জায়গায় জমিদাররা শতকরা ২০ ভাগের কম খাজনা পাচ্ছেন। যদি সর্বোচ্চ খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে আইন পাশ করা হয়, তাহলে জমিদাররা সর্বোচ্চ হারে খাজনা আদায় করার চেষ্টা করবেন। এই যুক্তিটা ভালই। তাই আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি বলে আমি মোটেই দুঃখিত নই। বাংলাদেশের বেসরকারী জমিদারদের জন্য মোট উৎপাদনের শতকরা ২০ভাগ খাজনার সর্বোচ্চ সীমা সরকার ধার্য করতে চাননি অথচ তাদের তথ্য সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির কিভাবে সরকারের খাজনা বা রাজস্ব হিসেবে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৩ থেকে ৪০ ভাগ আদায় করার বিধির কথা উল্লেখ ছিল। এই অবস্থায় মাদ্রাজে যদি এরকম সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ হয়, আপনারা কি সত্যিই আশ্চর্য হবেন? ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রাক্তন অফিসর এবং রাজস্ব বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ মিঃ এ. রজারস্ বলেছেন যে, বহু জমিতে চাষ-আবাদ হয়না, এমনি পড়ে আছে। কারণ সরকার যে হারে খাজনা দাবী করেন সে হারে খাজনা দেবার ক্ষমতা কৃষকদের নেই। মিঃ রজারস্ এ কথা যদি বলে থাকেন তা শুনে আপনারা কি আশ্চর্য হবেন? আমি আগেও বলেছি, মাদ্রাজে যে বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা হলো নীট উৎপাদনের অর্ধেক দাবী করা অর্থাৎ চাষ-আবাদের খরচা বাদ দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ধরা। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এটাকেই যদি অর্থকরী খাজনা বলা হয় তাহলে শুনুন ১৮৬৪ সালে এক সরকারী চিঠি পাঠিয়ে স্যর চালর্স উড কি বলেছিলেন। তিনি বলেন, কোনো জমি থেকে উৎপাদিত পণ্যের ৬ ভাগের

এক ভাগের বেশী খাজনা ধার্য করা উচিত নয়। উত্তর ভারতে যেমন আছে, তেমনি মাদ্রাজ প্রদেশের সর্বত্র মোট উৎপাদনের গড়পড়তা হিসেবে খাজনা দশ ভাগের এক ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়।

বোম্বাই এবং পাঞ্জাব

সুধীবৃন্দ, ভারতের অন্যান্য স্থানে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অথবা পাঞ্জাবে ভূমি রাজস্বের ব্যবস্থা কিরকম তা খুঁটিয়ে বিচার করার সময় এখন আমার হাতে নেই। মাদ্রাজে যেরকম, বোম্বাইতেও সেই ব্যবস্থা—সরকার সাধারণতঃ কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায় করেন। কিন্তু বোম্বাইতে খাজনা নির্ধারিক অফিসর আগের বছরে কৃষকরা কত খাজনা দিয়েছিলো তা খুব সহজেই হিসাবের মধ্যে ধরেন। জমিতে কত উৎপাদন হলো তা তাঁরা হিসাব করার চেষ্টা করেন না। এরকম ব্যবস্থায়, কৃষকদের কতটুকু নিরাপত্তা? সঞ্চয় করার তাগিদই বা কোথা থেকে আসবে? উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে যে ব্যবস্থা প্রচলিত, পাঞ্জাবেও অনেকটা তাই। কিন্তু বোম্বাই অথবা পাঞ্জাবের অবস্থা যদি আপনি একটু বিচার করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন, যে জমিতে কৃষক চাষ করে, তার থেকে উৎপন্ন শস্যের যথেষ্ট পরিমাণ অংশ রাখবার ব্যাপারে তাদের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। এরকম কোনো আশ্বাস ছাড়া কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব নয়। তাঁর সঙ্গে কুসীদজীবীর সম্পর্কের উন্নতি করলেই যে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে কৃষককে বাঁচানো যাবে তাও হতে পারে না। বাংলাদেশের জমিদারী প্রথা, অযোধ্যার তালুকদারী ব্যবস্থা, উত্তর-পশ্চিমের মহলওয়ারী ব্যবস্থা, মধ্য ভারতের মালগুজারী অথবা দক্ষিণ ভারতের রায়তওয়ারী ব্যবস্থা—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত এই বিভিন্ন ব্যবস্থার দোষগুণ নিয়ে আমি আজ আলোচনা করছি না। ১৮৬০ সালে লর্ড ক্যানিং সুপারিশ করেছিলেন, ভারতের সর্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করা হোক। এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইনা, যদিও আজ আমি ভাবি যে, এটা হয়তো অনেক

বিচক্ষণ প্রস্তাব ছিল ; এটা হয়তো অনেক উদার ব্যবস্থা হতো—অতীতে অনেক প্রতিশ্রুতি দিলে সরকার এই ব্যবস্থা প্রচলন করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। সব আলোচনা, সব বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে যেতে চাই বলেই আমি এসব বিষয়ের আর অবতারণা করতে চাইনা ; আমি বরঞ্চ একটি প্রস্তাব রাখছি। তা নিয়ে বাকবিতণ্ডা না করে সর্বসম্মতি স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। প্রস্তাবটি এই যে, কৃষককে যদি ঋণের বোঝা ও দারিদ্র্য, দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাতে হয় তাহলে তার উৎপন্ন শস্যের যথেষ্ট অংশ তাকে দিতেই হবে এবং সে বিষয়ে তাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা এবং ভূমির খাজনা ধার্য করার ব্যবস্থার ফলে তাদের ওপর কি প্রভাব পড়ে—এই ব্যাপারেই আমি বেশী চিন্তিত কারণ আমাদের দেশ মানেই কৃষক। কি অবস্থায় বা কি ব্যবস্থায় সে বাস করে—তা নিয়ে চিন্তা নেই। যে জমিতে সে চাষ করে সেই জমির উৎপন্ন শস্যের একটা পর্যাপ্ত অংশ তাকে দিলে সে প্রাণে বাঁচবে এবং দেশও রক্ষা পাবে।

মধ্য ভারত

এ বিষয় ছেড়ে বিষয়ান্তরে যাবার আগে মধ্য ভারতের প্রদেশগুলির সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। ১৮৯৭ সালের সর্বনাশা দুর্ভিক্ষে মধ্য ভারতের লোকেরা খুবই দুর্ভোগ ভুগেছেন। ১৮৯৯ সালের দুর্ভিক্ষে তাঁরা আরও দুর্দশায় পড়েছেন। সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় মধ্য ভারত সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ ভুগছে, তার কারণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে খাজনা ধার্যের ব্যবস্থা অনেক বেশী কঠোর—শুধু নীতিগতভাবে নয়, কার্যতও বটে। স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি সম্প্রতি এই প্রদেশে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন—তার যে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে সে বিষয়ে ইংলণ্ডে আমি অনবরত নানা কথা শুনছি। আপনারা ভারতেও যে ক্রমাগত একথা শুনেছেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি

কি শুনেছি তা আমি এখানে আপনাদের বলব না। সরকারী রিপোর্টে যেসব তথ্য বেরিয়েছে এবং গত বছর মার্চ মাসে কমন্স সভায় ভারতের কৃষকদের একজন প্রকৃত বন্ধু মিঃ স্যামুয়েল স্মিথের প্রশ্নের উত্তরে ভারতের সেক্রেটারী অফ ষ্টেট যে উত্তর দিয়েছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে আমি আমার মন্তব্য পেশ করতে চাই।

সুধীবৃন্দ, উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে ভূমির খাজনা ব্যবস্থা ত্রিশ বছরের জন্য ধার্য করা হয়। এটা খুব ভাল নিয়ম। কারণ খাজনা ব্যবস্থার মেয়াদ ঘন ঘন বাড়িয়ে বা তা আদায়ের নিত্য নতুন ব্যবস্থা চালু করে লোকেদের হয়রানি করা বাঞ্ছনীয় নয়। স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি এই নিয়মবিধির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, খুব অনগ্রসর এলাকা ছাড়া বাকি সব অংশে ২০ বছরের জন্যে জমির খাজনা ধার্যের ব্যবস্থা চালু করা হোক। আমার মনে হয়, অনুন্নত এলাকায় এই ব্যবস্থা আরও কম বছরের জন্য করা হয়। উত্তর পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে আরও একটি চমৎকার ব্যবস্থা চালু আছে এবং তা হলো এই যে, জমিদাররা যত খাজনা পান, তার অর্ধেক তাঁদের রাজস্ব হিসেবে সরকারকে দিতে হয়। স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি এ বিধিব্যবস্থা বাতিল করে দিলেন। সম্প্রতি নতুন করে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ হারে সরকারী রাজস্ব ধার্য করা হয়। এছাড়া রয়েছে স্থানীয় কর। তা যদি যোগ করা যায় তাহলে মালগুজারদের কাছ থেকে সরকার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ খাজনা আদায়ের দাবী করে থাকেন। এটা মাল-গুজাররা সত্যি সত্যি সংগ্রহ করতে পারছে তা অনুমান করে নিলেই চলে। উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে খাজনা ধার্য ব্যবস্থা যখন ৩০ বছরের জন্য চালু করা হয়েছে তখন মধ্য ভারতের প্রদেশগুলিতে ২০ বছর মেয়াদী বন্দোবস্ত কেন করা হলো, সে কথা আমি সব নিরপেক্ষ মানুষ এবং প্রত্যেক ন্যায়বিচারশীল প্রশাসককে জিজ্ঞাসা করতে চাই। স্যর অ্যাণ্টনি ম্যাকডোনাল্ডের কথা যদি সত্য

হয় তাহলে উত্তর পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে সরকার রাজস্ব হিসেবে শতকরা যখন ৪০ ভাগ আদায় করেন তখন মালগুজারদের কাছ থেকে শতকরা ৬০ ভাগ রাজস্ব সরকার দাবী করেন কেন সে প্রশ্ন আমি প্রত্যেক দায়িত্বশীল প্রশাসককে করতে চাই। বাস্তবের সঙ্গে যে রাজনীতিজ্ঞের কোন সম্পর্ক নেই—তাঁর কাছে পরিসংখ্যানের এ পার্থক্যের মূল্য কিই-বা আছে। কিন্তু ভারতীয় কৃষকদের কাছে এটা জীবনমরণ সমস্যা। ভূমি ব্যবস্থার যে প্রচলিত নিয়মবিধি, তা যদি পরিবর্তন করা হয়, যত বছরের জন্য এ ব্যবস্থা তার যদি রদবদল করা হয়, এবং সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ প্রত্যেকবার যদি বাড়ানো হয়—তাহলে তার অর্থ, কৃষকদের আরও দারিদ্র্য, আরও দুর্দশা, স্বাভাবিক সময়েও ঋণের বোঝা এবং দুর্ভিক্ষে আরও বেশী সংখ্যায় মৃত্যু হার। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে কেন এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো, সুধীবৃন্দ, আমি সেকথা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি? প্রথমে সরকার জমিদারদের মোট আয়ের অর্ধেক দাবী করতেন না, করতেন তিন ভাগের দু'ভাগ, এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে যত যুদ্ধ হয়ে গেছে এবং তাতে যত লোক দুর্ভোগ ভুগছেন সরকারের এই বিধিনিয়মের ফলে এখানকার জনগণ তারচেয়ে বেশী ছাড়া কম দুর্দশা ভোগ করেননি। ১৮৮৫ সালে সেই নিয়মবিধি বর্জন করা হয় এবং জমিদারদের আয়ের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে ধার্য করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে, কৃষকদের পক্ষে এই পুরোনো নিয়মবিধি কতটা কঠোর, কতটা নিষ্ঠুর বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এটা জেনেও কি এই পুরোনো নিয়মবিধি আমাদের মধ্য ভারতের প্রদেশগুলিতে প্রচলন করা উচিত? মধ্য ভারতের কার্যনির্বাহক পরিষদে যদি লোকেদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকতো—তাহলে যা প্রচলিত ব্যবস্থা ও নিয়ম—তার পরিবর্তন ঘটানো অতটা সহজ হতো না। ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদে যদি লোকেদের কেউ প্রতিনিধি থাকতো এবং তিনি যদি এসব বিষয়ে জোর দিয়ে বলতে পারতেন তাহলে নির্ধারিত প্রচলিত নিয়মবিধিকে

অত সহজে পরিবর্তন করতে কোনো ভাইসরয় রাজী হতেন না। কারণ এই প্রচলিত নিয়মবিধি পরিবর্তন করতে দিয়ে লোকেদের কত দুর্দশা বাড়িয়েছি, এর সর্বনাশা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মধ্য ভারতে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুসংখ্যা আমরা কতই-না বাড়িয়ে তুলেছি।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এই বিষয় নিয়ে আমি এতটা বলতে চাইনি। এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে আমি আপনাদের অনেকক্ষণ সময় নিয়েছে তবে বিষয়টার গুরুত্ব যদি ভেবে দেখেন তাহলে নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন। ত্রিশ বছর ধরে আমি এ বিষয়ে অনুশীলন করে আমি আমার অভিমত দিচ্ছি। আমার এই অভিমত যে, এই রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থার জন্যই আমরা দুর্ভিক্ষ ডেকে আনছি, শুধু দুর্ভিক্ষই নয়, দুর্ভিক্ষের প্রভাবকে আরও ব্যাপক করে তুলছি। আমার দ্বিতীয় অভিমত, কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত ব্যবস্থা তখনই নিতে পারি, যখন ন্যায্য ও নির্ধারিত হারে তাদের কাছ থেকে খাজনা দাবী করবো। তাহলে দুর্ভিক্ষ এলেও মৃত্যুসংখ্যার হার অনেক কম হবে—যেমন বাংলাদেশে হয়েছে। ব্রিটিশ প্রশাসন আমাদের জন্যে অনেক কিছু করেছে, আমাদের আভ্যন্তরীণ শান্তি দিয়েছে, আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের নিয়ে এসেছে। কিন্তু যে দুর্ভিক্ষ এ দেশকে জর্জরিত করছে—কোনো সভ্য ও সুশাসিত দেশে সেরকম হয় বলে কখনও শোনা যায় না। এখানে ব্রিটিশ প্রশাসন তার সব কর্তব্য পালন করেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং সরকারের প্রতি আমার সব আনুগত্য নিয়েই আমি একথা বলছি, যে কারণে আমাদের গ্রামীণ শিল্প লুপ্ত হয়ে গেছে, যে কারণে আমাদের গ্রামের ভূমির খাজনা বাড়ানো হয় ঠিক একই কারণে এদেশে বারবার দুর্ভিক্ষ আসে। আমার এই বিশ্বাস এবং যে বিশ্বাসের কথা, সরকারের প্রতি আমার আনুগত্য সত্বেও আমি বলতে চাই তা হলো, এই যে অসংখ্য লোকের মৃত্যু আমরা বন্ধ করতে পারি, ভূমির খাজনা নির্ধারণ ব্যবস্থা

আরও সহানুভূতির সঙ্গে যদি করতে পারি, প্রত্যেক প্রদেশে কৃষকরা যা উৎপাদন করে তার পর্যাপ্ত অংশ দেওয়া হবে বলে যদি আমরা তাদের সুনিশ্চিত করতে পারি তবে দুর্ভিক্ষে এই অসংখ্য লোকের মৃত্যুও আমরা এড়াতে পারবো।

সামরিক ব্যয়ভার, জাতীয় ঋণ, মুদ্রা, শিল্প ও চাকরী

সুধীবৃন্দ, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ভারতের এ দারিদ্র্যের আরও অনেক কারণ আছে। আমি আজ সেগুলি বলিনি, বলতেও চাইনা কারণ কংগ্রেসের আগের অধিবেশনে সুদক্ষ বক্তারা সেসব বিষয়ে চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন। অন্য বক্তারা এসব বিষয়ে আবার এবছরেও বলবেন। সামরিক খাতে বিপুল ব্যয়ভারের প্রশ্ন আছে এবং ভারতের রসদ দিয়ে বিপুল সৈন্যবাহিনী পোষণ করার প্রশ্ন আছে। এ সৈন্যবাহিনী রক্ষা করা হচ্ছে ভারতের প্রয়োজন মেটাতে নয়, এসিয়া, আফ্রিকায়, এমন কি য়ুরোপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজন মেটাতেই এই সৈন্যবাহিনী পোষণ করা হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় ঋণের প্রশ্নও আছে। ১৮৬০ সাল থেকে ব্রিটিশের জাতীয় ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৭৫ মিলিয়নের মত হ্রাস করা হয়েছে। অথচ সেই সময়ের মধ্যে ভারতের ঋণের বোঝা বেড়েছে ১০০ মিলিয়নেরও বেশী। এর ফলে ইংলণ্ডকে সুদ দিতে ভারতের প্রচুর রাজস্ব বেরিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কৃষকের ঋণ বেড়ে গেছে ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমে গেছে। কিন্তু তা সত্বেও মুদ্রা কমিটি মুদ্রা সম্পর্কে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা কৃষকের স্বার্থ পূরণের সহায়ক হবে না। অন্যায় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে আমাদের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হতে বসেছে এবং তাদের সাহায্য করা, তাদের উৎসাহ দেবার প্রশ্নও আছে। আমাদের যুগের সবচেয়ে চিন্তাশীল ও বিদ্বান মানুষ বোম্বাই-এর মহামান্য বিচারপতি রাণাডে, এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ও সুদক্ষতার সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। শুধু ভারতীয় সিভিল সার্ভিসেই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা, পুলিস, এঞ্জিনিয়ারিং, ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠানে

শিক্ষিত ব্যক্তিদের আরও বেশী সংখ্যায় চাকরীর ব্যবস্থা করে ব্যয়সঙ্কোচ করার প্রশ্ন আছে। ভারতের ইংরেজী স্কুল ও কলেজগুলিতে তিনটি যুগের ভারতীয়রা শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছেন। যে পদ তাঁরা গ্রহণ করেছেন সেই পদে তাঁদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর তাঁদের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণভারের ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের নিজের দেশেই যেন বিদেশী।

আমি এসব ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে ছেড়ে অন্য বিষয়ে কথা বলবো কারণ এসব বিষয় নিয়ে আর বেশী বলার সময় আমার হাতে নেই। আর আমি এ বিষয়ে বেশী বলতে চাইনা কারণ আপনারা অনেকে আরও গুছিয়ে এসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আরও অনেক বিষয় নিয়ে আপনারা আবার বিচার করবেন। আমি শুধু আবার একটি কথাই বলতে চাই। তাহলো, যদি জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য লোকেদের সহযোগিতা নিয়ে ভারত শাসন করবার সৎ অভিপ্রায় ও প্রকৃত মনোবল থাকে তাহলে ব্যয়ভার কমানো যায়, ভূমির খাজনার ন্যায্য নির্ধারণ হতে পারে, শিল্প-বাণিজ্যকে বাড়ানো যেতে পারে এবং দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হার হ্রাস করা যেতে পারে। প্রশাসনের কাজকর্মের ব্যাপারে লোকেদের সহযোগিতা পাবার প্রয়াস চালানো দরকার। প্রশাসন বিভাগের সঙ্গে লোকেদের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের যৌক্তিকতা এবং প্রশাসকদের আমাদের কাছাকাছি নিয়ে আসার সার্থকতা—এই কটা বিষয়ে দু'চার কথা বলার অনুমতি আমি আপনাদের কাছে চেয়ে নিচ্ছি। বিদগ্ধ ও দূরদর্শী প্রত্যেক প্রশাসক এটা যেমন চান আমরাও চাই। এর ফলে প্রশাসনের যেমনি উন্নতি হবে, তেমনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী ও আরও জনপ্রিয় করে তুলবে। মনরো, এলফিনস্টোন্ এবং লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময়ে এরকম একটা শুভ-সূচনা হয়েছিলো ; আমি এখন যে সুপারিশ করবো তা প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে আলাদা কিছু নয়, যার সূচনা এর আগেই হয়ে গেছে—সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প। প্রশাসন বিভাগে নিত্যনতুন ব্যবস্থা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমি নিজেও

খুব একটা বিশ্বাসী নই ; যে পথের সন্ধান আমরা আগেই পেয়েছি—সেই পথে ধীরে ধীরে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে আমি অনেক বেশী বিশ্বাসী কারণ আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এই প্রশাসন বিভাগে কাটিয়েছি।

গ্রাম ইউনিয়ন সমূহ

সুধীবৃন্দ, আমি প্রথমে গ্রাম দিয়ে শুরু করবো কারণ আমি আগেই বলেছি, দেশের প্রতিনিধি হলো গ্রাম। গ্রামীণ প্রশাসন ব্যবস্থায় শাসকদের সঙ্গে লোকেদের কোনো সম্পর্ক নেই, অসামরিক প্রশাসন বিভাগে প্রশাসকদের সঙ্গে লোকেদের যে যোগাযোগ—সে শুধু পুলিসের ঘৃণিত সংযোগ। আমাদের জেলা অফিসররা গ্রামবাসীদের সঙ্গে এত কম প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখেন, গ্রামের নেতাদের খোঁজখবর এত কম রাখেন, এবং একমাত্র পুলিসের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গেজেলা অফিসরদের সম্পর্ক এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। প্রশাসন বিভাগের এটা একটা বড় গলদ। যদি কোথাও দুর্দশা দেখা যায়, পুলিস গিয়ে খোঁজখবর করে, গ্রামে যদি কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, পুলিস কলেরার ওষুধ দেয়, যদি গ্রামের পুকুর খারাপ হয়ে যায় কিংবা গ্রামে জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে, পুলিস সে বিষয়ে রিপোর্ট দেয় এবং সাহায্যের ব্যবস্থা করে, যদি কোন গাছ পড়ে যায় এবং গ্রামের রাস্তায় বাধার সৃষ্টি করে (আমি অনেকবার নিজের চোখে দেখেছি), তাহলে যতক্ষণ না পুলিস আসে এবং রাস্তার বাধা সরিয়ে ফেলে ততক্ষণ গ্রাম-বাসীরা নিজেরা কিছুই করতে পারেনা। তিন হাজার বছর আগে যে দেশ প্রথম গ্রাম সমষ্ঠি উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছিলো, গ্রাম পঞ্চায়েত খাড়া করে গ্রামের স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা করেছিল এবং যেখানে এইসব সংস্থাকে রীতিমত মূল্য দেওয়া হতো, সেখানে সেইসব গ্রামকেই এখন এমন অসহায় করে দেওয়া হয়েছে যে, পুলিসের অবাঞ্ছিত মধ্যস্থতায় এগুলির

শাসনভার চালাতে হয়। এটা সত্যিই হাস্যকর ব্যাপার। সুধীবৃন্দ, এই ভুল ধরা পড়েছে এবং ভারতের সমস্ত প্রদেশে পল্লী ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে বা হওয়ার পথে। যেখানে সরকারী সংগঠনকে আরও সুদৃঢ় করবে সেখানে পল্লী ইউনিয়নগুলিকে গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেকটি মহকুমা ২০ বা ৩০টি পল্লী ইউনিয়নে ভাগ করে দিতে হবে। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন কমিটির হাতে পল্লী রাস্তা, পুকুর, পয়ঃপ্রণালী, পল্লী শিক্ষা, পল্লী হাসপাতালের ভার দিতে হবে। ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা এদের হাতে বিচারের জন্য নয়, আপোষে মীমাংসা করে ফেলার জন্যে দিতে হবে। এভাবে গ্রামগুলির অনেক ব্যয়সাপেক্ষ মামলা ও তিক্ত মনোভাব দূর করা যায়, এভাবে অনেক গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব। সবচেয়ে যেটা বড় কথা, এতে গ্রামের নেতাদের মহকুমা ও জেলা প্রশাসকদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হবে। এঁরা যদি সে ক্ষমতা রাখেন পল্লী প্রশাসনের কেন্দ্রমণি হয়ে উঠতে পারবেন। তাহলে যে প্রশাসন বিভাগ পুলিসী ব্যবস্থার মাধ্যমে চলে এবং যার সবচেয়ে বড় অভাব সহানুভূতি—তার পরিবর্তে জনগণের সহায়তায় গড়ে ওঠা প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।

মিউনিসিপ্যাল শহর

পল্লী অঞ্চলের কথা থেকে মিউনিসিপ্যাল শহরগুলির বিষয়ে আসা যাক—কারণ আজকাল এ বিষয়টি অনেক বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ভদ্রমহোদয়গণ, সুদক্ষ পৌর শাসন যাতে গড়ে ওঠে সেদিকে আমাদের জোর দিতে হবে কারণ এটাকে আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করি। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা যদি নিষ্ক্রিয় হন ও শৈথিল্য দেখান তাহলে সুদক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। ইংলণ্ডের সরকার হাতে এ ক্ষমতা রেখেছেন। ভারত সরকারের হাতে এ ক্ষমতা থাকা আরও বেশী দরকার। এ ক্ষমতা থাকা সত্বেও, আমার অভিমত নির্বাচিত কমিশনারদের দ্বারা

কাজকর্ম করানো উচিত—সরকার যে পদস্থ কর্মচারী অথবা সেক্রেটারী নিযুক্ত করবেন তাঁদের দ্বারা নয়। সরকারী কর্মচারী বা সেক্রেটারী দিয়ে যদি পৌর কাজকর্ম চালানো যায় তাহলে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। তাই এটার দরকার নেই। জেলা অফিসার হিসেবে একটি জেলার প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালটির কাজকর্ম আমি নিজে দেখাশুনো করেছি। ডিভিশনাল কমিশনার হিসেবেও একটি ডিভিশনের সব কটি পৌরসভার কাজকর্ম আমি চালিয়েছি। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা কখনও খুব তৎপর ও সুদক্ষ কখনও ভীষণ নিষ্ক্রিয় ও শিথিল। কখনও তাঁরা ঠিক পথে চলেন, কখনও ভুল পথ ধরেন। কিন্তু আমি কখনও তাঁদের কোনো কাজে বাধা দিতে দেখিনি। পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি বা সাধারণ কাজকর্মের ব্যাপারে কখনও তাঁদের নিরুৎসাহ দেখিনি। ভাল পরামর্শ ও যুক্তিবাদী মতামত তাঁরা শুনতে চান না—এমনও আমি দেখিনি। লোকেরা যাঁদের নির্বাচিত করে, আমরা যা চাই, তাঁরা তাই করবেন যদি অবশ্য আমাদের একটু ধৈর্য, সহানুভূতি ও কাজ করবার কৌশল জানা থাকে। ভারতের শহরের ছোট জেলার পৌর কাজের জন্য যদি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে সরকার নিজেদের লোক নিয়োগ করেন, সেটা শুধু যে অবাঞ্ছিত ও অবিবেচক ব্যবস্থা হবে তাই নয়—এতে আমাদের অক্ষমতা ও সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। শহর ও গ্রামগুলিতে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রতি ঝোঁক তিন হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্য। একথা জেনেও যদি এটাকে আমরা এড়িয়ে যেতে চাই তাহলে সেটা প্রশাসন ক্ষেত্রে একটা মস্ত বড় ভুল হবে এবং এতে আমাদের অক্ষমতাই স্বীকার করার সামিল হবে।

জেলা পর্ষদ

জেলা পর্ষদের কথায় এসে, যে প্রশ্নটা সব সময় করা হয় সেটাই

আমি বলতে চাই। জিজ্ঞাসা করা হয় পর্ষদগুলির চেয়ারম্যান হিসেবে বেসরকারী লোকদের কেন নিযুক্ত করা হয়না। সুধীবৃন্দ, সাধারণত এই কারণে তাঁদের নিয়োগ করা হয়না যে, বেসরকারী লোকেরা তাঁদের গ্রাম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলেও জেলা অফিসরের মত সেই জেলা সম্পর্কে অত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁদের নেই। সুদক্ষ কাজ যাতে হয় সেদিকে আমাদের আগে জোর দিতে হবে। জেলা অফিসরই একমাত্র লোক—যিনি সাধারণভাবে সফর করতে বেরিয়ে তাঁর জেলার সর্বত্র সুনিশ্চিত ব্যবস্থা নিতে পারেন। অন্যদিকে এ ব্যাপারে আমি কোনো অবিচল নীতি ও ব্যবস্থা নেবার পক্ষপাতী নই। যেখানে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী রয়েছেন অথবা এমন কয়েকজন বেসরকারী ভদ্রলোক রয়েছেন—যাঁরা তাঁদের জেলা সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল এবং যাঁদের প্রশাসনিক কাজকর্মে দক্ষতা রয়েছে, কাজ করার মত সময় যাঁদের আছে—তাঁদের জেলা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করলে প্রশাসন ব্যবস্থার পক্ষে লোকসান হবেনা, বরঞ্চ লাভই হবে। এই দিকে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এটা আমি আন্তরিকভাবে চাই। জেলা পর্ষদগুলি সম্বন্ধে আর যে বিষয়টি নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করা হয়—তা হলো এদের আয় এত কম হওয়ার বিষয়। আপনাদের বলতে চাই, এটাই সবচেয়ে বড় বাধা ও ক্ষতিকারক। সেচ ও জল নিষ্কাশনের বড় কোনো পরিকল্পনা হলে জেলা পর্ষদের সহায়সম্পদ যাতে প্রাদেশিক সাহায্য দিয়ে বাড়ানো যায় সেটা শুধু যে বাঞ্ছিত তাই নয়, প্রয়োজনও বটে। নলকূপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এইসব প্রদেশের কত ভাল হয়েছে তা আপনারা জানেন, প্রাদেশিক সরকার যদি বরাদ্দ দেন তাহলে দুর্ভিক্ষ এড়াবার জন্য অন্যান্য কাজকর্ম জেলা পর্ষদের হাতে কেন দেওয়া যাবে না —সেটাইতো কথা। বাংলাদেশে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হলো জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা। এর ফলে ম্যালেরিয়া হয়। ঐ প্রদেশের অর্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। একটি জেলার ভাল জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য প্রত্যেক জেলা

পর্ষদকে প্রাদেশিক সাহায্য কেন দেওয়া যাবে না—তার কোন কারণ নেই। সুধীবৃন্দ, আমি অন্য জায়গায় বলেছি, বিদেশে সীমান্তের লড়াই-এ যত টাকা ব্যয় করা হচ্ছে সেই অর্থ দিয়ে যদি বাংলাদেশের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করা যেতো তাহলে বর্তমান যুগের এক বিষম অভিশাপ থেকে লক্ষ লক্ষ লোককে বাঁচানো যেতো। আমি এই পরামর্শ দিতে চাই : জনগণের সহায়তা নিয়ে কল্যাণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থার এজেণ্ট হিসেবে জেলা পর্ষদগুলিকে গড়ে তুলুন, সরকারী বিধিব্যবস্থার শেকল পরিয়ে এদের মেরে ফেলবেন না, অর্থের অভাবে এরা যেন অভুক্ত না থাকে।

প্রাদেশিক আইন পরিষদ

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আমি এখন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—প্রাদেশিক আইন পরিষদ নিয়ে দু'চার কথা বলবো। এ বিষয়ে আমার সুপারিশ হলো এই যে, যে পথের সন্ধান আগেই আমরা পেয়েছি, সেই পথ ধরেই চলা উচিত। অন্য কোন নতুন পথ ধরার প্রয়োজন নেই। জেলা ও পৌর সংস্থাগুলি পরিষদের জন্য তাঁদের সদস্য নির্বাচিত করেন এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য, জনগণের অভিমত তুলে ধরা। ভারতের প্রত্যেক দায়িত্বশীল প্রশাসক স্বীকার করবেন যে, এই ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থার ফলে সরকারের আইন যন্ত্রটি আরও শক্তি-শাল। ও উন্নত হয়েছে। নির্বাচিত সদস্যের অভিমত অগ্রাহ্য হলেও—অনেক সময় তাঁদের অভিমত অগ্রাহ্য হয়—তাঁদের অভিমত জানাটাই প্রশাসন স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর। এই অভিমত ও প্রতিনিধিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশের সুযোগ দেবার সময় এসেছে। জটিল নিয়মের বেড়া ভেঙ্গে ৬ জন সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু একটি প্রদেশের ৩০ থেকে ৪০ মিলিয়ন কিংবা তারও বেশী লোকের অভিমতকে তাঁরা কতটা প্রকাশ করতে পারেন। ভবিষ্যতে সরকার প্রত্যেক জেলায় তাদের একজন করে প্রতিনিধি নিয়োগ করার অনুমতি দেবেন বলে যদি আশা করি, তবে সেটা কি বেশী কিছু আশা করা হবে? সরকারী পদস্থ

কর্মচারী ও মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা যদি বাড়ানো হয়, আমার আপত্তি নেই। একদিনের পরিবর্তে পরিষদ যদি সপ্তাহে পাঁচ কিম্বা ছয় দিন বসে তাতেও আমার আপত্তি নেই, পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অভিমতের বিরুদ্ধে সরকারের প্রধান, যদি কোনো ব্যবস্থাকে নাকচ করে দেবার অধিকার বজায় রাখেন, তাহলে আমি আপত্তি করব না, কারণ খুব জরুরী বিষয় হলে, ইংলণ্ডের উভয় সভায় কোনো প্রস্তাব পাশ হওয়া সত্বেও রাণী তাতে তাঁর অনুমতি নাও দিতে পারেন। অন্ততঃ পুঁথিগতভাবে এ ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। এইসব রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা চালু হবার পরে আমি সুপারিশ করতে চাই যে, প্রত্যেক জেলার একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা আরও বাড়ানো হোক, যাতে কিনা লোকেদের অভিমত পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায়। আমাদের দেশের প্রশাসনের ওপরে আমরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চাই না কিন্তু যাতে আমাদের কল্যাণ নির্ভর করছে সেইসব বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাদের অভিমত শোনার যথেষ্ঠ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা আমরা নিশ্চয়ই চাইবো।

প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক পরিষদ

সুধীবৃন্দ, আইন পরিষদ শুধু আইন নিয়ে মাথা ঘামায়, প্রশাসনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা পরিষদের আওতায় আসে না। বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, প্রশাসনিক কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে লোকেদের কথা শোনা হয়না, তাদের অভিমত দেবারও কোনো ক্ষমতা নেই। একশোটার মধ্যে একটি উদাহরণ আমি দিতে পারি এবং তার থেকেই আপনারা বুঝে নিতে পারবেন আমি কি বলতে চাই। মধ্য ভারতে রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থার মেয়াদ ২০ বছরের জন্য হবে কিংবা ৩০ বছর—লোকেদের সে কথা ঘোষণা করার কোনো সাংবিধানিক মাধ্যম নেই, মালগুজারদের আয় থেকে সরকার শতকরা ৫০ কিংবা ৬০ ভাগ দাবী করবেন—এ কথা বলার সুযোগ জনগণের নেই। সুতরাং লোকেদের সাংবিধানিক অভিমত ছাড়া সরকার যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত

হন—তার ফলাফল খুব শুভ হয়না। সুধীবৃন্দ, এই ত্রুটি, এই দুর্বলতা দূর করা সম্ভব। বোম্বাই এবং মাদ্রাজে এই কার্যনির্বাহক পরিষদ রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্য ভারত এবং বাংলাদেশে অনুরূপ কার্যনির্বাহক পরিষদ স্থাপন করা যেতে পারে। ভারতের প্রশাসনের ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ ভারতীয়ের প্রত্যেক কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য হওয়া উচিত। তিনি জন-সাধারণের অভিমত তুলে ধরতে পারবেন। কার্যনির্বাহক পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের হাতে একটি বিভাগের কার্যভার দেওয়া হয়। ভারতীয় সদস্যের হাতে যে বিভাগের কার্যভার আমি দিতে চাই তা হলো ভূমি রাজস্ব বিভাগ, কৃষি এবং শিল্প। লক্ষ লক্ষ মূক কৃষক ও কারিগরদের বক্তব্য তুলে ধরতে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি যতটা সহায়ক হবেন, এমন আর কেউ নয়। অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে একজন ভারতীয়কে নিলে প্রাদেশিক প্রশাসন দুর্বল হয়ে যাবে না। বরঞ্চ তা প্রশাসনিক বিভাগকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে এবং এই বিভাগকে লোকেদের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করবে।

ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদ

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, কুয়াশা-ঘেরা সিমলার গিরিশৃঙ্গে ভারতীয় সদস্যদের জন্য আসন করে দেবার কথা যদি বলি তাহলে আমি কি খুব বেশী আশা করবো? কার্যনির্বাহক পরিষদে ভাইসরয়, অভিজ্ঞ ইংরেজ প্রশাসকদের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগ পান। কিন্তু যাতে ভারতের জনগণের স্বার্থ জড়িত আছে সেসব বিষয়ে ভাইসরয় সিদ্ধান্ত নেবার আগে, কয়েকজন ভারতীয় সদস্যের অভিমত শোনা উচিত—এ কথা যদি বলি তাহলে আমার কথা কি অযৌক্তিক বলে শোনাবে? ঋণগ্রস্ত কৃষকের অবস্থার ওপরে প্রভাব পড়তে পারে—এমন কোনো ব্যবস্থা নেবার আগে, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের জন্য ত্রাণকার্য, ভূমির রাজস্ব নির্ধারণ এবং যেসব প্রশ্নের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি

জড়িত, সেসব বিষয়ে ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদে সিদ্ধান্ত নেবার আগে কয়েকজন ভারতীয়ের অভিমত নিন—এই প্রস্তাব যদি আমি করি—তাহলে কি আমার কথা অবিবেচকের মত শোনাবে? ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদে আমি এমন কয়েকজন ভারতীয়কে নেবার কথা বলছি যাঁরা জনগণের অভিমত তাঁদের বিশ্বাস ও তাঁদের অনুভূতিকে পরিষদের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা রাখেন। কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যসংখ্যা যদি বেশী বাড়ানো যায় তার দক্ষতা হ্রাস পাবে, এটা আমিও মানি কিন্তু ভাইসরয়ের পরিষদে অন্ততঃপক্ষে তিনজন ভারতীয়ের স্থান হতে পারে। একজন বাংলাদেশ ও আসামের প্রতিনিধিত্ব করবেন, দ্বিতীয়জন উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব এবং তৃতীয়জন বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্য ভারতের প্রদেশগুলির প্রতিনিধি হবেন। ভাইসরয় নিজেই এঁদের নিযুক্ত করতে পারেন কারণ কার্যনির্বাহক পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি নেবার কোনো অর্থ হয়না। এই তিনজন ভারতীয়ের হাতে থাকবে তাঁদের নিজের নিজের প্রদেশের কৃষি, শিল্প এবং ভূমি রাজস্ব বিভাগের ভার। বিচক্ষণ ও মহানুভব আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ভার দিয়েছিলেন টোডরমলের হাতে, ভারতের মূক ও দরিদ্র কৃষক ও প্রস্তুতকারকের অবস্থার নিয়ন্ত্রণভার যদি অভিজ্ঞ ভারতীয়ের হাতে দেওয়া যায়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার শুধু যে বিচক্ষণতা দেখাবেন তাই নয়, রাজনৈতিক দুরদর্শিতারও পরিচয় দেবেন। আমি নিজে অবশ্য ভাবি, আমাদের দেশের সর্বোচ্চ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্বের যদি ব্যবস্থা থাকে তাহলে দেশের প্রশাসনিক বিভাগের অনেক উন্নতি করা সম্ভব। প্রাদেশিক সরকারগুলিও জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে পারবেন।

ভবিষ্যতের অগ্রগতি

ভদ্রমহোদয়গণ, এখন শুধু আপনাদের আর একবার ধন্যবাদ দিতে চাই। এই উপলক্ষে এই অধিবেশনে আমাকে পৌরোহিত্য করতে বলে

আমাকে আপনারা যে সম্মান দেখিয়েছেন, এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার কথা যে শুনেছেন আমি তার জন্য আবার আপনাদের ধন্যবাদ দিতে চাই। সারা জীবনই আমি, কেন জানিনা, আশাবাদী ছিলাম, সেই বিশ্বাস নিয়ে আমি আছি, সেই নিয়েই মরতে চাই। গত শতাব্দীতে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশে লোকেদের শাসন করার রীতিনীতি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। শুভ অভিপ্রায়ে উদ্বুদ্ধ কয়েকটি সার্বভৌম দেশও এ পরীক্ষা করেছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে এরা 'উদার উৎপীড়ক' নামে খ্যাত হয়েছেন। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ প্রকৃতির এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম আছে যে, আপনি যদি লোকেদের হাত বেঁধে রাখেন তাহলে আপনি তাদের জন্য চিরকালীন কোনো কল্যাণ করতে পারবেন না। য়ুরোপের প্রত্যেক দেশ একথা উপলব্ধি করেছে। ইংলণ্ড আছে এদের সর্বাগ্রে। প্রত্যেক ইংরেজ ঔপনিবেশিক দেশে এখন স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেসব দেশের জনগণের মনে আর কোনো অসন্তোষ ও বিরূপ ভাব নেই। তারা আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় সমর্থক। দু'বছরও হয়নি যখন লর্ড কার্জন আয়ার্ল্যাণ্ড সরকারের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন তখন বর্তমান ব্রিটিশ সরকার আয়ার্ল্যাণ্ড সরকারকে স্থানীয় শাসনের ব্যাপারে স্বায়ত্বশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন। ভারতের অবস্থা অবশ্য আলাদা, আমি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করছি আমাদের দেশে এক শক্তিশালী ও সুসংহত কেন্দ্রীয় সরকার দরকার। আমি যেসব প্রস্তাব করেছি তা কার্যকর করলে ভারত সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে বলে যদি ভাবতাম, তবে এসব প্রস্তাব আমি করতাম না। আমি এসব বিষয়ে ইংলণ্ডে এমন সব ইংরেজ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছি—ভারতের প্রশাসনে যাঁদের অসীম অভিজ্ঞতা। আমি তাঁদের বলেছিলাম, আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে যদি ভারত সরকারকে শক্তিশালী না করে দুর্বল

করে দেয় তাহলে তাঁরা যেন আমার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। আপনাদের আমি বলছি, তাঁরা কেউ বলেননি, আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে ভারত সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে, সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকলে, জনগণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখলেই ভারতে ব্রিটিশ শাসন দুর্বল হয়ে পড়বে। লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথ করে দিয়ে, একটা বিরাট ও অনুগত দেশের উৎসাহ ও সহযোগিতা পাবার চেষ্টা করে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাকে আমি শক্তিশালী করে তোলার অভিপ্রায় রাখি।

সুধীবৃন্দ, জেলা অফিসর হিসেবে আমার যে অভিজ্ঞতা তা বলবার অনুমতি যদি আপনারা দেন, তবে বলি। আপনারা নিশ্চয় জানেন একজন জেলা অফিসরকে ঘন ঘন বদলী করা হয়। এমন সব জেলার ভার আমার ওপর ছিল যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ জনসংখ্যা হিন্দু আবার অন্য সময়ে এমন সব জেলার ভার ছিল যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ জনসংখ্যা মুসলমান। আমি কথায় কথায় মন্তব্য করতে পারি যে, প্রশাসনিক কাজে আমি জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। মুসলমান জমিদার ও মুসলীম জনসাধারণের কাছ থেকে আমি এতটা সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়েছিলাম বলে বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহের মত বিরাট ও জটিল জেলাগুলির প্রশাসনে বেশ কিছুটা সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলাম। আমি যে কথাটা এখানে বিশেষভাবে বলতে চাই তা হলো এই যে, এইসব মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় সরকার সবসময় জেলা অফিসারকে তাঁর কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্য একজন মুসলীম সহকারী কলেক্টরকে নিয়োগ করেন। মুসলীম জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার যাবতীয় বিষয়ে এবং তাঁদের ধর্মীয় ও অন্য চিন্তা ও অনুভূতির ব্যাপারে আমি প্রশাসনিক কাজে আমার এই মুসলীম সহকর্মীদের কাছ থেকে বহু রকম সাহায্য ও উপদেশ পেয়েছি যা আমার কাজকর্মের খুব সহায়ক হয়েছে।

ভাইসরয় অথবা· একটি প্রদেশের গভর্ণরের ওপর অনেক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা থাকে, সেই তুলনায় একজন জেলা অফিসরের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক কম। আমি অনেক সময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আমরা সাধারণ জেলা অফিসররা অনেক সময় তো যা ভাবি তা এঁরা ভাবেন না কেন। আমরা সব সময় ভাবতাম যে কার্যনির্বাহক পরিষদে যদি কয়েকজন লোকের প্রতিনিধি থাকতো তা হলে প্রশাসনে অনেক সাহায্য হতো এবং এর উন্নতি করা যেতো। এটা কি ঐ রাজনীতিকরা কখনও ভাবেন না? আমি নিজেকেই নিজে উত্তর দি, কয়েকজন অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল ভারতীয় সহকর্মীর যদি সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে যেসব বড় বড় সমস্যা রাজনীতিকদের সামনে আসে তা অনেক সহজে সমাধান করা যায়। তবে যে সমস্যাই তাঁদের কাছে থাক না কেন, ভারতীয় কৃষি ·ও ভারতীয় প্রস্তুতকারকদের অবস্থার মত আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে কিনা সন্দেহ।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, য়ুরোপীয় ইতিহাসের সমার্থ অথবা ব্রিটিশ সংস্থাগুলির মূল মনোভাব বা ভারতে এক সুষ্ঠু সরকার—আমি যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রশ্নের বিচার করিনা কেন, দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে বৃহত্তর স্বার্থে গড়ে তোলার জন্য জনগণের সহযোগিতা ও তাঁদের অংশ গ্রহণ ছাড়া আর কোনো পথ আছে বলে আমার জানা নেই। গত কয়েক বছর যাবৎ আমরা এপথে এগোতে পাচ্ছি, দুর্ভোগ, দুর্দশা আর আতঙ্কের বছরগুলিতে আমরা আসলে পিছনের দিকে ছুটে যাচ্ছি, বিচক্ষণ ও সহানুভূতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিনে আমরা যেসব অধিকার ও সুবিধে পেয়েছিলাম সেসব থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু যেসব দেশ খুব উন্নত —তাদের ক্ষেত্রেও এই পিছন দিকে চলার ব্যাপার ঘটে। ভেবে দেখুন গত শতাব্দীর শেষার্ধের ইংলণ্ডের কথা, যখন রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের কথা বললে রাজদ্রোহ ও অপরাধ বলে শাস্তি দেওয়া হতো, জনসভা বন্ধ করার জন্য দমনমূলক আইন পাশ করা হতো,

এবং ইংরেজদের স্বাধীনতা সীমিত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল আইন প্রণয়ন করা হতো। নেপোলিয়নের যুদ্ধ থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই আতঙ্কের অধ্যায়ও কেটে গেল। ১৮৩২ সালে এলো নানা সংস্কারের যুগ। এই যে প্রতিক্রিয়াশীল সময়ের মধ্যে দিয়ে আজ আমরা চলেছি—এর অবসান হতে আর বেশী দেরী নেই। বিচক্ষণ ইংরেজরা অতীতে যেমন উপলব্ধি করেছে, ভবিষ্যতেও করবে যে, ইংলণ্ডের যা স্বার্থ, যা কর্তব্য ভারতেরও ঠিক তাই। তারা বুঝবে, স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থাকে প্রসারিত করলে ব্রিটিশ শাসনকে সম্প্রসারিত করা যাবে, সীমিত করে নয়। তারা বুঝবে, এই বিশাল ও সভ্য দেশকে কাছে টেনেই ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ, দূরে ঠেলে নয়।

সুধীবৃন্দ, উপযুক্ত রক্ষাকবচের বন্দোবস্ত করে যদি স্বায়ত্বশাসনের অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করি—তাহলেই কেবল দুর্দশা, দুর্ভোগ, দুর্ভিক্ষে প্রাণহানি বন্ধ করা যাবে, দেশে সমৃদ্ধি, সন্তোষ ও শান্তি আসবে এবং এক কৃতজ্ঞ দেশের আনুগত্য ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাওয়া যাবে। এটুকু সুবিধে না দিলে, তাদের নিজেদের ব্যাপারে ওটুকু অংশ না দিতে দিলে, দুর্দশা, অসন্তোষ, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে ভারতকে বাঁচানো যাবে না। সুতরাং ভারত সরকারের একজন অনুগত সেবক হিসেবে, বিচক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত দেওয়া কর্তব্য মনে করছি কারণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে যদি আমরা সুসম্বদ্ধ করতে চাই, যদি দুর্যোগ ও দুর্ভোগ থেকে দেশকে বাঁচাতে চাই—তাহলে এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

পরিশিষ্ট-৪

বারানসীতে প্রথম ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৫

জাতীয় কংগ্রেস উপলক্ষ্যে ভারতে আয়োজিত প্রথম শিল্প সম্মেলনের পৌরোহিত্য করার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা আমাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। আমাদের শিল্পের প্রসার বাড়াবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এই বিরাট প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা প্রতি বছর শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সব শ্রেণীর প্রস্তুতকারকেরা এইসব প্রদর্শনীতে তাঁদের তৈরী নানারকম জিনিসপত্র পাঠান। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার এইসব শিল্পের উন্নতির জন্য উদারভাবে সাহায্য করছেন। এ বছর আপনারা একটু অন্যরকম করার চেষ্টা করেছেন, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মত আপনারা অনুভব করেছেন শুধু জিনিসপত্র প্রদর্শনীতে সাজিয়ে রাখা ছাড়াও, যেসব শিল্প সম্পর্কে আপনারা ওয়াকিবহাল, সেগুলির তুলনামূলক বিচার করলে লাভ হবে, তাই আপনারা শিল্প প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্যও প্রদর্শনী থেকে আলাদা নয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য ভারতীয় শিল্পের প্রসার। রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে আমরা আজ এখানে মিলিত হইনি, হয়েছি শুধু শিল্প-প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে। হিন্দু, য়ুরোপীয়, মুসলীম ও পার্শী—বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে আমরা সুপারিশ আহ্বান করছি—বিশেষ করে যাঁরা ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল—তাঁদের কাছ থেকে।

দুই চরম অভিমত : সত্য মাঝপথে

সুধীবৃন্দ, ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে দুই চরম অভিমত শোনা যায়। আমার মনে হয়, এই দুটো অভিমতই ভুল। একটি হলো নৈরাশ্যজনক অভিমত—নিরাশা ও ব্যর্থতার চিৎকার। এঁরা বলেন, য়ুরোপের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে বলে ভারতীয় শিল্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, শুধুমাত্র কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে ভারত দিন দিন অবনতির দিকেই চলেছে। অন্য অভিমতে বেশী রকম আশার বাণী ফুটে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে এবং ভারতীয় প্রস্তুত-কারকরা যে কত এগিয়ে গেছেন এবং ভারতের জনগণের যে কত সমৃদ্ধি হয়েছে, ভারতের আমদানী রপ্তানীর মূল্যসূচক দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম অভিমত—নৈরাশ্যের উক্তি, আমাদের ভারতীয় সংবাদপত্রে এ জাতীয় মতামত আমি প্রকাশিত হতে দেখেছি। লণ্ডনে ইংরেজদের বৈঠকে আমি দ্বিতীয় অভিমত ব্যক্ত করতে শুনেছি কারণ তাঁরা একটি দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি জানতে বাণিজ্যের পরিসংখ্যানের বিচার করেন।

স্বভাবতই সত্য মাঝপথে। আমাদের সামনে এখন অনেক সমস্যা, কিন্তু নিরাশ হয়ে পড়ার মত কিছু হয়নি। বর্তমানে আমাদের শিল্পের অবস্থা খুবই শোচনীয় কিন্তু একেবারে নৈরাশ্যজনক নয়। আমাদের অনেক ক্ষেত্রে কঠিন, অনেক সময় অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু মানুষের মত যদি আমরা অসুবিধার মোকাবিলা করতে পারি তাহলে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে আমাদেরই হাতে। ডঃ জনসনের চমৎকার উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে হয়—আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা ছেড়ে নিরপেক্ষভাবে ও বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আসুন, আমাদের সঠিক অবস্থার বিচার করে দেখি।

আমাদের অসুবিধাটা দু'ধরনের। প্রথম কথা, আমাদের যেসব প্রাচীন শিল্প ছিল, নিঃসন্দেহে সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা, আমাদের

এমন অর্থনৈতিক দুরবস্থা যা বিশ্বের কোনো দেশের ভোগ করতে হয়না, কিন্তু তবুও সেই দুরবস্থার উর্ধে আমাদের উঠতে হবে। আমাদের দু'টো অসুবিধা খুব সহজ কথায় বলা যায়—প্রথমত অন্য প্রতিযোগিরা আমাদের চেয়ে অনেক আগে শুরু করেছে, এবং দ্বিতীয়ত এই প্রতিযোগিতায় নামবার পথে আমাদের অনেক বাধাবিঘ্ন।

আমাদের প্রথম অসুবিধা

যে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ ন্যায্য ছিল না, তার খপ্পরে পড়ে ভারতের প্রাচীন শিল্প কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—তা বিস্তৃতভাবে বলে গেলেও কোনো ফল হবে না। প্রকাশিত আমার দশটি গ্রন্থে এসব বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাবে লিখেছি, আজ আমি সংক্ষিপ্তভাবে কতকগুলি তথ্য পেশ করবো। বহু শতাব্দী ধরে ভারতের প্রস্তুতকারকেরা য়ুরোপ ও এসিয়ার বাজারে যোগ্য পুরস্কার পেয়ে এসেছে, আরব, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ভারতের জিনিষপত্র জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে বিশ্বের নানা বন্দরে সরবরাহ করেছে। সেকালে ভারতীয় শিল্পকে দাবিয়ে রাখার কোনরকম অভিপ্রায় ছিল না। অন্যদিকে তাদের উন্নতি ও প্রসারের জন্য তারা যতটুকু ক্ষমতা রাখতো, কিছু করাটাও তাদের স্বার্থের অনুকূল ছিল—কারণ ভারতের চমৎকার দ্রব্যাদি, এত বিভিন্ন রকমের জিনিষ ও জিনিষের এত প্রাচুর্য, তা তাদের মুনাফা ও উন্নতির সহায়ক ছিলো।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংলণ্ড ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলো তখন এ নীতির পরিবর্তন ঘটলো। ইংরেজরা নিজেরাই ছিল প্রস্তুত-কারকের জাত, তাদের উপনিবেশগুলির প্রস্তুতকারকদের দাবিয়ে তারা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি চেয়েছিল। এই একই নীতি অনুসরণ করা হলো ভারতেও এবং ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতের শিল্প বাণিজ্যকে উৎসাহ না দিয়ে নিরুৎসাহিত করা হলো। অত্যধিক শুল্ক বসিয়ে ভারতীয় প্রস্তুত-

কারকদের রপ্তানীর ওপর বাধা নিষেধ আরোপ করা হলো। খুব সামান্য কর বসিয়ে ইংরেজদের তৈরী জিনিষপত্রের আমদানী বাড়াতে সাহায্য করা হলো। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল—ব্রিটিশ শিল্পের প্রসারের জন্য ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্র করে তোলা। ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. উইলসনের ভাষায়, ব্রিটিশ প্রস্তুতকারকেরা "রাজনৈতিক অবিচারের হাতিয়ার কাজে লাগিয়ে তার প্রতিযোগীকে দাবিয়ে রেখে তার গলা টিপে মারলো। ন্যায্য প্রতিযোগিতায় সে এর সঙ্গে কিছুতে পেরে উঠত না।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর সবক'টি ভারতীয় শিল্পের মধ্যে সূতিবস্ত্রের শিল্প সবচেয়ে প্রসার ভাল করেছিলো। ইংলণ্ডে যান্ত্রিক তাঁত আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অন্যান্য শুল্ক ব্যবস্থা চালু হলো এবং ভারতের সূতিবস্ত্রের ধ্বংস নিয়ে এলো। আজ আমি আপনাদের সামনে বিস্তৃত বিবরণ দিতে চাইনা কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে আমাদের সূতিবস্ত্র প্রস্তুতকারকদের কিভাবে অবনতি হলো—সেই নৈরাশ্যজনক অবস্থা আমি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই।

১৮০১ সালে কলকাতা থেকে ইংলণ্ডে ৬,০০০ গাঁট তুলো রপ্তানী করা হয়েছিল, ১৮০২ সালে ১৪ হাজারেরও বেশী, ১৮০৩ সালে ১৩ হাজারেরও বেশী কিন্তু ১৮২৬ সালের পরে রপ্তানী আর হাজার গাঁটে উঠল না। ১৮০১ সালে কলকাতা থেকে আমেরিকায় এই একই জিনিষ রপ্তানী করা হয়েছিলো ১৩ হাজার গাঁট, কিন্তু ১৮২৯ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩০০ গাঁট। ১৮০০ সালে ডেনমার্ক আমাদের কাছ থেকে রপ্তানী করেছিলো ১৪০০ গাঁট তুলো। কিন্তু ১৮২০ সালের পরে তারা আমাদের কাছ থেকে ১৫০ গাঁট তুলোর বেশী কখনও নেয়নি। ১৮১০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে আরব ও পারস্য উপ-সাগরে রপ্তানী বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ৪০০০ থেকে ৭০০০ গাঁট তুলো। কিন্তু ১৮২৫ সালের পরে তা কখনই ২০০০ গাঁট ছাড়িয়ে যায়নি। কলকাতা থেকে বিশ্বের নানা দেশে যে তুলো ও সূতিবস্ত্র রপ্তানী করা হলো, ঊনবিংশ

শতাব্দীর প্রথম ভাগে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কলকাতার ক্ষেত্রে যা সত্য, ভারতের অন্যান্য বন্দরের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

বলা বাহুল্য, ভারতের কাছ থেকে সূতিবস্ত্রের রপ্তানী যেমন কমে গেল, অন্যদিকে য়ুরোপ থেকে সূতিবস্ত্রের আমদানী দ্রুতগতিতে বেড়ে যেতে লাগলো। ১৮৫৮ অর্থাৎ যে বছর রাণী নিজের হাতে ভারতের শাসনভার নিয়েছিলেন—সে বছরের মধ্যে আমদানীকৃত সূতিবস্ত্রের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৫ মিলিয়ন স্টারলিং। ১৮৭৭ সালে—অর্থাৎ যে বছর মহামান্যা রানী ভারতের সম্রাজ্ঞীর পদ অলঙ্কৃত করলেন—সে বছরে আমদানীকৃত সূতিবস্ত্রের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১৬ মিলিয়ন স্টারলিং। সূতিবস্ত্রের আমদানী এভাবে বেড়ে যাওয়ার ঘটনাকে উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, ভারতের তখন ক্রমাগত সমৃদ্ধি হচ্ছিল। কিন্তু যে কোন বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয় এইসব পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, ভারতের এতবড় শিল্প কিভাবে লোপ পাচ্ছে এবং দেশের সম্পদের পক্ষে তা কতটা ক্ষতিকর। এই বিষয়ে বেশীক্ষণ আমি বলবো না, অতীতে আমরা যে পিছিয়ে পড়েছিলাম, তা প্রমাণ করার মত যতটুকু বলার ছিল, সব বলেছি। আমি এখন আমাদের দ্বিতীয় অসুবিধার কথা বলবো, আমাদের অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে যে অর্থনৈতিক বাধাবিঘ্ন আমাদের সম্মুখীন হতে হবে—সে কথা।

আমাদের দ্বিতীয় অসুবিধা

সুধীবৃন্দ, কাঁচামালের উৎপাদক অথবা অন্য দেশের তৈরী জিনিসপত্রের মজুত ভাণ্ডার হিসেবে ভারতকে আমরা দেখতে চাইনা। আমি বিশ্বাস করি না, একটি দেশ শুধু কৃষি ব্যবস্থাকে সর্বস্ব করে স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, তেমনি আবার শুধু উৎপন্ন জিনিস দিয়েই একটি দেশের সমৃদ্ধি আসেনা। দেশের লোকদের জন্য চাকরীবাকরির ব্যবস্থা করতে

হলে কৃষি ও শিল্প—হ'টির উন্নতি সমানভাবে করতে হবে। আমি ইংলণ্ডের বর্তমান অবস্থাকে হিংসা করিনা—সে তার কৃষি ব্যবস্থাকে এমনভাবে অবহেলা করেছে যে আজকে তার নিজের খাদ্য সরবরাহের জন্য তাকে অন্য বিদেশী দেশের ওপরে নির্ভর করতে হয়, এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। অন্য দিকে আমাদের দেশ তার নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাতে সবরকম তৈরী জিনিসের জন্য বিদেশের দেশগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে আছে—এটাকেও আমি ঠিক ভাল চোখে দেখিনা। এই নিরানন্দ অবস্থা থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হবে, কিন্তু আমাদের সামনে কী কী বাধাবিঘ্ন তা যদি আমরা সুস্পষ্টভাবে না বুঝি—তাহলে ভারতের ভাগ্য ফেরানো সম্ভব নয়।

প্রথমতঃ আমাদের এই মান্ধাতার আমলের প্রাচীন রীতিনীতি বদলাতে হবে। ঘরে ও কুটিরে আমাদের শিল্পকার্য চালাই। ভারত কুটির শিল্পের দেশ। প্রত্যেক কৃষক তার জমি নিজে চাষ করে, খাজনা দেয় এবং বংশানুক্রমে সে জমি তার নিজের ছেলেকে সমর্পণ করে। প্রত্যেক তাঁতি, নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সাহায্য নিয়ে সূতো পাকায় ও তাঁত চালায়। এই কুটির শিল্প সম্বন্ধে আমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। যে জমিতে চাষী চাষ করে—বংশানুক্রমে যে ছোট একটি জমির মালিক—সে শ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। যে শ্রমিক সে জমিদার ও তাঁর বিরাট ভূসম্পত্তির উপর নির্ভর করে এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে মজুরী কামায়। ভদ্র তাঁতী—যে তার ঘরে বসে নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের সাহায্যে পয়সা রোজগার করে, বিরাট কারখানার বিশ্রী আবহাওয়া ও ভিড়ের মধ্যে কর্মরত নারী ও পুরুষের চেয়ে সে অনেক সুখে ও শান্তিতে থাকে। নিজের জমিতে বা নিজের কুটিরে মানুষ যখন কাজ করে তখন তার মর্যাদাও বেড়ে যায়—কিন্তু সে যখন একটা বিরাট যন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে কাজ করে তখন তার কি মর্যাদা থাকে—যে যন্ত্র, মানুষের সব মনুষ্যত্ব নষ্ট করে ফেলে! ল্যাঙ্কাশায়ারের অনেক বিরাট সূতীবস্ত্রের কারখানা আমি

দেখেছি, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সেখানে কাজ করে, আমাদের শ্রমিকরা বেশীর ভাগ তেমন কাজ করুক—এটা আমি চাইনা। যাঁরা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল তাঁরা বলেন, ভাল মজবুত স্বাস্থ্যের জন্য চাই পল্লী অঞ্চলের নির্মল হাওয়া। কোনো দেশ যখন তার পল্লীশিল্পকে অবহেলা করে এবং সবাই মিলে শহরে এসে বাস করতে চায় তখন সে জাতের অবনতি ঘনিয়ে আসে। আমাদের সব মানুষকে শহরে পাঠাবার ভুল যেমন আমরা করবো না, তেমনি শহরে শিল্পের বড় কেন্দ্র গড়ে তুলতেও আমাদের শিখতে হবে। সবাই মিলে কুটির শিল্প গড়ে তোলার অভ্যাস আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে এবং কোম্পানী, কলকারখানা স্থাপন করতে শিখতে হবে কারণ যদি আমাদের শিল্পকে রক্ষা করতে চাই, বাঁচিয়ে তুলতে চাই—তবে এ শিক্ষার খুবই প্রয়োজন।

কিন্তু কোম্পানী ও কারখানা স্থাপন করতে মূলধনের দরকার হয়। মূলধন জমা করার মত অবস্থা ভারতের নেই। আজ আমি রাজনৈতিক বিষয়ে কোন কথা বলতে চাইনা কিন্তু এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সমৃদ্ধ দেশগুলির মত আমাদের দেশে সহায়সম্পদের সঙ্গতি খুব একটা ব্যাপক নয়। এটা আপনাদের প্রত্যেকেরই জানা কথা। ইংলণ্ড, আমেরিকা বা জাপানের তুলনায় আমাদের দেশে অনেক বেশী কর ধার্য করা হয় এবং জমির খাজনা ধার্য করার যখন সময় হয়—প্রত্যেকবার প্রদেশের জমির খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের রাজস্ব ঠিক ভারতের জন্যই ব্যয় করা হয়, বছরের পর বছর আভ্যন্তরীণ খরচ বাবদ এ দেশ থেকে প্রচুর অর্থ বিদেশে পাঠানো হয়। এই সাম্রাজ্যের বড় বড় চাকরী আমাদের জন্য খোলা নেই। আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যে মূলধন প্রয়োজন, ঠিক এইসব কারণেই আমরা সেই মূলধন জমা করে উঠতে পারিনা এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ধনী ব্যক্তিরাও অনেক গরীব। এদেশে কারুর এক লক্ষ টাকা থাকলে আমরা

তাকে বড়লোক ভাবি কিন্তু ইংলণ্ডে কারুর যদি তিন হাজার পাউণ্ড থাকে—সে সাধারণভাবেও জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না।

সবশেষে আমাদের আর্থিক আইনকানুনের অসুবিধা আছে—ল্যাঙ্কাশায়ার আমাদের আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা নিজেরা নই। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে, লর্ড লিটনের পরিষদের স্যর জন স্ট্রাচে ও মিলিটারী সদস্য ছাড়া প্রত্যেক সদস্যের বিরুদ্ধে ভোট ও পরামর্শ সত্ত্বেও কি করে লর্ড লিটনের সরকার আমদানী শুল্ক রদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার যখন আমদানী শুল্ক বসানো হলো তখন ল্যাঙ্কাশায়ারকে সন্তুষ্ট করতে ভারতীয় মিলের তৈরী দ্রব্যের ওপর লর্ড এলজীন আবগারী শুল্ক বসাতে বাধ্য হলেন সেকথাও নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। কোনো সভ্য দেশে আধুনিক আর্থিক আইন ব্যবস্থায় শিশু শিল্পের ওপর আবগারী শুল্ক বসাবার মত অবিবেচক কাজ আর হতে পারে কিনা আমার জানা নেই। পার্লামেন্টের ব্লু-বুক্সে এই আর্থিক আইনের পরিবর্তনের কারণ দেখিয়ে যেসব চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু রেকর্ড করা হয়েছে—ভারতের মত মহান এক সাম্রাজ্যের সরকারের পক্ষে এরচেয়ে অপমানকর আর কিছু হতে পারে না বলেই আমার মনে হয়।

আমরা কিভাবে এইসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি

এইসব হলো আমাদের অসুবিধা। প্রথমতঃ আমরা পিছিয়ে পড়েছি এবং যা আমরা হারিয়েছি তা আবার ফিরে পেতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক শিল্পের ব্যাপারে প্রশিক্ষণের অভাব, মূলধনের অভাব এবং আর্থিক আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভাব—এই তিনটি বড় অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। আপনাদের নিরুৎসাহিত করতে আমি এসব অসুবিধার কথা উল্লেখ করছিনা, করছি তার কারণ এইসব অসুবিধার মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে

এবং পরিশেষে জয়ী হতে হবে। এইসব অসুবিধার মধ্যে পড়ে খুব কম দেশই সফল হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমাদের কারিগরের ধৈর্য ও দক্ষতায় আস্থা আছে। নতুন নতুন পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতার ওপরে আমার বিশ্বাস আছে। এই আশ্চর্য সুন্দর দেশের সম্পদের উপর আমার নির্ভরতা আছে। আমাদের সস্তা মজুরীর হারও নির্ভরযোগ্য। সারা জীবন ধরে আশাবাদী, একেবারে সংগ্রাম না করার চেয়ে সংগ্রাম করে বিফল হওয়াকে আমি শ্রেয় মনে করি। শিল্প বিপ্লবে আমরা সংগ্রাম করে বিজয়ী হবোই—এই আমার বিশ্বাস। আমাদের দেশের যাঁরা নৈরাশ্যের অন্ধকারে হাতড়ে হাত পা ছুড়তে অভ্যস্থ—যাঁরা বলেন, আমাদের সবই গেল—তাঁদের প্রতি আমার আস্থা নেই, ধৈর্য নেই। গত কুড়ি কিংবা ত্রিশ বছরের ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে, সব কিছু আমরা হারাইনি এবং অনেক কিছুই আমরা অর্জন করেছি।

তুলো শিল্পের দিকে আর একবার তাকালে আপনারা দেখতে পাবেন, ইংলণ্ডের আবিষ্কৃত যন্ত্রচালিত তাঁত আমরা গ্রহণ করেছি এবং এই তাঁত বসিয়েছি বোম্বাই, নাগপুর এবং আহ্‌মদাবাদের কারখানাগুলিতে। এগুলি প্রতি বছর শুধু যে সংখ্যায় বাড়ছে তাই নয়, বাণিজ্যেও বাড়ছে এবং এগুলি ভবিষ্যতে ভারতের প্রয়োজন মেটাতে অনেকাংশে সক্ষম হবে বলেই আশা রাখি। হস্তচালিত তাঁত ভারতে একেবারে মরে যায়নি এবং একেবারে মরে যাবে না। মিঃ চ্যাট্যারটন, মিঃ চার্চিল এবং মিঃ হাভেলের মত আমাদের বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী, উন্নতিসাধনের যেসব প্রয়াস করছেন তাতে ভারতের পল্লী অঞ্চলে হস্তচালিত তাঁতগুলি তাদের উৎপাদন যে দ্বিগুণ করতে পারবে এবং নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রেশম গুটীর চাষ ও রেশম বোনার শিল্প বাড়ছে, বছরে বছরে ভারতে ভারতীয় রেশমের

চাহিদাও বেড়ে চলেছে। পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে উলের কারখানা স্থাপিত হয়েছে, ভারতের প্রকৃত বন্ধু বলে আমি যাঁদের ভাবি সেইসব উৎসাহী ইংরেজ এইসব কারখানা স্থাপন করেছেন, যেসব উলের জামা আজকে আপনারা পরে এসেছেন এবং যা আমি পরেছি—সেগুলি ভারতে তৈরী হচ্ছে। বাংলাদেশে পাট শিল্পের আবিষ্কার নতুনএবং এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। য়ুরোপের কলাই করা লোহার জিনিসপত্র আমাদের পেতল ও তামার জিনিসের সঙ্গে কখনও প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না, এইসব জিনিসের ব্যবহার বাড়ছে বৈ কমছে না।

সবশেষে, কয়লা ও লোহা প্রতি বছর বেশী পরিমাণে আহরণ করা হচ্ছে। আর কয়লা ও লোহা ছাড়া আধুনিক কোনো শিল্পের প্রসার সম্ভব নয়। ওড়িশার নতুন আকরিক লৌহ ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখান থেকে লোহা আহরণের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। প্রস্তুতকারী শিল্পে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা অন্যান্য দেশের মত ভারতেও খুব আছে।

সূতীবস্ত্র ও উলের জিনিসের উৎপাদন সাম্প্রতিককালে শতকরা প্রায় একশো থেকে দেড়শো ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানে তা দেখানো হলো ঃ

সূতীবস্ত্র	১৮৯৬-৯৭	১৯০৪-০৫
	৮২,৯৩৩,০০০ পাউণ্ড	১৫৮,৭৪৭,০০০ পাউণ্ড
উলের জিনিস	১৮৯৪	১৯০৩
	১,৬৫৭,০০০ পাউণ্ড	২,৯৭৭,০০০ পাউণ্ড

সুধীবৃন্দ, এ কয়েক বছরে আমরা এতটা সুফল দেখাতে পেরেছি এবং হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ পার্সী—সব জাতির লোকেদের এগিয়ে যাওয়ার পথে সাহায্য করেছি। আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, জাপান ছাড়া এসিয়ার অন্য কোনো দেশ একটা যুগের মধ্যে এতটা শিল্পোন্নতি করতে পারেনি। আমরা যেসব অসুবিধা মাথায় করে সংগ্রাম করছি,

আমি বলতে পারি এত অসুবিধা মাথায় করে অন্য কোনো দেশ, আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে নিজেকে এতটা সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো না, অন্য কোনো দেশ এতটা দক্ষতা, এতটা ধৈর্য ও সর্বোপরি এতটা সফলতা অর্জন করতে পারতো না।

স্বদেশী আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখন আমরা অনেক বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—শিল্পোন্নয়নের প্রতিযোগিতায় আমাদের আর কেউ পরাজিত করতে পারবে না। আজকে যাঁরা এই হল ঘরে বসে আছেন আমি তাঁদের মুখে প্রতিফলিত দেখছি আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অঙ্গীকার—ভগবান যদি সদয় হন—আমরা আমাদের নিজেদের বাহুবলে নিজেদের মুক্তি লাভ করবো।

ভারতের ইংরেজী স্কুল ও কলেজে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন—তাঁরাও, বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয় প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই মহৎ কাজে লেগে পড়েছেন। যেকোন ন্যায্য মাধ্যম অবলম্বন করে, যেকোন আইনগত প্রয়াস চালিয়ে এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ লোকেদের মধ্যে আমাদের দেশে তৈরী জিনিসের চাহিদা বাড়াতে হবে—এই যে আকাঙ্খা—এটা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুধীবৃন্দ, আমি এখন এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করছি যাকে কেন্দ্র করে অনেক গরম গরম আলোচনা হয়ে গেছে। বিষয়টা হলো স্বদেশী আন্দোলন। আপনাদের সবার মাথায় এই চিন্তাটা রয়েছে। আমি যদি এ বিষয়ে নীরব থাকি তাহলে যে দায়িত্ব আপনারা আজ আমার মাথায় চাপিয়েছেন—তাতে ত্রুটি থেকে যাবে। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের যাঁরা নেতা—তাঁরা কেউ কেউ আজ উপস্থিত আছেন এবং

তাঁদের সামনেই আমার এ প্রসঙ্গটি তুলতে চাই। জনগণের ও সরকারের স্বার্থ রক্ষা করতে এইসব নেতা এই আন্দোলনকে যথাসাধ্য শান্তিপূর্ণ ও আইনগতভাবে চালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এটা আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে যদি কোনো গণ্ডগোলের ঘটনা হয়ে থাকে—আমরা তার নিন্দা করি। অন্যদিকে, সরকার অযথা ভয় পেয়ে যদি অবিবেচকের মত দমননীতি চালান—সেটাকেও আমরা নিন্দার্হ মনে করি। কারণ গণ্ডগোল কচিৎ-কখনও হলেও তাকে যেমন স্বদেশী আন্দোলন আখ্যা দেওয়া যায় না তেমনি অবিবেচনাসুলভ দমননীতির সঙ্গেও এই স্বদেশী ব্যাপারের কোনো সংশ্রব নেই। আমি যেটুকু বুঝি, এই আন্দোলনের মূল কথা হলো, আইন-সঙ্গত উপায়ে দেশের তৈরী শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া, তাকে বাড়ানো এবং সব শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে এদের তৈরী জিনিসপত্রের জন্য চাহিদা বাড়াবার প্রচেষ্টা। সুধীবৃন্দ, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে আমি এই আন্দোলনকে সমর্থন করি এবং আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে আমি সহযোগিতা করবো।

ভদ্রমহোদয়গণ, স্বদেশী আন্দোলন এমন একটা আন্দোলন, যা বর্তমানকালে বিশ্বের সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মিঃ চেম্বারলীন রক্ষাকবচের কার্যসূচীর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা প্রচলন করতে চান, মিঃ বালফোর পাল্টা জবাবের এক কার্যসূচী হাতে নিয়ে এটাই করতে চাইছেন, ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র এবং সব কটি ব্রিটিশ উপনিবেশ দেশ, অত্যধিক শুল্কের প্রাচীর খাড়া করে এই আন্দোলনকেই গ্রহণ করছে। আর্থিক আইন-কানুনের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, তাই আমাদের দেশের তৈরী জিনিস, বিদেশের তৈরী জিনিসের বদলে ব্যবহার করবো—এই প্রস্তাবের দ্বারা আমরা এই স্বদেশী আন্দোলনের কার্যসূচী গ্রহণ

করেছি। আমি এতে এমন কিছু দেখছি যা প্রশংসারযোগ্য ও যাতে আমাদের উপকার হবে। এতে আমাদের শিল্পগুলি এগিয়ে যাবার সুবিধে ও উৎসাহ পাবে এবং এইসব শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে ভারত সরকার সবসময় খুবই আগ্রহ দেখিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ তাঁতি ও অন্য কারিগর আধ-পেটা খেয়ে কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এর ফলে তারা অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, তারা আবার তাঁত ও অন্যান্য শিল্পে ফিরে যাবে। এটা তাদের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ প্রভাব থেকে অনেকটা বাঁচাবে—যে দুর্ভিক্ষের প্রভাব থেকে এদের বাঁচাতে সরকার সব সময় যথাসাধ্য করে যাচ্ছেন। স্বদেশী আন্দোলন আমাদের প্রস্তুতকারকদের নতুন করে উদ্দীপনা জোগাবে। এ উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাদের খুবই দরকার। উৎসাহ দিলে তারাও আমদানীকৃত জিনিসের ওপর কম নির্ভর করবে, দেশের তৈরী জিনিসের ওপর অনেক বেশী নির্ভরশীল হবে। এক কথায়, আমাদের শিল্প সংস্থাগুলিকে নতুন জীবনের সন্ধান দেবে, ভারতীয় শিল্প এগিয়ে যাবে। শিল্পে নিযুক্ত লোকেদের সমৃদ্ধি হোক এটা ভারত সরকার যত আন্তরিকভাবে চান, ভারতের জনগণও ঠিক ততটাই চায়।

সুতরাং আমিও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, স্বদেশী আন্দোলন ভারতে প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। প্রত্যেক জেলায় একটি করে সংস্থা গড়ে তোলা উচিত—যে সংস্থা এই আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখবে ও ছড়িয়ে দেবে। এই সংস্থাগুলি শুধু যে শহরে শহরে দেশের তৈরী কাপড় ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করবে তাই নয়, গ্রামে গ্রামেও একই কাজ করবে।

এই সংস্থাগুলি নিঃশব্দে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বছরে বছরে তাদের কাজকর্ম বাড়িয়ে যাবে, তাদের সমালোচকদের উপহাস অগ্রাহ্য করে যাবে

এবং তাদের বিরোধীদের ক্রোধোক্তি বীরত্বের সঙ্গে মাথা পেতে নেবে। কিছু করার উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে ফলাও করে তা দেখাবার প্রয়োজন নেই কারণ একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক মন্তব্য করেছিলেন, হঠাৎ বিক্ষুব্ধভাবে শরীর নাচালেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, নিঃশব্দে বোঝা বইবার ক্ষমতাতেই তা প্রকাশ পায়। আমাদের অনেক বড় কাজ ও বিরাট কাজ করতে হবে। সেকথা মনে রেখে দেশবাসীর প্রতি আমাদের নিঃশব্দে ও বিবেক সজাগ রেখে কর্তব্য করে যেতে হবে। আমাদের এই মহতী প্রচেষ্টায় আমরা যদি সফলকাম হই, তাহলে বিশ্বের সামনে আমরা এমন একটা উদাহরণ খাড়া করতে পারবো যার তুলনা পাওয়া ভার। আমরা আধুনিক জগতের সামনে এটাই প্রমাণ করতে পারবো যে, সংরক্ষণমূলক শুল্ক ব্যবস্থা ছাড়াই একটি দেশ তার প্রস্তুতকারক ও অন্যান্য শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আমরা এই কাজে যদি ব্যর্থ হই তাহলে যে প্রস্তাব আমরা নিয়েছি যা আমরা প্রচার করে চলেছি তা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হবে। যদি ব্যর্থ হই তাহলে অন্য শিল্পোন্নত দেশের কাছে আমাদের চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে—অথচ এই অবস্থার জন্য আমরা কাউকে দোষারোপ করতে পারবো না। এই অবস্থার থেকে মুক্তি পেতেই আমাদের সংগ্রাম।

নৃপতিশাসিত রাজ্যগুলিতে শিল্পোন্নয়ন

সুধীবৃন্দ, আমার ভাষণ শেষ করার আগে আমি নৃপতিশাসিত রাজ্যগুলির শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলবো। এইসব রাজ্যে শিল্পের যত অগ্রগতি হয়েছে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলির তুলনায় তা নেহাৎ কম নয়। আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, মহীশূরে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে সর্বক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের জন্য কিভাবে প্রয়াস চালানো হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন কাশ্মীরে রেশম শিল্প কিভাবে বেড়ে

যাচ্ছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আরও অনেক শিল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধেও আপনারা অনেক কথা শুনেছেন। যে রাজ্যের আমি সেবা করতে পেরে গর্বিত, তার কথাও আপনারা বোধহয় শুনেছেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, বরোদা রাজ্যের সবচেয়ে বড় ভাগ্য সেখানে ভারতের একজন বিশিষ্ট নৃপতি শাসন করে আসছেন। রাজ্যের শিল্প প্রসারের দিকে তাঁর প্রশাসন যত গুরুত্ব দিয়ে আসছে—এমন আর অন্য কিছুর জন্য নয়। কুড়ি বছর আগে কাপড়ের কল কি—বরোদার লোকেরা যখন জানতো না তখন বরোদার মহামান্য গাইকোয়াড়, রাজ্যের লোকেদের শিক্ষার জন্য একটি কারখানা স্থাপন করেন। এখন কাপড়ের কলের গুরুত্ব এত বেড়ে গেছে যে, মহারাজ রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন কারখানাকে বেসরকারী শিল্পের হাতে তুলে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, বেসরকারী শিল্প ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে তোলা। তাঁর এ আশা বিফল হয়নি। একটি বেসরকারী কারখানার সাফল্য অন্য পুঁজিবাদীদের উৎসাহিত করেছে, নতুন কোম্পানী গড়ে উঠছে নতুন কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে শুধু বরোদার জনগণের চাহিদাই যে আমরা মেটাতে পারবো তাই নয়—বরোদার বাইরের চাহিদাও মেটাতে পারবো বলে আশা রাখি।

হস্তচালিত শিল্পেরও খুবই ভবিষ্যৎ। বরোদার গাইকোয়াড় তাঁত বোনার একটি স্কুল স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ, আহমেদনগর ও অন্যান্য জায়গায় কিভাবে হস্তচালিত তাঁত চালানো হয়—বহু ছাত্রকে সে বিষয়ে এই স্কুলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এইসব তন্তুবায় ছাত্ররা যখন শিক্ষা সমাপ্ত করবে—তারা তাদের নিজেদের গ্রামে ও অন্যান্য তাঁত-কেন্দ্রে কাপড় বোনার নতুন ও উন্নতধরনের পদ্ধতি বার করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আমাদের ওখানে একটি কারিগরি সংস্থা আছে এবং সব শ্রেণীর

ছাত্রকে সেখানে যান্ত্রিক শিল্পের পদ্ধতি শেখানো হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য এত ছড়িয়ে পড়েছে যে, ভারতের কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক সরকার, বরোদায় এইসব শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতে তাঁদের নিজেদের প্রদেশের ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে পাঠাচ্ছেন।

বরোদার এই কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র কাপড়ে রঙ করার একটি কারখানা স্থাপন করেছেন। তিনি রঙিন কাপড় শুধু যে ভারতের সর্বত্র পাঠাচ্ছেন তাই নয়, রেঙ্গুনেও পাঠাচ্ছেন। আর একজন বরোদার লোক—য়ুরোপে শিক্ষাদীক্ষা সমাপ্ত করে এখানে একটি চকোলেট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছেন। তিনি শীঘ্রই ভারতের সর্বত্র শিশুদের জন্য ছোট ছোট সুন্দর প্যাকেট পাঠাতে পারবেন বলে আমি আশা করছি। বরোদার আর একজন জেলা অফিসর—য়ুরোপে শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছেন এবং বরোদার তামাক থেকে সিগারেট বানাতে সফল হয়েছেন। এখন তিনি দেশলাই তৈরী করতে ব্যস্ত—মনে হচ্ছে দেশলাই দিয়ে তিনি তাঁর নিজের সিগারেট জ্বালাতে চান।

সুধীবৃন্দ, আপনারা যাঁরা এই প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, ওখানে কয়েকজন বরোদার মেয়ে রয়েছে। এরা ভারতীয় মহিলাদের জন্য লেস বোনে। আমি আরও একটা খবর দিতে পারি। রাজ্যের খরচে বরোদার ছাত্রদের বিভিন্ন শিল্পে প্রশিক্ষণ দিতে য়ুরোপ, আমেরিকা, এমন কি জাপানে পর্যন্ত পাঠানো হচ্ছে। এটা শুনে আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যিনি বরোদা শাসন করেন—সেই শান্ত ও নীরব মানুষটি দেশের অন্যান্য দেশপ্রেমিকের চেয়ে কোন অংশে কম দেশপ্রেমিক ও আন্তরিকতাপূর্ণ নন—তিনি ভারতের শিল্পকে বাঁচিয়ে তুলতে ও সেগুলির উন্নতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

পরিশিষ্ট-৫

ভারতে দুর্ভিক্ষের তালিকা (১৭৬৯-১৮৯৮)

১৭৬৯-৭০	...	বাংলাদেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ
১৭৮৩	...	মাদ্রাজ এবং বোম্বাই ঃ কত লোকের মৃত্যু হয়েছিল তার হিসাব নেই।
১৭৮৪	...	উত্তর ভারত ঃ কতজনের মৃত্যু হয়েছিল তার রেকর্ড নেই।
১৭৯২	...	সাধারণত বোম্বাই, মাদ্রাজ, দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে হয়েছিলো।
১৮০২-৩	...	বোম্বাই ঃ মৃত্যুহার অত্যধিক।
১৮০৩-৪	...	যুক্ত প্রদেশ এবং রাজপুতানা।
১৮০৫-৭	...	মাদ্রাজ ঃ মৃত্যুহার অত্যধিক।
১৮১১-১৪	...	মাদ্রাজ ঃ ততটা গুরুতর নয়। বোম্বাইতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ কিন্তু মৃত্যুর হিসাব নেই।
১৮১২-১৩	...	রাজপুতানা ঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঃ মৃত্যুর সংখ্যা সম্ভবতঃ পনের থেকে কুড়ি লক্ষ।
১৮২৩	...	মাদ্রাজ ঃ প্রায়ই মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল।
১৮২৪-২৫	...	যুক্ত প্রদেশ এবং বোম্বাই ঃ দারুণ অভাব-অনটন তবে দুর্ভিক্ষ নয়।
১৮৩৩-৩৪	...	উত্তর মাদ্রাজ ঃ মৃত্যুহার অত্যধিক ঃ কয়েকটি জেলাতে শতকরা ৫০ ভাগ লোক নিশ্চিহ্ন।
১৮৩৩-৩৪	...	বোম্বাই ঃ দারুণ অভাব, তবে দুর্ভিক্ষ নয়।
১৮৩৭-৩৮	...	উত্তর ভারত ঃ প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়।

এইচ. ডি. মালবিয়া প্রণীত "ভিলেজ পঞ্চায়েতস্ ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

১৮৫৪	...	মাদ্রাজ
১৮৬০-৬১	...	যুক্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাব, মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজারের কম নয়।
১৮৬৫-৬৬	...	ওড়িশা ঃ মাত্র ৬টি জেলাতেই মৃতের সংখ্যা ১৩ লক্ষ।
১৮৮৪-৮৫	...	বাংলা, বিহার, ছোট নাগপুর, বেলাড়ী ও মাদ্রাজের অনন্তপুর জেলাসমূহ।
১৮৮৬-৮৭	...	মধ্য প্রদেশ
১৮৮৮-৮৯	...	বিহার
১৮৮৯	...	ওড়িশার করদ রাজ্য সমূহ।
১৮৮৮-৮৯	...	মাদ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম ঃ ভীষণ দুর্দশা ঃ এই দুই বছরে ও ১৮৯০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ।
১৮৯০	...	কুমায়ুন এবং গাড়োয়াল।
১৮৯২	...	আলমোড়া ও গাড়োয়াল
১৮৯১-৯২	...	মাদ্রাজ এবং বোম্বাই ঃ দক্ষিণাত্য ও বাংলা, আজমীর ও মাড়ওয়ার ; ১৮৯১-৯২ সালের সর্ব ভারতীয় মৃতের পরিসংখ্যান ১৬ লক্ষ ২০ হাজার।
১৮৯৫-৯৭	...	১৮৯৫ সালে যুক্ত প্রদেশ, বাংলা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে মৃত্যু সংখ্যা স্বাভাবিকের বেশী, ১৮৯৬ সালে ১২ লক্ষ অর্থাৎ মোট মৃতের সংখ্যা প্রায় ৬৫লক্ষ ৫০ হাজার।
১৮৯৮	...	পরিসংখ্যানে এবছরকে তথাকথিত ‘দুর্ভিক্ষের বছর নয়’ বলে অভিহিত করলেও এ বছরে অতিরিক্ত ৬,৫০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

পরিশিষ্ট-৬

ভারতে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হিসাব (১৮৬৫-১৯০১)

বছর	অঞ্চল	মৃত্যুসংখ্যা
১৮৬৫-৬৬	বিহার ও উত্তরবঙ্গ	১,৩৫,০০০
১৮৬৫-৬৬	মাদ্রাজ	৪,৫০,০০০
১৮৬৫-৬৯	রাজপুতানা	১২,৫০,০০০
১৮৬৫-৬৯	যুক্ত প্রদেশ	৬,০০,০০০
১৮৬৫-৬৯	পাঞ্জাব	৬,০০,০০০
১৮৬৫-৬৯	মধ্য প্রদেশ	২,৫০,০০০
১৮৬৫-৬৯	বোম্বাই	দেওয়া হয়নি ঃ অত্যধিক হারে লোকজনের স্থান ত্যাগ।
১৮৭৩-৭৪	বাংলা ও বিহার	দেওয়া হয়নি।
১৮৭৩-৭৪	যুক্ত প্রদেশ	দেওয়া হয়নি।
১৮৭৬-৭৭	বোম্বাই	হিসাবটা ৮ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষের মধ্যে ওঠানামা করতে দেখা যায়।
১৮৭৬-৭৭	হায়দ্রাবাদ	৭০,০০০
১৮৭৬-৭৮	মাদ্রাজ এবং যুক্ত প্রদেশ	"স্বাধীনতা" জোর করে চাপাবার কারণে উল্লেখযোগ্য পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। ভারতে সে পর্যন্ত ভীষণতম দুর্ভিক্ষ বলে চিহ্নিত ; দক্ষিণ ভারতের দুর্ভিক্ষ কমিশনার মৃতের সংখ্যা হিসাব করেছেন ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার···আসল মৃতের সংখ্যা হয়তো আরও অনেক বেশী। অন্য জায়গায়

বছর	অঞ্চল	মৃত্যুসংখ্যা
		মৃতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ। মোট মৃতের সংখ্যা ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার।
১৮৭৬-৭৮	মহীশূর (তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনাধীন)	১১,০০,০০০
১৮৮০	দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণ-বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ	অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ঃ কোনো ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা হয়নি ঃ মৃত্যু সংখ্যার রেকর্ড নেই।
১৮৮০	যুক্ত প্রদেশ	অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ঃ ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা ছিলনা ঃ মৃত্যু সংখ্যার রেকর্ড নেই।
১৮৮৪	দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব	মৃত্যু সংখ্যার উল্লেখ নেই কিন্তু মূল পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় তার আগের বছরে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭,৫০,০০০।
১৮৯৯-১৯০০	গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চলে অধিকাংশ ভূ ভা গ কাশ্মীরের সীমান্ত থেকে মহীশূর সীমান্ত পর্যন্ত, মাদ্রাজের কিছু অংশ, সিন্ধু থেকে ওড়িশা সীমান্ত পর্যন্ত	শস্য ও অন্যান্য জিনিসের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় দেড়শো মিলিয়ন পাউণ্ড, লর্ড কার্জনের মতে এটি হল ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে কুখ্যাত, সবচেয়ে ভয়াবহ ও সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ, এটি ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে : সরকারী হিসেবে মৃত্যু সংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ কিন্তু আসলে এর তিন থেকে ৪ গুণ বেশী লোকের মৃত্যু হয়।

বছর	অঞ্চল	মৃত্যুসংখ্যা
১৯০০	রাজপুর জেলা	শতকরা ৪০ ভাগের বেশী লোকের জন্য ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা।
১৯০১	গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই, কর্ণাটক মাদ্রাজের কয়েকটি এলাকা এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব	মৃত্যু সংখ্যা অন্ততঃপক্ষে ৭,৫০,০০০। সরকারী হিসেবে ৪৭ বছরে মোট মৃত্যু সংখ্যা (১৮৫৪-১৯০১) দাঁড়ায় ২,৮৮,২৫,০০০

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার